অখণ্ড সংহিতা

দ্বাদশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

অখণ্ড - সংহিতা

দ্বাদশ খণ্ড

অখণ্ড সংহিতা

দ্বাদশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(দ্বাদশ খণ্ড)

পঞ্চম সংস্করণ, কার্ত্তিক, ১৪১৩

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক পঞ্চাশ টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

মুদ্রণ-সংখ্যা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) [2006]
প্রকাশক—স্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০
দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩

"সাধন কুঞ্জ"
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬-২২০৩২২৮

ডাকে নিতে হইলে অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
ডি৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

(১)

(প্রাক্তন চতুর্দ্দশ খণ্ড হইতে)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বর্ত্তমান সময়ে মৌনব্রত পালন করিতেছেন। বিগত ১৩৫৯ এর রথযাত্রার দিন দুই বৎসরের জন্য তিনি মৌনব্রত ধারণ করেন এবং দুই বৎসর পার হইবার সামান্য পূর্ব্বে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন যে, তিনি আরও পাঁচ মাস মৌনী থাকিবেন। সম্প্রতি তাহা আরও এক মাস বাড়াইয়াছেন। আগামী ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬১, ১০ই ডিসেম্বর, পূর্ণিমা তিথিতে তিনি ডিব্রুগড়ে মৌনভঙ্গ করিতেছেন। জগতের সকলের হিতকামনায় সুদীর্ঘ মৌনব্রত তিনি আরও পালন করিয়াছেন এবং জগদ্বাসী তাহার ফললাভেও বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু এইবারকার মৌনব্রত-ধারণ কিছু বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক। যিনি আবাল্য নিজেকে লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিয়া কেবল নিষ্কাম-সেবা-পরায়ণ একটী শক্তিমান্ মন লইয়া কিশোর ও যুবকদের মনে আত্মগঠনের প্রেরণা দিয়া দিয়া বর্ত্তমানের অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ মানবের জীবনের উন্নত গঠন দিয়াছেন বলিয়া কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অনেক সভাস্থলে প্রথিতযশা ব্যক্তিদেরও আজ অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিতে শোনা যায়, তিনি বর্ত্তমানে পৃথিবীর কয়েকটী মহাদেশেরই অনেকগুলি

সাধনপরায়ণ নরনারীর আদর্শদাতা ও পথপ্রদর্শক গুরু। তাই, আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার মৌনকালমধ্যে অখণ্ড-সংহিতার অন্ততঃ পঞ্চাশটী খণ্ড প্রকাশিত করিয়া দিয়া জনসাধারণের সেবা করি। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর অভিক্ষা-সাধনার উদ্‌গাতা, তাই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রম হইতে, জনসাধারণ হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া বা শিষ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া গ্রন্থ-প্রকাশ একটা কল্পনাতীত ব্যাপার। ঠিক এই কারণেই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইয়াছে।

ভারতে, বিশেষ করিয়া বঙ্গভূমে, যেই সকল মহামানবেরা সম্প্রতি শতাবধি বৎসর যাবৎ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের এক এক জনের জীবনের বৈচিত্র্য এক একটী বিশিষ্টতায় বিমণ্ডিত। কেহ প্রখর যুক্তিধারায় ক্ষুরধার তরঙ্গ যোজনা করিয়া জনসভার পরে জনসভায় অন্তরের উপলব্ধ সত্যকে প্লাবনের তোড়ে প্রচার করিয়া যাইতেছেন। কেহ একান্তে একনিষ্ঠ মন লইয়া নীরবে নিভৃতে সাধনা করিয়া নিজ ইষ্ট-দর্শন ও তাঁহার প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করিয়া তাঁহারই বাণী অতি সরল সহজ ভাষায় সাধারণ মানবের কাণে ঢালিয়া তাহাদের সকলের চিত্তজয় করিতেছেন। কেহ লেখনীর মুখে অসামান্য প্রসাদগুণযুক্ত কাব্যলক্ষণাক্রান্ত রসভূয়িষ্ঠ বাণী-সমূহ পরিবেশন করিয়া কাব্যরসপিপাসু প্রাণ-সমূহে নবভাবের নব অনুভূতির হিল্লোল তুলিতেছেন। প্রত্যেকেই এক একটা বিশেষ বিশেষ মহিমায় অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষে বঙ্গমাতার,

পরোক্ষে ভারতমাতার এবং অলক্ষ্যে সমস্ত মানবজাতির গৌরববর্ধন করিয়াছেন। কিন্তু এই ত্রিবিধ বিশিষ্টতা একটী আধারে কেহ আর দেখে নাই। আচার্য্য স্বরূপানন্দে এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের এক বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটিয়াছে।

লিখিবার অবসর নাই, তবু তিনি লিখিয়াছেন, সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজনে নহে, ব্যাকুল জিজ্ঞাসুর সংশয়-ভঞ্জনের জন্য, পথহারাকে পথ দেখাইবার জন্য, দুর্ব্বলের মনে বলের সঞ্চার করিবার জন্য। যাহাকে সেবা দিতেছেন, তাহার সহিত জীবনে চাক্ষুষ দর্শন হইবে কি, না হইবে তাহার প্রতি উদাসীন রহিয়া, তাহার কাছ হইতে সেবার বিনিময়ে শ্রদ্ধা আদায় করিবার জন্য প্রতীক্ষা-মাত্রও না করিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন আচার্য্য স্বরূপানন্দ তাঁহার পত্রপুঞ্জ,—কখনো ট্রেণে বসিয়া যাত্রিদলের ভিড়ের মধ্যে সকলের কৌতূহলের সামগ্রী হইয়া, কখনো ষ্টীমারে বসিয়া খালাসীদের নঙ্গর তোলার ও ফেলিবার বিচিত্র কোলাহলের মাঝখানে থাকিয়া, কখনো গয়না নৌকায় বসিয়া নানা দেশের নানা রুচির যাত্রীদের দিলারী গল্পের মাঝখানে আপনার কাজে সমাহিত থাকিয়া, কখনো রেল-ষ্টেশানের প্লাটফর্ম্মে নিজের দপ্তর খুলিয়া লইয়া পা ছড়াইয়া দিয়া কোলের উপরে সুটকেস রাখিয়া তাহার উপরে চায়ের বাক্সের একখণ্ড থ্রিপিস উড রাখিয়া, কখনো ধ্যানমৌন পল্লীর নীরব নিভৃত অঙ্কে আশ্রয় লইয়া, কখনো সভাস্থলে ভাষণ দিতে দিতে সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ দিবার ফাঁকটুকুতে, রচনা করিয়া

চলিয়াছেন এক নেপথ্য সাহিত্য, যাহা কখনও প্রকাশিত হইবে বলিয়া তাঁহার বা অপর কাহারো কল্পনাই ছিল না। লক্ষ লক্ষ পত্র তিনি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে অতি সামান্য ভগ্নাংশেরই অনুলিপি রক্ষা সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু এই সাহিত্য অপূর্ব্ব, অনবদ্য, অসাধারণ। পত্র-লেখন-কলায় আচার্য্য স্বরূপানন্দ এক অসামান্য শিল্পী।

কথা কহিবার অবসর নাই, তবু কথা কহিয়াছেন। একমাত্র মৌনব্রতের সময়গুলি ব্যতীত যখন যে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা লইয়া, ছোট বড়র বিচার না করিয়া তখনই নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে হৃদয়ের স্নেহের সদনে টানিয়া আনিয়াছেন। শত কাজের ফাঁকে কথা কহিয়াছেন, পুপুন্‌কী (মানভূম) ও রহিমপুর (পূর্ব্ববঙ্গীয় ত্রিপুরা) আশ্রমে কোদাল চালাইতে চালাইতে উপদেশপ্রার্থীকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, মাথায় মাটির বোঝা টানিতে টানিতে উপদেশ দিয়াছেন, একমাত্র ধ্যানোপাসনা প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যের সময় ব্যতীত তিনি সকল সময়ে সকলকে সাদরে প্রেমভরে হিতকথা শুনাইয়াছেন। যে যেমন মন লইয়া আসিয়াছে, সে চলিয়া যাইবার কালে তাহা অপেক্ষা শান্ততর, উন্নততর, সাহসিকতর এবং নির্ভয় ও নির্ভরশীল মন লইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। নাস্তিককে তিনি অনাদর করেন নাই, পাপীকে তিনি ঘৃণা করেন নাই, দুর্ব্বলকে তিনি অবজ্ঞা করেন নাই, এমন কি আততায়ী দস্যু তাঁহার প্রাণহনন করিতে আসিয়াও সমাদরই পাইয়া গিয়াছে,—শাসন নহে।

এই বিচিত্র কথিকামালার সংরক্ষণ একটা সাধারণ কার্য্য নহে এবং তাহা কখনো হয়ত সম্ভব হইত না যদি অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর তাঁহার পিতৃদেবের কাছ হইতে আবাল্য ডাইরি লিখিবার অভ্যাস আয়ত্ত না করিতেন। এণ্ডারসনি আমলে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর যখন কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত অনুজনদের মধ্যে কেহ কেহ এমন কতকগুলি সম্পদ নদীতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, যাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। শ্রীশ্রীবাবামণির আবাল্য-রক্ষিত ডাইরি রহিমপুর আশ্রমের সম্মুখস্থ গোমতীর গর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে। আর তাহা কেহ ফিরিয়া পাইবে না। অখণ্ড-সংহিতার প্রথম খণ্ড হইতে পরবর্ত্তী অনেকগুলি খণ্ডের মূল উপাদান যেই-সকল ডাইরিতে রক্ষিত ছিল, ত্রিপুরা-শিবপুরের গৌরীভূষণ রায় চৌধুরীর গৃহের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে প্রায় চারি হাত পরিমাণ গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার নীচে সেই অমূল্যনিধি প্যারাফিনের ঘন ও ডবল আবরণ দিয়া, বাক্‌সে ভরিয়া তাহাকে অ্যাশফাল্‌টামের আস্তরণে নিরাপদ করিয়া তাহার পরে চারিদিকে লোহার তারের সরু জাল বুনিয়া সিমেন্ট জমাইয়া কয়েক বৎসর নিরাপদ রাখা হইয়াছিল। সেই সময়ে গভীর রাত্রি জাগিয়া যিনি এই কার্য্যে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, অখণ্ড-সঙ্গীতের সুমধুর গায়ক সেই মাখনলাল ভট্টাচার্য্য আর ইহজগতে নাই, কিন্তু অখণ্ডসংহিতার মূল উপকরণসমূহ তিনিই রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া সকলের চিরনমস্য হইয়া রহিলেন।

এইরূপ বিচিত্র ইতিহাস-পরম্পরার মধ্য দিয়া "অখণ্ড-সংহিতা" জগতের সর্ব্বমানবের হিতের জন্য আত্মপ্রকাশ করিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার সর্ব্বত্র সমাদর হইবার বিষয়ে আমরা অন্তরে সন্দেহ-মাত্রও পোষণ করি না। তবে আমাদের মনে ক্ষোভ রহিল যে, আরও যে অমিত পরিমাণ পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে রহিয়াছে, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিয়া দিতে সমর্থ হইলাম না।

অলমিতি—শুভজন্মাষ্টমী, ১৩৬১

(২)

(প্রাক্তন পঞ্চদশ খণ্ড হইতে)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের জীবন আধুনিক অনেক তপস্বী ও সাধকের জীবনের তুলনায় অত্যাশ্চর্য্য বিভূতি-মণ্ডিত।

এই জীবনের প্রথম বিভূতি আবাল্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া জগৎ কল্যাণার্থে সম্যক আত্মসমর্পণ।

দ্বিতীয় বিভূতি বাল্যাবধিই লোক-গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সমবয়স্ক ও অনুবয়স্ক শত শত বালক ও যুবককে অমৃতের পথসন্ধান প্রদান।

তৃতীয় বিভূতি সন্ন্যাস ও জনসেবার জীবন হইতে ভিক্ষাবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসন প্রদান এবং স্বাবলম্বনের দৃঢ় ভূমির উপরে বিরাট ব্যাপক ধর্ম্মান্দোলনকে স্থাপিত করা।

চতুর্থ বিভূতি তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতা, যাহার তুলনা মিলে না।

পঞ্চম বিভূতি তাঁহার পত্র-লেখন-কলা, যাহার সহায়তায় তিনি সহস্র সহস্র জীবন গড়িয়াছেন এবং যাহা সাহিত্য-রচনার তাগিদে অনুশীলিত হয় নাই, হইয়াছে সমাজ ও দেশ তথা জগতের হিতকামী শত শত বালক ও যুবককে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়া লোকসেবার অভ্রান্ত ও নিরভিমান পথে পরিচালিত করিবার জন্য।

ষষ্ঠ বিভূতি তাঁহার স্ত্রীশূদ্রাদিকে অবহেলা না করিয়া তাহাদিগকেই সমাজের মেরুদণ্ড জ্ঞান করিয়া তাহাদের মধ্যে অবিরাম পরাক্রমে ওঙ্কার ও ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অধিকারকে প্রসারিত করা এবং অতি শক্তিশালী সম্প্রদায় ও ব্যক্তিসমূহের সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতার মধ্যেও নিজ মত ও পথকে সর্ব্বজনের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে সুস্বীকৃত ও পরিপূজিত করান।

আর সপ্তম বিভূতি হইতেছে, নানা সময়ে বারংবার ইংরাজ-রাজের রোষহেতু এবং সাম্প্রদায়িক অত্যাচার-জনিত গৃহদাহ-হেতু কখনো নদী গর্ভে বিলীন হইয়া, কখনো অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, কখনো পুলিশ অফিসের ফাইলে চিরকালের মতন বন্দী হইয়াও তাঁহার উপদেশাবলির ও পত্রসমূহের কতক অংশ জনসমাজের কল্যাণের জন্য রহিয়া গিয়াছে এবং তাহাই এই "অখণ্ড-সংহিতা" নামধেয় মহাগ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

ইহার পূর্ব্বে অখণ্ড-সংহিতার চতুর্দ্দশটী খণ্ড বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রথম হইতে কয়েকটী খণ্ড বহুকাল আগেই ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহাদের পুনর্মুদ্রণের কাজ আমরা আস্তে আস্তে ধরিতেছি। সকল সময়েই ইচ্ছামাত্র কোনও পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হইয়া উঠে না।

"অখণ্ড-সংহিতা"র এই খণ্ডটী "প্রতিধ্বনি" পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তৎকালে পাঠকবর্গের বিশেষ ভাবে চিত্ততোষ করিয়াছে। তাই আশা করি, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পরে ইহা জনসাধারণের মনোরঞ্জক ও হিতকর বলিয়া গৃহীত হইবে। কিমধিকমিতি, ১লা অগ্রহায়ণ,১৩৬১।

অযাচক আশ্রম।
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী।

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

অখণ্ড-সংহিতা নবম খণ্ড প্রকাশের পরে কাগজের বাজারে এমন সঙ্কট আসিয়াছিল যে, দশম ও তৎপরবর্ত্তী খণ্ডগুলিকে অর্দ্ধাকারে বাহির করিতে বাধ্য হই। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কালে সেই ত্রুটীর সংশোধন করিতে ব্রতী হইয়াছি। ফলে

প্রথম সংস্করণের		দ্বিতীয় সংস্করণের
দশম ও একাদশ =	মিলিত হইয়া	= দশম খণ্ড
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ =		= একাদশ খণ্ড
চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ =		= দ্বাদশ খণ্ড

রূপে প্রকাশিত হইল। নূতন সংস্করণে ত্রয়োদশ খণ্ড রূপে যে অমূল্য বস্তু প্রকাশিত হইবে, তাহা এখনও মুদ্রণালয়ের স্পর্শ পায় নাই। কিমধিকমিতি, পৌষ, ১৩৭৩

অযাচক আশ্রম।
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী।

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

ঠিক সাত বৎসর পরে দ্বাদশ খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইল। তৃতীয় সংস্করণ পৌষ ১৩৮৩ সনে দুই হাজার ছাপা হইয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশিত অখণ্ড-সংহিতা দ্বাদশ খণ্ডের ইহা হুবহু পুনর্মুদ্রণ মাত্র। চতুর্থ সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইল। দুই হাজারখানা বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া বাকী তিন হাজারখানা বিতরণের জন্য রাখা হইল।

একলক্ষ অখণ্ড-সংহিতা বিনা মূল্যে বিতরণের মহৎ প্রকল্প সংসাধনের জন্য যাঁহারা নিঃস্বার্থ-ভাবে দান করিতেছেন, সেই সকল মহানুভব দাতাদের দানের পরিমাণ ও নামের তালিকা

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(দ্বাদশ খণ্ড)

(— * —)

৮ই বৈশাখ, ১৩৪১

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব যে রহিমপুর আশ্রম হইতে নগরপাড় আসিয়া গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা গত সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছেন। মকরন্দ-লোভে অলিকুল যেমন করিয়া পারিজাত পুষ্পের পিছনে ছুটিয়া বেড়ায়, তেমনই করিয়া একদল যুবক নগরপাড়ে শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত রায়ের গৃহে রাত্রি প্রায় দশটা কি এগারটার পরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে একই গ্রামের অধিবাসী নহেন।

শিষ্যের অবাধ্যতা ও গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি ইঁহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া রাত্রি এগারটার সময়ে দ্বিতল হইতে একবার নামিয়া সকলকে দেখা দিয়া আসিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হাতে এত কাজ যে, তিনি পরদিন প্রাতে আর কাহারও সহিত দেখা করিতে সমর্থ হইবেন না। যুবকেরা যেন রাত্রিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ করিবার আর চেষ্টা না করিয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যায়।

রাত্রিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পরে লক্ষ্য করিলেন যে, ইঁহারা একজনেও যায় নাই। হাসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোরা গুরুদেবের একটা সামান্য নির্দ্দেশ পালন কর্ত্তে পার্লি না, কি ক'রে তোরা আশা করবি যে, গুরুদেব তোদের জন্য কৃপার অনন্ত ভাণ্ডার খুলে দেবেন?

যুবকেরা অপ্রতিভ হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে, প্রকৃত গুরু শিষ্যের অবাধ্যতায় তার উপরে বিরক্ত হন না, এটাও সত্য। প্রথমে তিনি মনে বিচার করেন যে, নিশ্চয়ই শিষ্যের অবাধ্য হবার মত সঙ্গত কোনও কারণ আছে। সেই কারণ অনুসন্ধান ক'রে তিনি আগে কারণটিকে দূর করেন, তার পরেও যদি দেখেন যে, শিষ্য এখনও অবাধ্য হচ্ছে, তাহ'লে তিনি শিষ্যকে সদুপদেশ দিয়ে সংশোধন করার চেষ্টা করেন। তার পরেও

যদি শিষ্য অবাধ্য হয়, তা হ'লে তাকে আর শিষ্য ব'লে মনে না ক'রে খেলার সাথী ব'লে মনে করেন। খেলার সাথীরা যদি বোকামি করে, তা হ'লে কি কেউ তার জন্য রাগ কর্ত্তে পারে?

যুবকেরা অতিশয় কৌতুকের সহিত শ্রীশ্রীবাবামণির কথাগুলি উপভোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি একজনকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুই হাত পা মুখ ধুয়েছিস্? কাপড় ছেড়েছিস্?

সে সম্মতিসূচক উত্তর দিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এখন এসে দাঁড়া আমার ঘরের দরজায়। বাড়ীর মালিকও যদি আসেন, তবু ঢুকতে দিবি না।

কোথায় চলিয়া যাইবার আদেশ হইয়াছিল, এখন পাওয়া গেল সেবার অধিকার, সুতরাং যুবকটী প্রত্যাশাতীত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার অনেকগুলি পত্র লেখা বাকী রয়ে গেছে। এইগুলি লিখে আজই দশটার মোটরে যাব কুমিল্লা। সেখানে ফেলব সব ডাকবাক্সে। এমন শক্ত ভাবে পাহারা দে, যেন আমার সঙ্গের ব্রহ্মচারী ছাড়া অন্য কেউ দরকার হ'লেও ঘরে না ঢুকতে পারে।

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিতে বসিলেন। এই দিনকার অধিকাংশ পত্রের নকল রক্ষিত হয় নাই। মাত্র কয়েকখানা পত্রাংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহারই অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল।

তোমার জীবন অনন্ত ওঙ্কার

ত্রিপুরা-চাতলপাড়-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মনে রাখিও তোমার জীবন হইতেছে একটা অফুরন্ত ওঙ্কার-ধ্বনি, একটা অনন্ত প্রণব। ওঙ্কারের মহামন্ত্র গাহিতে গাহিতে পিতৃদেহ হইতে ছট্‌কাইয়া গিয়া উল্কাবেগে মাতৃ-জঠরে প্রবেশ করিয়াছিলে, আবার হুতাশনের লেলিহান রসনাগুলিতে উচ্চারিত ওঙ্কারধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এই দেহকে ভস্মে পরিণত হইতে দেখিবে। অবিরল ওঙ্কারনাদ জপিতে জপিতে মাতৃজঠরের অন্ধতমসাচ্ছন্ন গুহাপ্রদেশে বিমল জ্যোতির স্ফুরণ দর্শন করিয়া আশ্বস্ত ও অভীঃ হইয়াছিলে, আবার দেহত্যাগের পরে পুনঃ জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কার-ধ্বনিতে নিজেকে লুকাইয়া পরমপ্রশান্তি লাভ করিবে। যমযন্ত্রণা সহিতে সহিতে যখন মাতৃ-জরায়ুর এক একটা অপ্রত্যাশিত আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশীর্ষ ঊর্দ্ধপদ অবস্থায় ভূমিতে নামিতেছিলে, তখনও যে ওঙ্কার-ধ্বনি অবিরাম মনে-প্রাণে আত্মায় জপিতেছিলে, সজ্ঞানে শরীর ছাড়িয়া অশরীরী-অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্কালে নাভি পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবাইয়া অন্তর্জ্জলী করিতে করিতে ঊর্দ্ধশীর্ষ-অধঃপদ অবস্থায় অবিরাম সেই ওঙ্কারই জপিবে। মুখে আহারীয় গ্রহণ কর,—ওঙ্কারধ্বনি করিতে করিতেই দন্ত তাহা চর্ব্বণ করে, কণ্ঠ তাহা গলাধঃকরণ করে, পাকস্থলী তাহা জীর্ণ করে। অবিরাম ওঙ্কার-ধ্বনি করিতে

করিতে রস হয় রক্তে পরিণত, রক্ত হয় মাংস, মাংস হয় মেদ, মেদ হয় অস্থি, অস্থি হয় মজ্জা, মজ্জা হয় ওজঃ। হৃৎপিণ্ড বিশুদ্ধ শোণিত পাম্প করিয়া সমগ্র শরীর জুড়িয়া প্রেরণ করে ওঙ্কার-ধ্বনি করিতে করিতে, শোণিত-বিন্দুগুলি বিনাশ-প্রাপ্ত অণুপরমাণুগুলির স্থলে নূতন নূতন অণুপরমাণুর সৃষ্টি, সমাবেশ ও পূরণ করে ওঙ্কার-ধ্বনি করিতে করিতে। মল-ত্যাগ, মূত্র-ত্যাগ, হাসি, কাসি, ফুৎকার, থুৎকার, সব কিছু হইতেছে মহানাম ওঙ্কারের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি করিয়া। *** ওঙ্কার তোমার জীবন, তোমার জীবন অনন্ত ওঙ্কার।"

তুমি আমার সন্তান

মাদ্রাজ-পেড্ডাপুরম্-প্রবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার তুমি সন্তান, ইহা ভুলিবে কেন? আমি কি জীবনে বিপদকে ভয় করিয়াছি? তবে তুমি কেন করিবে? আমি কি জীবনে বাধাকে মানিয়াছি? তবে তুমি কেন মানিবে? আমি কি জীবনে নিন্দা শুনিয়া বিমর্ষ এবং প্রশংসা শুনিয়া হৃষ্ট হইয়াছি? তবে তুমি কেন হইবে? পিতার বীর্য্য সন্তান পাইবে না? আমার স্বভাব আমার পুত্র-কন্যায় বর্ত্তাইবে না? তাহারা সামান্য বিঘ্ন দেখিয়া বিচলিত হইবে, সামান্য বাধা দেখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের হাল ছাড়িয়া দিয়া পরাজিতের মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করিবে, আর তাহাই আমাকে সহ্য করিতে

হইবে? ইহা হইতে পারে না। তোমরা সাধন কর, বাবা, সাধন কর। সাধন করিলেই তোমাদের প্রকৃত স্বভাবের বিকাশ ঘটিবে। তখন তোমাদের অসাধ্য জগতে কিছুই থাকিবে না।"

প্রতি জনে দেবতা হও

জলপাইগুড়ি-নিবাসী জনৈক পত্র-প্রেরকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের জীবন কেবল তোমাদের একাকীর জন্য নহে, কেবল নিজের সুখ, নিজের শান্তি, নিজের তৃপ্তি ও নিজের স্বস্তির জন্য নহে। তোমাদের জীবনের প্রতিটি উত্থান-পতন তোমাদের প্রতিটি প্রতিবেশীর, প্রতিটি গ্রামবাসীর, প্রতিটি দেশবাসীর, প্রতিটি জগদ্‌বাসীর কুশলের জন্য হইবে। কেবল নিজেকে লইয়া থাকিবে পশুরা, কেবল নিজের সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া থাকিবে সাধারণ মানুষেরা, কিন্তু নিখিল বিশ্বের সকলের কুশল লইয়া নিজের কুশলকে গণনা করিবে দেবতারা। আমি চাহি, সেই দেবতা তোমরা প্রতিজনে হও।"

সুযোগের সদ্ব্যবহার কর

চট্টগ্রাম-রাঙামাটি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আজ যাহাকে সহজ কাজ মনে করিতেছ এবং এই জন্যই করিয়া যাইতেছ অবহেলা, ঘটনাবলীর আবর্ত্তনে তাহাই

হয়ত নানা বিঘ্ন-বিপত্তির অপ্রত্যাশিত সমাগমে জগতের কঠিনতম কাজ হইয়া দাঁড়াইবে। তাহারই জন্য, প্রতি কার্য্যে প্রথম সুযোগকে গ্রহণই হইতেছে বুদ্ধিমানের কাজ, দ্বিতীয় সুযোগের প্রতীক্ষা করা উচিত নহে। তুমি কি ভাবী কালের ঘটনাবলীর আবর্ত্তকে দেখিতে পাইতেছ? তুমি কি সুনিশ্চিত-রূপে জান যে, আজ যেখানে ধীরগামিনী তটিনী মলয়হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া বীচিবিভঙ্গ দেখাইতে দেখাইতে ছুটিয়া চলিয়াছে সহস্র নরনারীর চিত্তে আনন্দের উচ্ছল উদ্বেলতা সৃষ্টি করিয়া, সেখানেই কাল প্রলয়ঙ্কর প্লাবন আসিয়া সকলের মুখের হাসিকে আত্মরক্ষার নিদারুণ ত্রাসে পরিণত করিবে না? সুযোগ থাকিতেই নিজের কাজ করিয়া লও, সুযোগ থাকিতেই দশের সেবা করিয়া লও, সুযোগ থাকিতেই জগতের কল্যাণ সাধন-কল্পে যে দিক দিয়া যাহা সেবা ও ত্যাগ তোমার পক্ষে সম্ভব, তাহা করিয়া লও। সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। সুযোগ চলিয়া যাইবার পরে হাহুতাশ করিবার মতন মূর্খতা জগতে আর কি আছে?

আমি তোমাদের ছাড়িব না

ঢাকা-নবাবপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কত অনাহার আমার জীবনের উপর দিয়া গিয়াছে কিন্তু কাহাকেও বলিতে যাই নাই যে, আমি দিনের পর দিন

অনাহারে জীর্ণ হইয়া তাহারই মধ্য দিয়া অবিরাম অবিশ্রাম কাজ করিয়া যাইতেছি। শরীরের উপর দিয়া নিদারুণ চোট সহিয়াও আমি কাজে একটী দিনের জন্যও ঢিলা দেই নাই। কিন্তু কি জন্য আমি অনাহার করিয়াও কাজে শিথিল হই নাই, তাহা কি তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ? এখনও কতদিন আমাকে অনাহারে কাটাইতে হয়, তাহাও কি জান? কেন আমি এই কষ্ট সহিয়া বেড়াইতেছি? তোমরা জোয়ারের জলের পুঁটি মাছের মতন যেখানে যে আন্দোলন দেখিবে, তাহাতেই ভাসিয়া চলিয়া যাইবে, ইহাই কি আমি তোমাদের কাছে প্রত্যাশা করিব? তোমাদের কাছে নিত্য-নূতন মতবাদ আসিয়া হানা দিতেছে, নিত্য-নূতনের মোহে তোমরা চির-পুরাতন অবিনাশী সত্যকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছ। মনে কি করিয়াছ যে, আমি তাহা বসিয়া বসিয়া কেবল দেখিব? নিশ্চয়ই নহে। আমি আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রেরণ করিয়া তোমাদের অন্তরের সিংহকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। কোনও মতবাদ লইয়া আমি তোমাদের কাহারও সহিত কোনও তর্কে কখনও প্রবৃত্ত হই না বলিয়াই মনে করিও না, যাহা তোমাদের সর্ব্বনাশের পথ, সেই পথে আমি তোমাদের চলিতে দিব। আজীবন তোমাদের জন্যই খাটিয়াছি, আমরণ তোমাদেরই পথকণ্টক আমি তুলিয়া তুলিয়া বেড়াইব। আমি তোমাদের ছাড়িয়া দূরে সরিয়া পড়িব, স্বপ্নেও এমন অসম্ভব কল্পনা করিও না।”

আমার দৃষ্টি আজিকার উপরে নহে

ঢাকা-ইসলামপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“আমার দৃষ্টি আজিকার বা কালিকার উপরে নহে। আমি তিনশত বৎসর পর হইতে কাজ সুরু করিব, তাহারই মাত্র প্রস্তুতি চলিতেছে। আমার অফুরন্ত আশাবাদ একটা কল্পনার বিলাস নহে, ভাবী কালকে তাহার প্রতিটি বিচিত্রতায় আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। কত ওলট-পালট জগৎ ভরিয়া হইবে, মিলাইবে, কত ভাঙ্গা-গড়া উঠিবে নামিবে কিন্তু তাহার পরপারে আমার লক্ষ্য। নিখিল ভুবন নিখিল ভুবনকে আপন বলিয়া স্বীকার করিতেছে অকুণ্ঠ কণ্ঠে, সেই স্বীকৃতিকে মর্য্যাদা দিতেছে আপন আচরণে, সেই দিনটীরই গণনা আমার নয়নপঞ্জীতে। এ চিত্র কাল্পনিক নহে, ইহা বাস্তবের অগ্রচ্ছবি মাত্র। তোমরা ইহা বিশ্বাস কর। তোমরা ইহাকে সত্য বলিয়া জান। তোমরা ইহাকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার কর। সেই স্বীকৃতি তোমাদের জীবনের অফুরন্ত কর্ম্মের মধ্য দিয়া আজই, এই মুহূর্ত্তেই আরম্ভ হউক। তোমাদের আমি ভালবাসিয়াছি বলিয়াই তাহার বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে এই স্বীকৃতি চাহি না। আমার ভালবাসায় প্রতিদান-বুদ্ধি নাই। আমার এই ভাবী কালের ছবির সঙ্গে তোমাদের প্রতিজনের অনন্ত মঙ্গল বিজড়িত রহিয়াছে বলিয়াই আমি তোমাদের কার্য্যকর স্বীকৃতির

প্রত্যাশা করি। তোমরা কেহই আজিকার বা কালিকার জন্য নহ। তোমরাও প্রতিজনে অনন্ত কালের জন্য। তোমাদের জীবন ও মরণ, শ্রম ও বিশ্রাম সবই অনন্ত কালের জন্য। যেই স্বপ্নের ছবি দেখিয়া অলস তন্দ্রাতুর-নয়নে অবহেলায় দিন কাটাইবে, তার বার্ত্তা আমি তোমাদের জন্য আনি নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া তোমরা জগৎকে যে মহাদান দিবে, তাহার যথার্থ মহিমা আমি তোমাদিগকে স্মরণ করাইতে চাহি।"

বেলা দশটায় শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লা আসিয়াছেন। সন্ধ্যার কিছু পরে কান্দির-পাড়ের রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করিতেছেন।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য কেন আবশ্যক

একটী কলেজী ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কি Birth Control (জন্ম-নিরোধ) আন্দোলন সমর্থন করেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একমাত্র ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত অন্য উপায়ে যে জন্ম-শাসন, তাকে আমি সমর্থন করি না।

যুবক—আপনি আপনার "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থে ত' দম্পতীর বহু সন্তান সমর্থন করেন নাই, বরং নিন্দাই ক'রেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি—তার কারণ এই নয় যে, জন্মবৃদ্ধিকে আমি ভয় করি। বহু সন্তান হ'তে গেলেই জনক-জননীর উদ্বেগ অত্যধিক হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাতে উভয়েরই দৈহিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্থৈর্য্য এবং বহুবিধ দেবোচিত গুণের

ক্ষতি ঘটার সম্ভাবনা। এজন্য সন্তানোৎপাদনকে বিবাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য রূপে মনে ক'রে সন্তানের মধ্যে সংযম, স্থৈর্য্য ও স্বাস্থ্য সহজে প্রকাশিত করার উদ্দেশ্যে আমি বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিচ্ছি। সংযমীর সন্তান সংযমী হবে। আর সংযমের সহজাত সংস্কার নিয়ে যারা আবির্ভূত হবে, তারা হবে তাপদগ্ধ জগতের পরম শান্তির উৎস। বর্ত্তমান জগতের দুঃখগুলিকে কি বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছ? অধিকাংশ দুঃখই কি মানুষের কাম-কাতর চিত্তের বিকৃতি থেকে সৃষ্ট নয়?

সংযম-পালনে অক্ষম দম্পতী ও জন্মশাসন

যুবক—যারা সংযম পালনে অক্ষম, তেমন সাধারণ লোকদের জন্য কি আপনি জন্ম-শাসনের নূতন বৈজ্ঞানিক উপায় সমর্থন কর্‌বেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি—নিশ্চিতই না।

যুবক—কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি,—কারণ তাতে দম্পতীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যও ক্ষুণ্ণ হবেই। দাম্পত্য জীবনে সংযম-পালন এমন একটা অসাধ্য ব্যাপার কিছু নয়, যার সাহায্য নিয়ে জন্ম-শাসন করা চলে না। এই ভারতবর্ষে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বামি-পত্নীর মধ্যে

উত্তরোত্তর প্রীতি-বর্দ্ধনের মধ্য দিয়েও সংযম-পালনের এমন অমোঘ উপায় উদ্ভাবন ক'রে গেছেন, যাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে জন্মশাসন আমাদের প্রয়োজন পড়ে না। জড়-বৈজ্ঞানিকের জন্মশাসন কেবল দেহের সুখকে লক্ষ্যে রেখে, তপস্বী-গৃহীর জন্মশাসন ভগবানের মুখপানে তাকিয়ে। দুটায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। অবশ্য, বলতে পার, আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের সাধনায় ব্রতী হচ্ছে কজন? কিন্তু এতকাল যদি সকলে উপেক্ষা ক'রেও থাকে, ক্রমশঃ দক্ষ গৃহী-সাধকের সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে, যাঁরা সংযত থেকে তবে সন্তানোৎপাদন কর্ব্বেন এবং সন্তান জগতের হিতকারী হবে।

অবিবাহিতের জন্ম-শাসন আলোচনা

এই বিষয়ে যুবকটী আরও আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি বিবাহিত?

যুবক—না।

শ্রীশ্রীবাবামণি,—যাও, তবে আগে বিবাহ কর। বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখ ও সমস্যাগুলিকে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর। বিবাহিত জীবনের গূঢ়তম অংশে কৃত্রিমতার আমদানী কর্লে স্বামি-পত্নীর পারস্পরিক ভালবাসাটা কোন্ স্তরে গিয়ে দাঁড়ায়, তা নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখ। তার পরে তোমার পক্ষে এই বিষয়ে আলোচনা করা সঙ্গত হবে। দুই একটী সন্তানের পিতা না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার পক্ষে সব আলোচনাই হবে নিতান্ত আন্দাজী।

যে আলোচনার ফলাফলের উপরে একটা জাতির ধ্বংস বা রক্ষা নির্ভর কচ্ছে, তা কখনো অনভিজ্ঞ-ভাবে করা উচিত নয়।

জন্মশাসন ও ইতিহাসের শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বা আরামের দিক্ চেয়ে তোমাদের মত যুবকদের কোনও আলোচনাতেই যাওয়া উচিত নয়। তোমার কাছে সমগ্র দেশ কত প্রত্যাশা কচ্ছে। সমগ্র দেশের হিতের জন্য আলোচ্য আরো বড় বড় কত সমস্যা রয়েছে। সেই সব দিকে তাকাও। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-শাসন আন্দোলন প্রধানতঃ ব্যক্তিগত সুখের পানে তাকিয়ে প্রসার পাচ্ছে, জাতির হিতের পানে তাকিয়ে নয়। জাতির বিপদ কোথায়, এই নিয়ে যদি গভীরভাবে আলোচনা কর, তা হ'লে হয়ত তোমার মত এই গিয়ে দাঁড়াবে যে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যোদ্ধার আজ প্রয়োজন, যারা অসত্য, অন্যায়, অধর্ম্ম ও অবিচারের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে বীরবিক্রমে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দেবে। যদি তাই দরকার হয়, তা হ'লে জনসংখ্যা কমাবার চেষ্টা ত' আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। জার্ম্মাণ মেয়ে আর জাপানী মেয়ে গর্ভধারণ করাকে গর্ব্বের বিষয় মনে করে, কেননা, তাদের সন্তানেরা জগতের বুকে যুদ্ধ ক'রে দিগ্বিজয়ী হোক এবং তার জন্য প্রয়োজন হ'লে সহস্রে সহস্রে লক্ষে লক্ষে রণশায়ী হোক, এ কামনা তারা করে। রাজনীতি যদি ভ্রান্ত পথে চালিত না হয়, তা হ'লে একদিন

দেখা যাবে যে, এই দুই জাতি তার জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে নিজের হিতে প্রয়োগ কত্তে সমর্থ হয়েছে। অপর দিকে ফ্রান্স ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে জন্মশাসনের গুণে লোক-সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। দেশ-বিদেশ থেকে নবাগতেরা এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লোক-সংখ্যার ভাঙ্গনটাকে কতক পরিমাণে ঠেকাচ্ছে বটে, কিন্তু ফ্রান্সের অবস্থা অতীব বিপজ্জনক। লোক-সংখ্যা ক্রমশই ক্ষীয়মাণ হচ্ছে এবং চাকর-চাকরাণী আমদানী কত্তে হচ্ছে পোল্যাণ্ড থেকে, চাষের মজুর আমদানী কত্তে হচ্ছে স্পেন থেকে, সৈন্যদল পূর্ণ রাখতে হচ্ছে আলজিরিয়ার কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্য থেকে লোক এনে। অথচ প্রতিবেশী জার্ম্মেণীর ষাট বছরের বৃদ্ধও পুত্রোৎপাদনে অবহেলা কচ্ছে না, পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের বৃদ্ধাও গর্ভধারণ ক'রে দশম মাসের স্ফীতোদর নিয়ে হাটে, বাজারে, রাস্তায় বেড়াতে গর্ব্বের অভাব অনুভব কচ্ছে না। এর সামরিক ফলাফল কি হ'তে পারে, বিশ পঁচিশ বছরেই তা' প্রত্যক্ষ হবে। যারা জগতে শান্তিরক্ষকের ভূমিকা নিয়েছে, তারা কচ্ছে প্রাণপণে জন্মশাসন এবং যারা জগতের শান্তির ধ্বংসকারী দৈত্য ব'লে বর্ণিত হচ্ছে, তারা কচ্ছে প্রাণপণে জন্মদান। এই পার্থক্যের ফলে শান্তিরক্ষক ভদ্রলোকদের ভিটেমাটি একদিন হয়ত উচ্ছন্ন হবে এবং বাইরে থেকে অপরের সাহায্য এবং তার বিনিময়ে আংশিক স্বাধীনতার খর্ব্বতা ব্যতীত হয়ত ভিটেমাটি আর উদ্ধারই সম্ভব হবে না। পরের সাহায্যে যে আত্মরক্ষা করে, তার পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা

রক্ষা করা এক অতি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। যেই ফ্রান্স সেই দিন নেপোলিয়নের নেতৃত্বে আটলান্টিক থেকে ইউরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত পদভরে কাঁপিয়ে তুলেছিল, যেই ফ্রান্স এই সেই দিন ভার্দ্দুনের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরাক্রান্ত জার্ম্মেণীকে পরাজিত ক'রেছিল, সেই ফ্রান্স তার জন্মশাসনের মহিমায় হয়ত গর্ব্বোদ্ধত বিজয়ী বিদেশীর বুটের শুকতলা লেহন কর্ব্বে। আর যেই জাপান এই সেইদিনও ছিল বর্ব্বর, যেই জাপান গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংরাজের পক্ষে যোগ দিয়ে ফাঁকতালে অল্পায়াসে প্রায় বিনামূল্যে কিছু সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ক'রে নিয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত জগতের প্রথম শ্রেণীর শক্তি ব'লে বিশেষ গ্রাহ্যে আসে নি, সেই জাপান হয়ত বিশ পঁচিশ কি ত্রিশ বছরের মধ্যে তার জন্মবৃদ্ধির মহিমায় জগতের অতি ভয়ানক এক প্রলয়ঙ্কর শত্রু ব'লে পরিগণিত হবে। বাছা হে, "জন্মশাসন", "জন্ম-শাসন" ব'লে ত' এই অপরিণত বয়সেই মাথা-কপাল খুঁড়তে সুরু ক'রেছ, কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা কি, তার দিকে কেন তাকাচ্ছ না? জাপানের লোক-সংখ্যা প্রতি বৎসর সাত লক্ষ ক'রে বেড়ে যাচ্ছে, আর বিশাল অষ্ট্রেলিয়ার বিপুল ভূখণ্ডের অধিবাসীরা দুঃস্বপ্নে রাত কাটাচ্ছে; আর ভাবছে, কবে জানি জাপান এসে ঘাড় ভাঙ্গে। এক লণ্ডন সহরের যা' লোক-সংখ্যা, সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ার তা' লোক-সংখ্যা। এই অষ্ট্রেলিয়ানরা যদি জন্ম-শাসন অবলম্বন করে, তবে তাদের ভবিতব্যে কি আছে, একথা বুঝতে কি বাছা তোমার অনেক সময় লাগবে?

জন্মশাসন ও আন্তর্জ্জাতিক কূটনীতি

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—যারা তোমাদের দেশে বিলাতী জন্ম-শাসনের আন্দোলনকে ছড়াচ্ছে, তোমাদের লোক-সংখ্যা হ্রাস পেলে তাদের কোনও লাভ আছে কিনা, সেইটী আগে গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে দেখ। তোমাদের সংখ্যা ক'মে গেলে যাদের লাভ, ভাড়াটে বক্তা রূপে যে তারা তথাকথিত প্রচারকদের তোমাদের দেশে পাঠায় নি, এই বিষয়ে কোনও চিন্তা করেছ কি? আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি এক অতি ভয়ানাক ব্যাপার। ভারতে আজ চাণক্য জীবিত থাকলে হয়ত তার মর্ম্মচ্ছেদ কত্তে পাত্তেন, কিন্তু ভারতে আজ বড় বড় উকিল আছে, ব্যারিষ্টার আছে, চাণক্য নেই। কোন্ রাষ্ট্র যে কখন কোন্ কারণে ভারতের teeming population (বিপুল জন-সংখ্যা) কে নিজের স্বার্থোদ্ধারের পথে কণ্টক ব'লে গণনা কত্তে পারে বা কচ্ছে, সেকথা কি তোমার জানার কোনো উপায় আছে? তুমি চীন, জাপান, রাশিয়া, জার্ম্মেণী, ইংলণ্ড বা ফ্রান্স কারো মনের কথা জান? একজন আমেরিকান মহিলাও যে জাপানের টাকা খেয়ে এদেশে প্রচারকার্য্যে নামতে পারে, বা একজন নরওয়ের মহিলা যে বিলাতী রবার-শিল্পীদের নগদ মাইনের চাক্‌রী নিয়ে এসে এসব দেশের অজ্ঞ মূর্খ নিরক্ষরদের প্রবঞ্চিত কত্তে পারে,—এসব কি আন্তর্জ্জাতিক কূটনীতিতে একেবারে অসম্ভব? একশত বৎসর পরে হয়ত

হঠাৎ এমন এক দলিল আবিষ্কৃত হ'য়ে যাবে, যাতে দেখা যাবে যে, এমনই কোনও একটা জাতি এদেশের ক্ষতি সাধনের জন্য নিজে আড়াল থেকে প্রকাশ্যে অন্য লোকদের দিয়ে জাতিধ্বংসের কুশিক্ষা বিলিয়ে গেছে। সুতরাং সাধু সাবধান! তুমি কি এরকম একটা কথা শোননি ১৯১৪-র যে মহাযুদ্ধে ইংরেজ জাতি জয়ী হ'য়েও প্রকারান্তরে প্রায় ধ্বংসই হয়েছে এবং যে যুদ্ধে কোটি কোটি ইংরেজের পুত্র অকালে মরেছে, অসংখ্য ইংরেজ-পত্নী স্বামিহারা, অসংখ্য ইংরাজ-মাতা পুত্রহারা হয়েছে, সেই যুদ্ধটার মূল হচ্ছে একদল দেশদ্রোহী ইংরাজ কর্ত্তৃক গোপনে জার্ম্মেণীকে অস্ত্র-সরবরাহ? এভাবে জগতে অনেক চমকপ্রদ ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার গোপনে ঘট্‌ছে। সুতরাং বিদেশীর মুখে বা বিদেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত একদল অর্দ্ধ-পাশ্চাত্যের মুখে আপাত-রমণীয় উপদেশ শুনে চিলে কাণ নিয়েছে ব'লে চিলের পিছনে পিছনে ছুটো না।

সমর-নীতিতে ও রাজনীতিতে সংখ্যার গুরুত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রাজনীতির ক্ষেত্রে সংখ্যার একটা দাম আছে। সমর-নীতির ক্ষেত্রে শুধু সংখ্যার তত মূল্য নেই,—সবল, সুশিক্ষিত, সাহসী এবং উপযুক্ত অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত ব্যক্তিদের সংখ্যারই সেখানে মূল্য। কিয়ত্তর পরিমাণে অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিরা যদি সাহসী, সমরদক্ষ, সঙ্ঘবদ্ধ, সুশৃঙ্খল

এবং উৎকৃষ্টতর অস্ত্রে সজ্জিত হয়, তবে তারা কিয়ত্তর পরিমাণে অধিকসংখ্যক ব্যক্তিদেরও অনায়াসে হঠিয়ে দিতে পারে। বাবর শাহ ভারতে প্রবেশ কর্ল্লেন সংখ্যার জোরে নয়, কিন্তু বারুদের জোরে। গ্রীক সম্রাট আলেকজেণ্ডার পারস্য জয় কর্ল্লেন একদিকে তার উৎকৃষ্টতর রণকৌশল ও অপরদিকে গ্রীক প্রথায় শিক্ষিত সৈন্যদের রণদক্ষতার জোরে। সমর-নীতিতে অস্ত্র আর শিক্ষা হচ্ছে সংখ্যার চেয়ে বেশী গুরুতর। কিন্তু রাজনীতি ত' চলে ভোটের মুখে। একটা পূর্ণবয়স্ক খঞ্জ যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারে না ব'লে সমরক্ষেত্রে তার কোনো মূল্য নেই, কিন্তু নির্ব্বাচনের সময়ে তার একটী ভোট আছেই। যে সব গুণ থাকলে একটী ভোটের মালিক হওয়া যায়, সেই সব গুণ উপার্জ্জন করা তত কঠিন নয়, যত কঠিন একজন সমরক্ষম সৈন্য হওয়ায়। ফলে কত খঞ্জ, কত পঙ্গু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চৌকীদারী ট্যাক্স দিয়ে বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লেখাপড়া শিখে বা নির্দ্দিষ্ট একটা বয়ঃপ্রাপ্তির ফলে ভোটের মালিক হচ্ছে। এই "ভোটদাতা"ই হচ্ছে রাজনীতিক নেতাদের নিজ নিজ মতলব হাসিল করার পরম সহায়। একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী অতীব স্বার্থপর নিকৃষ্ট ব্যক্তি এইসব ভোটদাতাদের সহায়তা পেয়ে গণতন্ত্রবাদী অতীব পরহিতৈষী অত্যুৎকৃষ্ট এক সমদর্শী ব্যক্তিকে অনায়াসে পরাভূত ক'রে দিয়ে রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে নিজের খুশীমত নানা গলদ ও বিপদ ঢুকিয়ে দিতে পারে। একজন অপদার্থ ব্যক্তিকে সমর্থন ক'রে

ভোটদাতারা এভাবে হয়কে নয়ে, দিনকে রাতে, রাজত্বকে দৌরাত্ম্যে, গণতন্ত্রকে কুশাসনে, স্বাধীনতাকে স্বৈরাচারে পরিণত ক'রে দিতে পারে। সুতরাং যে সম্প্রদায় জ্ঞাতসারে নিজের বংশবৃদ্ধিকে কৃত্রিম উপায়ে ব্যাহত কর্ত্তে যাবে, সে যে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের সহ্য করার জন্য উৎপীড়ন ও অবিচার সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সংযমের দ্বারা জন্মশাসন

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইন্দ্রিয়-সংযমের বলে যে জন্মশাসন, তার ফল হচ্ছে এই যে, এর পূর্ণ সাফল্য হ'লে পিতামাতার পূর্ণ ইচ্ছাতেই প্রয়োজনমত সময়ে, উভয়ের পূর্ণ স্বাস্থ্যের সময়ে, উভয়ের প্রাণভরা প্রেমের ভিতর দিয়ে, একান্তই স্নেহের দুলাল ও দুলালী-রূপে পুত্র-কন্যার আবির্ভাব হবে। তারা সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবেই হবে। একথা নিঃসন্দিগ্ধ, নিঃসংশয়। আর, ইন্দ্রিয়-সংযমের মধ্য দিয়ে জন্মশাসনের চেষ্টা ক'রেও যে পিতামাতা ঠিক্ ঠিক্ সংযম রাখতে পারবেন না, তাঁদের সেই ব্রতচ্যুত-অবস্থায়-জাত সন্তানও তাঁদের সংযম-চেষ্টাটাকে একটা স্বাভাবিক সম্পত্তিরূপেই নিয়ে আবির্ভূত হবে, কেননা, পিতামাতার স্বাভাবিক সদ্‌গুণ এবং আত্যন্তিক অনুশীলনের সুফল পুত্রকন্যায় বর্ত্তায়ই। কিন্তু কৃত্রিম জন্মশাসনের চেষ্টা যদি পূর্ণসাফল্য পায়, তা'হলে ধীরে ধীরে একটার পর একটা ক'রে বংশ নির্ব্বংশ

হ'তে থাক্‌বে। কারণ, পুত্র-কন্যার জন্ম না দিয়েও যদি নিঃশঙ্কায় ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ করা যায়, তবে আত্মাসুখলিপ্সু কোন্ মূর্খ পিতা আবার সন্তান-পালন, সন্তানকে শিক্ষাদান প্রভৃতি কষ্টকর দায়িত্বের হাঙ্গামায় যাবে? আর কোন্ মূর্খ মাতা প্রসবের নিদারুণ ক্লেশ স্বীকার কত্তে বাধ্য হবে? কিন্তু কৃত্রিম জন্মশাসনের চেষ্টা যদি সফল না হয়, তাহ'লে জন্ম নেবে ত' কতকগুলি কামকাতর হীনবীর্য্য অল্পপ্রাণ দুর্ব্বলেন্দ্রিয় আবর্জ্জনার আড্ডা। সুতরাং স্বাভাবিক উপায়ে, সংযমের বলে জন্মশাসনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অন্য পন্থা আর্য্যপথ নয়। বশিষ্ঠের শত পুত্র ছিল, সাবিত্রী তাঁর পিতা অশ্বপতির জন্য যমরাজের নিকটে শত পুত্র প্রার্থনা করেছিলেন। এ সবের ইঙ্গিত ভোলা উচিত নয়।

একটী নিমেষ তোমারে যেদিন ডাকি

ভ্রমণান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি এক ভক্তগৃহে বসিতেই একজন একটী হারমোনিয়াম আনিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির সম্মুখে দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রহিমপুরের উৎসবে শরীর বড়ই ক্লান্ত, কণ্ঠটাই বেশী ক'রে অসুস্থ। তার উপরে আবার প্লুরিসির ব্যথাটাও আছে। গলা খুলে আর গান শুনাতে পারব না, তবে শুন্‌তে যদি ভালবাস, আমার হাংলা বাংলা রচনা শোন।

বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি সেই দিনকার রচিত একটী সঙ্গীত আস্তে আস্তে সুর দিয়া শুনাইলেন।

একটী নিমেষ তোমারে যেদিন ডাকি,
কি যে শান্তিতে কাটে মোর সারাদিন।
একটী নিমেষ তোমারে হৃদয়ে রাখি'
তোমার অপার প্রেমে হয়ে যাই লীন।
প্রাণ-শতদল নিজেরি মধুর গন্ধে
নিজেই ব্যাকুল কি বিপুল যে আনন্দে,
সঙ্গীত জাগে কত অজানিত ছন্দে
ভিতরে বাহিরে কত বাজে বেণু বীণ্,
কত যে করুণা করেছ তুমি হে আমারে
দেখি' নিরুপায় গতিহীন অতি দীন।
তোমার নামের অমল মাধুরী আমারে
শিশুর মতন মুগ্ধ করিয়া রাখে,
আমি কি ডাকিব? নাম(ই) ত' হৃদয়-দুয়ারে
করি করাঘাত নিয়ত আমারে ডাকে,
দিবস-যামিনী কাজ-অকাজের ফাঁকে
তোমারি মোহন অরূপ মূরতি আঁকে
সসীম আমার ক্ষুদ্র হৃদয়-পটে
যতই . ' মন থাকে চির-উদাসীন,—
প্রেমের জোয়ারে প্লাবিলে উভয় তটে
সলিলে কেমনে ভুলিয়া রহিবে মীন?

কুমিল্লা, ত্রিপুরা
৯ই বৈশাখ, ১৩৪১

দেবল ব্রাহ্মণ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—পূজারী ব্রাহ্মণকে হেয় জ্ঞান করার কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেবতার পূজা উপলক্ষ ক'রে দেবল বা পূজারী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। এই সকল ব্রাহ্মণকে যে অর্থ দান করা হ'ত, তা' দিয়ে তাঁরা ধর্ম্ম প্রসারের সহায়তা করুন, এই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। দক্ষিণা প্রদানের উদ্দেশ্য পূজারীর ইন্দ্রিয়-সেবার সাহায্য করা নয়, ধর্ম্মসঙ্ঘের অভ্যুদয়ার্থে এই ধন ব্যয়িত হবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু পূজার ছল ক'রে এরা উদর-পূজায়, ভোগ্যবস্তু আহরণে, সাংসারিক মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধনে দাক্ষিণালব্ধ অর্থ ব্যয় কর্ত্তে লাগলেন। ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত অর্থ এভাবে নিতান্ত জৈব প্রয়োজনে ব্যয়িত হ'তে লাগ্‌ল, দেবতার বিগ্রহ হ'লেন দেবল ব্রাহ্মণের ভোগ্য বস্তুর আহরণ-কর্ত্তা। বিগ্রহই প্রকৃত প্রস্তাবে দেবল ব্রাহ্মণের সেবকের পংক্তিভুক্ত হ'লেন। তার ইন্দ্রিয়-বিলাসের ব্যয় বিগ্রহকেই সংগ্রহ ক'রে দিতে হবে, এই হ'ল বিগ্রহের সাথে সাথে বিগ্রহ-পূজকের সম্বন্ধ। অর্থাৎ আসল ধর্ম্ম ম'রে হ'ল ভূত আর ধর্ম্মের নামে নানা অধর্ম্ম হ'ল সুরু। তাই দেবল ব্রাহ্মণ পতিত, তাই সে নিন্দিত। সে যুগে পূজকের দক্ষিণার পরিমাণটা ছিল বেশী, তাই তার শাস্তিটাও হ'ল বেশী। এযুগে ত' পূজক-ব্রাহ্মণের আবার একটা পান-বিড়ির দোকান না থাক্‌লে পেটই চলে না, তার কাছে ধর্ম্মসঙ্ঘ আর কি প্রত্যাশা কর্ব্বে? তাই তার জন্য এখন আর কোনো পাতিত্যের শাসন নেই।

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। শ্রীশ্রীবাবামণি স্থিরাসনে বসিয়া কিয়ৎকাল ভগবচ্চিন্তা করিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন জিজ্ঞাসু আসিয়া সমবেত হইয়াছেন।

হরি-ভক্তের দুর্ব্বৃত্ততা

শ্রীশ্রীবাবামণি উপাসনার আসন ছাড়িলে একজন প্রশ্ন করিলেন,—দেখুন, সম্প্রতি এখানে একজন ভাগবত-পাঠক এসেছিলেন। তিনি পাঠারম্ভের পূর্ব্বে কতকগুলি বন্দনা উচ্চারণ কর্ল্লেন। তার মধ্যে একটী শ্লোক হচ্ছে,—"হরিনামপরা যে চ হরিভক্তিপরায়ণাঃ, দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ"। অথাৎ যাঁরা হরিনামে রত ও হরিভক্তি-পরায়ণ, তাঁরা দুর্ব্বৃত্তই হোন আর সুবৃত্তই হোন, তাঁদিগকেও বার বার নমস্কার করি। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি হরিভক্ত, তিনি দুর্ব্বৃত্ত হন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বন্দনাকর্ত্তার অভিপ্রায় এই নয় যে, হরিনামপর হরিভক্ত মহদ্ব্যক্তি কখনো দুর্ব্বৃত্ত

হ'তে পারেন কিন্তু দ্রষ্টারা নিজেদের দোষদর্শী চক্ষু দিয়ে, হরিভক্ত মহাপুরুষকেও দুর্ব্বৃত্ত ব'লে ভ্রম ক'রে থাকেন। তাই বন্দনাকর্ত্তার বক্তব্য হচ্ছে এই যে,—যে হরিভক্ত মহাপুরুষের আচরণের মর্ম্মার্থ আমি বুঝতে অক্ষম ব'লে তাঁকে ভ্রম ক'রে দুষ্কৃতিকারী পাপিষ্ঠ ব'লে অপরাধ করি, সেই মহাপুরুষের চরণেও আমার কোটি কোটি প্রণিপাত জানাচ্ছি।

দুষ্কৃতের উদ্দেশ্যে প্রণামের সুফল

প্রশ্ন হইল,—যাঁকে পাপিষ্ঠ ব'লেই জ্ঞান হ'ল, তাঁকে আবার প্রণিপাত করার কি সার্থকতা থাকতে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি,—সার্থকতা এই যে, তাঁকে পাপিষ্ঠ ব'লে জ্ঞান করাতে আমার যে অপরাধ হ'ল, সেই অপরাধের স্খালন হ'ল। দ্বিতীয়তঃ আমি যখন অন্যকে দুর্ব্বৃত্ত বা পাপিষ্ঠ ব'লে গণনা করি, তখন নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকে বড়ই সুবৃত্ত বা ধার্ম্মিক ব'লে অভিমান করি। নিজেকে বেশ দামী লোক ব'লে মনে না কল্লে কি কেউ কখনো অপরের দোষ দেখ্‌তে যায়? সুতরাং যিনি আমার চক্ষে দোষী, মনে মনে তাঁকেও প্রচ্ছন্ন হরিভক্ত ব'লে প্রণাম কল্লে, নিজের অহমিকা, অভিমান, হামবড়াই কমে।

অহমিকার বিচিত্র রূপ

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাম যেমন বিচিত্ররূপী, অহমিকাও তাই। কত রূপ-রূপান্তর ধ'রে ধ'রে

যে তা' আত্মপ্রকাশ করে, তার কোনো ঠিকানাই নেই। তাই অহমিকার ঔদ্ধত্যকে ভূতলশায়ী কর্ব্বার জন্যে প্রায় সকল ধর্ম্মের আচার্য্যেরা কোনও না কোনও বিধান দিয়ে জীবকে তৃণাদপি সুনীচ হবার উপদেশ দিয়েছেন বা তার অনুকূল সদাচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তুমি যখন তোমার দোতালার বারান্দায় আরাম-কেদারায় ব'সে অগণিত পথচারীদের দিকে দৃষ্টি দাও, তখন তোমার মনে অহঙ্কার আসে না? তুমি যখন ষ্টীমারের প্রথম শ্রেণীর কেবিনে যাত্রী হ'য়ে নারায়ণগঞ্জ যাও, তখন তোমার তৃতীয় শ্রেণীর ডেক্‌যাত্রীদের দেখে অহঙ্কার আসে না? তুমি যখন খুব ফোঁটা-তিলক চড়িয়ে বা গেরুয়া প'রে অতিলক অগৈরিক লোকদের মাঝখানে গিয়ে বস, তোমার অহঙ্কার আসে না? তুমি যখন রেষ্টুরেণ্টে ব'সে মাংসের চপ্‌ খাও, তখন পাশের টেবিলের শুধু একখানা বিস্কুট দিয়ে চা-সেবায় নিরত লোকটীকে নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে হয় না? তুমি যখন ধর্ম্মোপদেশ দিতে বস, তখন শ্রোতাদের দেখে তোমার মনে হয় না যে, এরা হচ্ছে—a Congregation of so many fools,—এক দল মূর্খ, এক দল গাধা? তুমি যখন বেদ, উপনিষদ, পুরাণ থেকে গুচ্ছের পর গুচ্ছ সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে থাক, আর তার Context বা পূর্ব্বাপরসঙ্গতির দিকে দৃষ্টিমাত্রও না দিয়ে যথেচ্ছ অর্থ ক'রে যেতে থাক, তখন কি সেই অহমিকাই তোমাকে পরিচালনা করে না, যাকে দমন করার জন্যই দুর্জ্জন-দুষ্কৃতকে প্রণাম দিয়ে সুরু করেছিলে? ক্রোধ,

লোভ, মোহ ও মাৎসর্য্য—অনেকটা একরোখা শত্রু। ঢং তাদের প্রায় একটা নির্দ্দিষ্ট পেটেন্টই ধরা। কিন্তু কাম আর মদ, এরা বিচিত্র-রূপী। জৈব লালসা আর নিজের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান কত রকম পোষাক প'রে যে এসে হাজির হয়, বলা কঠিন। তাই ধর্ম্মাচার্য্যেরা এই দুটোর জন্যই বেশী মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

অভিমান-বর্জ্জিত বিনীত মনে

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি মৃদু কণ্ঠে গাহিলেন,—

অভিমান-বর্জ্জিত বিনীত মনে
কবে আমি পূজিব রে জীবন-ধনে?
দিকে দিকে পুঞ্জিত জঞ্জাল হায়
আমারি অঙ্গে আসি' ভর নিতে চায়,
যত আমি দূরে সরি,
তত আড়াআড়ি করি'
সম্মুখে তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় রণে।

বিপন্ন বিব্রত হ'য়ে নিরুপায়
শরণ লইনু প্রভু তব রাঙা পায়,
ছড়ায়ে করুণা-রাশি
সব অহমিকা নাশি'
টেনে লও মধু হাসি' আপন জনে,
তোমারি মাধুরী মাখা বৃন্দাবনে।

বৈষ্ণবের মৎস্য-মাংসাহার

অপর এক জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—কোনও বৈষ্ণব যদি মৎস্যাশী বা মাংসাশী হন, তাহ'লে তার পক্ষে মৎস্য বা মাংস নিবেদন না ক'রেই খাওয়া উচিত, না, নিবেদন ক'রে খাওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৈষ্ণব-আচার্য্যেরা কেউ বোধ হয় নিজ নিজ শিষ্যানুশিষ্যদিগকে মৎস্য বা মাংস সেবনের কোনো অধিকার কখনো দেন নি। এমতাবস্থায়, বৈষ্ণব ব'লে পরিচয় দিতে হ'লে মৎস্য বা মাংস সেবন না করাই প্রথম কর্ত্তব্য। আর এই কর্ত্তব্য পালনকারীর পক্ষে মৎস্য-মাংস নিবেদনের প্রশ্নই ওঠে না।

ভগবানে মৎস্য-মাংসাদি নিবেদন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে কেউ বৈষ্ণব না অবৈষ্ণব, এই কথার সঙ্গে কোনো সংশ্রব না রেখে বল্‌তে পারি যে, মাছ বা মাংস না খেলে যদি কারো না চলে, তবে তা খাবার আগে ইষ্টদেবকে নিবেদন করা চাই। ভগবানকে তুমি যে নামেই ডাকো, তিল বা তণ্ডুল যদি তিনি হজম কত্তে পারেন, তাহ'লে মৎস্য বা মাংসও তিনি হজম কত্তে পার্ব্বেন। তোমার পেটে যা' সয়, ভগবানের পেটে তা' সইবে না, একথা ভাবা অনুচিত।

নিবেদন ও প্রসাদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু নিবেদন কথাটীর মানে কি? যার উপরে আমার স্বত্ব-স্বামিত্ব-বোধ ছিল, তার উপর থেকে নিজের স্বত্ব-স্বামিত্ব-বোধ তুলে নিয়ে এলাম এবং নিজেকে ভোক্তা জ্ঞান না ক'রে ভগবান্‌কেই ভোক্তা ব'লে মনে প্রাণে স্বীকার ক'রে নিলাম। এই যদি হয় নিবেদনের মানে, তা' হ'লে নিবেদনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খাদ্যবস্তুর ক্ষীর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস বা অন্য যে কোনও নাম থাকুক না কেন, নিবেদনের পরে তার নাম একমাত্র প্রসাদ ব্যতীত আর কিছুই হ'তে পারে না।

অন্যের নিবেদিত বস্তু গ্রহণ

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—অন্য একজনে ভগবানের কাছে এমন বস্তু নিবেদন করেছেন, যা প্রসাদ-রূপে গ্রহণ কত্তে আমার দ্বিধা। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার যার বস্তু-নিবেদন তার তার নিজের করাই ভাল। অন্যে নিবেদন করার পরে তুমি যদি তাকে প্রসাদ ব'লে গ্রহণ কত্তে দ্বিধা বোধ কর, তবে তা গ্রহণ' করার ভণ্ডামি নিষ্প্রয়োজন। যেখানে বহুজনের মিলিত প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে নিবেদন হয়েছে, সেখানে অবশ্য তুমি নিজেকে তাদের সকলের কাছ থেকে আলাদা ব'লে মনে কত্তে না গেলেই ভাল। কারণ, তাতে নিষ্ঠা না বেড়ে অনেক সময়ে

আত্মাভিমানই বাড়ে।

প্রশ্ন।—সমবেত ভাবে নিবেদন হচ্ছে হয়ত এক স্থানে ব'সে, সেখানে ভোগ-নৈবেদ্যাদি তার জন্য বিশেষ ভাবে অর্পিতও হয়েছে। কিন্তু তারই কিছু দূরে আলাদা ক'রে প্রচুর ভোজ্য পানীয় প্রস্তুত বা সংগ্রহ হচ্ছে অভ্যাগতদের দেবার জন্য। সেস্থলে সেই আলাদা স্থানে রক্ষিত বা প্রস্তুত বস্তুগুলিকেও প্রসাদ জ্ঞান কত্তে হবে কি?

উত্তর।—হাঁ, যদি সেই বুদ্ধিতেই তাদের আহরণ ও প্রস্তুতীকরণ হয় এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিবেদিত প্রসাদের কণিকা মাত্রও তাতে স্পর্শ করান হয়।

তোমারে দিয়াছি আমি

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি কবিতা আবৃত্তি করিলেন,—

তোমারে দিয়াছি আমি
জগতের সকল বিভব,
তথাপি "আমার" বলি'
অবিরাম তুলি কলরব।
"তুমি" "আমি" মিলিল না
চলিতেছে বিষম আহব,
কখনো তোমার আর
কখনো আমার পরাভব।
তোমারে আমারে নিয়া

এই যে চলিছে অবিরাম,
তাহার কি নাহি শেষ?
নাহি যতি? নাহিক বিশ্রাম?
তোমারে সাজায়ে প্রভু
রচিতেছি বিলাসের ধাম,
যেখানে পাইছে পূজা
ক্রোধ, লোভ, মোহ আর কাম।
বাহিরে মন্দির-চূড়া
যত উচ্চে তোলে তার শির,
তোমার আনন-খানি
অন্ধকারে ততই নিবিড়;
দুগ্ধ-সমুদ্রের মাঝে
অবাঞ্ছিত শকুনির নীড়
সমুদ্র ভরিল পঙ্কে,
প্রত্যাশা যেথায় শুধু ক্ষীর!
এই ভাবে কতকাল
চলিবে হে ছলনার খেলা,
কতকাল সাজাইব
আত্ম-বঞ্চনার মহামেলা,
ঘূর্ণাবর্ত্ত মাঝে আর
কত কাল ঠেলিব হে ভেলা,
তুমি যদি নিজে আসি'
জঞ্জাল না ঘুচাও এবেলা?

তোমারে করিয়া সার
কৈশোরের প্রথম প্রভাতে
তোমারি পবিত্র নামে
শয্যা ছাড়ি' সূর্য্যদেব সাথে
একত্র করিনু যাত্রা;—
তারো দেখি শেষ নাহি হয়,
বারংবার অন্তরীক্ষে
ঘটিছে কেবলি অস্তোদয়!
এ চঞ্চল অস্থিরতা
আর আমি সহিব না নাথ,
যত সসীমতা ক্ষমি'
বাড়াও তোমার পুণ্য হাত;
তোমাতে নিজেরে ঢালি'
তোমার হইয়া যেতে চাই,
দিতে কিম্বা নিতে যেন
পৃথক সত্তারে নাই পাই।

শিবপুর (ত্রিপুরা)
১০ই বৈশাখ, ১৩৪১

গতকল্য অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি শিবপুর আসিয়াছেন।

কলি প্রবেশের লক্ষণ

প্রাতে একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম-সন্দর্শনে আগমন করিয়াছেন।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার ভিতরে যে কলি প্রবেশ করেছে, একথা কখন বুঝ্‌বে জান? তোমার কোনও কার্য্যে যদি হিতৈষী কোনও ক্রটী ধরেন, তখন যদি তুমি নিজের দোষ অম্বেষণ না ক'রে বন্ধুর প্রতি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হও, তবে জানবে তোমার ভিতরে পাপ কলি এসে বাসা বেঁধেছে। কোনও এক বন্ধু তোমার ঘোরতর বিপদের সময়ে নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে বিনা বাধ্যবাধকতায় বিনা চাপে স্বেচ্ছায় সানন্দে অসীম দুঃখ-বরণ ও ত্যাগ-স্বীকার করেছেন আর তাঁরই বিরুদ্ধে এসে কোনও হীনমনা ব্যক্তি মহত্ত্বের ভাণ ক'রে কতকগুলি সত্য-মিথ্যা অভিযোগ ক'রে গেল। এই সময়ে যদি তুমি তোমার পরম উপকারী সেই বান্ধবের বিরুদ্ধে মন্দ ধারণা পোষণ কত্তে প্রণোদিত হও, তবে জেনো, তোমাতে কলি ভালভাবেই প্রবেশ করেছে। শাস্ত্রে মদ্য, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি ব্যসনের মধ্য দিয়ে কলির প্রবেশ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই যুগেও মানুষ আত্মদোষ পর্য্যবেক্ষণ কত্তে চেষ্টা কত্ত, অকৃতজ্ঞতাকে পাপ ব'লে মনে কত্ত। এই যুগে যদি বেদব্যাস কোনও শাস্ত্র রচনা কত্তেন, তিনি আত্মদোষ পর্য্যবেক্ষণে অনিচ্ছা এবং অকৃতজ্ঞতা এই দুইটীকে কলি-প্রবেশের লক্ষণ ব'লে নিশ্চিতই বর্ণনা কত্তেন।

অন্নপূর্ণা মা থাকিতে আমরা কেন উপবাসী

দ্বিপ্রহরে কুড়িঘর হইতে একটী যুবক উপদেশ-প্রার্থী হইয়া

আসিয়াছেন। বাড়ী বোধ হয় অন্য কোনও গ্রামে। তিনি উপদেশার্থী হইলেও ধর্ম্মজিজ্ঞাসু নহেন। উদরান্ন সংস্থানের সমস্যাই তাঁহার নিকটে প্রধান মনে হইল।

যুবকের যাবতীয় কথা গভীর মনোযোগের সহিত শুনিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রাষ্ট্রশক্তি তোমাদের হস্তমুষ্টির মধ্যে নয় ব'লেই যে তোমরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, একথা সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সত্য নয়। দেশের শাসন দেশের লোকের হাতে না থাক্‌লে শোষণ প্রায় ক্ষেত্রেই অপরিহার্য্য হয়। কিন্তু স্বাধীন দেশেও কতকগুলি এমন চরিত্রের লোক জন্মাতে দেখা যায়, যারা নিজের অন্ন নিজের চেষ্টায় অর্জ্জনে অনিচ্ছুক, নিজের শক্তি নিজে খাটিয়ে জীবিকা-সংস্থানে অরুচি-গ্রস্ত। আইন ক'রে তাদের রোজগার কত্তে বাধ্য কত্তে হয়। ভারত পরাধীন ব'লেই হোক্, কিম্বা এদেশের দর্শন-শাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অদৃষ্টবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে ব'লেই হোক্, অথবা নানা জাতির মিশ্রণে নানা ভাব-প্রভাবের সংঘর্ষে নানা বৈচিত্র্যময় সামাজিক বিড়ম্বনায় দেশবাসী বিড়ম্বিত ব'লেই হোক্, নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জনে ইচ্ছুক লোকের সংখ্যা এখানে বড়ই কম। পিতা যদি ব্যাঙ্কে টাকা রেখে যান, পুত্র তা হ'লে তা বাড়াবে না, ফুৎকারে উড়িয়ে দিতেই ব্যস্ত হয়। শ্বশুরের যদি সম্পত্তি পাওয়া যায়, তাহ'লে জামাতা তার লাভজনক ব্যবসায় পরিত্যাগ ক'রে এসে ঘরজামাই থাকে।

পোষ্যপুত্রকে কদাচিৎই পালক-পিতার সম্পদ বাড়াতে দেখা যায়। ললাটে ফোঁটাতিলক কেটে "জয় রাধে কৃষ্ণ" ব'লে ভিক্ষা-করঙ্ক হাতে ক'রে রাস্তায় বেরুলে যদি পেটটা চলে, তবে শ্রমসাধ্য কৃষিকর্ম্ম এদেশে অগ্রাহ্য। নামজাদা মহন্তের চেলা হ'য়ে যদি মঠে ব'সে মালপোয়া ভক্ষণের পথ থাকে, তবে নিজ উদরান্নের জন্য নিজে শ্রম ক'রে তারপরে দিনান্তে তুলসীতলায় ব'সে জপের মালা নিয়ে পরিশ্রম এখানে অচল। কমিটি বিশেষের স্বেচ্ছাসেবক হ'য়ে চাঁদার খাতা নিয়ে গ্রামে গ্রামে হৈ-হৈ করে বেড়ালে যদি হোটেলের পয়সা না দিতে হয়, তবে নিতান্ত অনিশ্চিত এই হট্টগোলের জীবনেও যথেষ্ট প্রমোদ। এইটীই হচ্ছে ত' বাবা তোমাদের জাতীয় চরিত্র! এই যাদের চরিত্র, এরূপ ব্যক্তিদের হাতে প্রাংশুলভ্য স্বাধীনতা এ'লেও এদের কখনও পেটের ক্ষুধা মেটে না। দেশজোড়া খাদ্য থাকে, তবু তারা উপবাস ক'রে মরে। সেই গানটি শোননি,—"অন্নপূর্ণা মা থাকিতে আমরা কেন উপবাসী?"

আসল মূলধন

মূলধনের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মূলধনের কথা বল্‌ছ ত'? এই আমাদের দেশেই এমন লোক বহু জন্মেছেন, যাঁরা দু'গণ্ডা পাঁচ গণ্ডা পয়সা পুঁজি নিয়ে রাস্তায় অতি নগণ্য জিনিষ ফেরী ক'রে ক্রমশঃ ভাগ্যলক্ষ্মীকে শুধু অঙ্কগতা নয়, পদানতা

ক'রেছেন। টাকাকড়ির মূলধন ত' অতীব তুচ্ছ কথা। আসল মূলধন হচ্ছে তোমার চরিত্র, তোমার নিষ্ঠা, দৃঢ়তার সঙ্গে একটা কাজে লেগে থাক্‌বার রুচি, প্রবৃত্তি ও শক্তি। আসল মূলধন হচ্ছে তোমার শ্রমে নির্ভয়তা, শ্রমে রুচি ও শ্রমে প্রীতি। শ্রম কত্তে যে ভয় পায় না, খাটতে খাটতে তার দক্ষতা এসে পড়ে। আর, দক্ষতা এলেই অতি অল্পে অনেক বড় কাজ হয়। মহেশ ভট্টাচার্য্য, বটকৃষ্ণ পাল এঁরা কেউ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে কাজে নামেন নি। কিন্তু পাষাণ-কঠিন চরিত্র, কঠোর অধ্যবসায়, সুদৃঢ় সঙ্কল্প, অটুট মনোবল, অপরাজেয় শ্রমরুচি—এই ছিল তাঁদের আসল মূলধন। এসব দৃষ্টান্ত দেখ এবং দেখে শেখ। শুধু হা-হুতাশ ক'রে দিন কাটালে চল্‌বে না।

কৃষি বনাম-বাণিজ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—তবে সবাই ব্যবসা ক'রেই বড় মানুষ হবে, এটা কোন কাজের ব্যবস্থা নয়। সর্ব্বপ্রথম কথাই হচ্ছে, ধনী হওয়াই তোমার জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। মহৎ হওয়াই তোমার লক্ষ্য হবে। খালি পেটে যেমন ধর্ম্ম হয় না, শূন্যোদরে তেমন মহত্ত্বের বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। এই কারণে মহৎ হবার পথের বাধা দূরীকরণার্থে তোমাকে পেটের ক্ষুধা মিটিয়ে নিতে হবে। নিত্য-বুভুক্ষু উচ্চচিন্তার অবসর পায় না, এজন্য তোমাকে তনুরক্ষার

একটা নিরাপদ পন্থা বেছে নিতে হবে। কিন্তু তা' যে ব্যবসাই হবে, তার কোনো মানে নেই। ব্যবসায়ীর বিপুল বিত্ত দেখে তোমার প্রলুব্ধ হবার প্রয়োজন নেই, তোমার প্রয়োজন মেদবর্জ্জিত সুস্থ একখানা বলবান দেহ এবং পাপবর্জ্জিত উন্নত চিন্তার আধার-স্বরূপ সুন্দর একখানা নিষ্কলঙ্ক মন। সেই হিসাবে কৃষিই জীবিকার শ্রেষ্ঠ। তবে কৃষিতে বাণিজ্যের মত অগাধ অর্থ নেই। কিন্তু কৃষিতে বাণিজ্যের মত অতিরিক্ত ঝুঁকিও নেই। আমি কৃষকের জীবনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব'লে জ্ঞান করি। তবে, কৃষি-জীবনের সঙ্গে বাণিজ্য-জীবনকে যদি এমন ভাবে সমতুল্য ক'রে নেওয়া যায় যে, একটী অপরটীর অনুকল্প বা অনুপূরক, তাহ'লে সেই জীবনটী আরো নিরাপদ।

বন্যরা ধন্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এখান থেকে ত্রিপুরা পাহাড় খুব দূরে নয়। জমি সুলভ, মৃত্তিকা উর্ব্বর। সেখানে গিয়ে, কিছু টিলা আর কিছু নিম্নভূমি নিয়ে তোমার নূতন গৃহের পত্তন কর। ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজার যদি বুদ্ধি থাকে, তিনি নিজের স্বার্থেই তোমাকে সহায়তা কর্ব্বেন। আর, প্রজার হিতের ভিতর দিয়ে, সমগ্র রাজ্যের হিতের কোনও পদ্ধতিবদ্ধ চিন্তা যদি তাঁর মস্তিষ্কে নাও থাকে, তবু তুমি যদি জনসমাজের নিঃস্বার্থ সেবার অল্প একটু কামনাও সঙ্গে নিয়ে যাও, তাহ'লে

মহারাজার পাহাড়ী প্রজারা বিনামূল্যে ঔষধ পেয়ে এবং বিপদ আপদে হিতকর উপদেশে উপকৃত হ'য়ে সময়ে অসময়ে তোমাকে অনেক সহায়তা কর্ব্বে। তোমরা যাদের বন্য ভাব, তাদের মধ্যে ধন্য মানবের সংখ্যা বড় অল্প নয়, মহত্ত্ব রাজ-প্রাসাদে আর রাজধানীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়। দিল্লী, লাহোর, কল্‌কাতা, বোম্বাই এর বড় বড় জ্ঞানী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদের চেয়ে কোল, ভীল, সাঁওতাল, কুকি, চাক্‌মা, রিয়াং প্রভৃতির ঘরের অশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের প্রাণে অনেক সময়ে মহত্ত্বের বিদ্যুৎ স্থায়ীতর হয়। শিক্ষিত মহতেরা অনেক সময়ে খবরের কাগজের হেডিংএ নিজের নাম ছাপার আশা রেখে মহত্ত্বের বিস্তার করেন। কিন্তু বন্য জাতির মহতেরা জনসভার পৌর সম্বর্দ্ধনার সম্মান বোঝে না, লাটসাহেবের দরবারে আমন্ত্রণের গৌরব বোঝে না, সি. আই. ই. উপাধির মর্য্যাদা বোঝে না। তারা জানে নিজের হৃদয়ের অপরিসীম তৃপ্তি আর মাথার উপরে অনন্ত উর্দ্ধে অবস্থিত এক অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বর। এই জন্যই বল্‌ছি বন্যরা ধন্য।

কৃষি, শিল্প, অর্থ-নীতি ও জগদ্ধিত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেই উর্ব্বর মৃত্তিকার বুকে কোদাল চালাও, জঙ্গল কর সাফ, ভূমির রস নিরর্থক যারা শোষণ কচ্ছে, সেই সব গাছ-গাছড়াকে কর সমূলে উৎপাটন,—যাদের বংশ-বিস্তারে তোমার হিত, তোমার প্রতিবেশীর হিত,

তোমার সমাজের হিত, দেশের হিত, দশের হিত, জগতের হিত, তাদের কর বংশ-বর্দ্ধন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-যন্ত্র বসাও, যাতে বিদ্যুৎ না পেলে তা' ছাড়াও কাজ হয়,—এবং নিজেদের কৃষিজাত দ্রব্যকে শিল্পকলা-মণ্ডিত উৎকৃষ্ট পণ্যে কর পরিণত। তোমার ঘরের জিনিষ দিয়ে অপরের অভাব মিটাও, অপরের জিনিষ নিয়ে এসে নিজের অপূর্ণতা পূর্ণ কর। কৃষিকে ভিত্তি ক'রে এভাবে শিল্পকে গ'ড়ে তোল, আর শিল্পকে ভিত্তি ক'রে অর্থনীতির কাঠাম গড়। তারপরে সেই অর্থবলকে জগদ্ধিতায় প্রয়োগ কর।

কৃষি ও গোসেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু কৃষির গোড়া গোসেবা। গোসেবাতে কুণ্ঠিত থেকে কৃষি এ দেশে একটা প্রহসন। কলের লাঙ্গল জমি চষবে, কিন্তু ভরা বর্ষায় কর্দ্দমাক্ত মাঠে সে এখনো অচল। চাষের জমির সার সরবরাহে সে অপটু। বাড়ীর ঘাটায় মেরামতের কারখানা না থাক্‌লে সে জঞ্জাল। পেট্রল বা ক্রুড অয়েল সংগ্রহের কোনো বিঘ্ন ঘট্‌লে সে অকর্ম্মণ্য। সুতরাং গোসেবাকে ধর মহৎ ব্রত-রূপে। এ কার্য্য ত্রিপুরার পাহাড়ে খুব আয়াসসাধ্য নয়।

পাহাড়ী কর্ম্মীদের সহায়ক প্রতিষ্ঠান

ত্রিপুরা পাহাড়ের অতিশয় নিকৃষ্ট স্বাস্থ্যের কথা উল্লিখিত হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ কথাটা আমিও বল্‌তে

যাচ্ছিলাম। ব্রিটিশ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য যেমনই ভাল, ত্রিপুরা পাহাড়ের স্বাস্থ্য ঠিক্ তেমনি খারাপ, একথা সত্য; কিন্তু হয়ত চিরকাল ব্রিটিশ ত্রিপুরার স্বাস্থ্যও এখনকার মত ভাল থাক্‌বে না। চা বাগানের শ্রীবৃদ্ধির পর থেকে ত্রিপুরা পাহাড়ের যত দূষিত জল নেমে এর ভিতরে ব্রিটিশ ত্রিপুরাকেও মাঝে মাঝে প্লাবিত কচ্ছে এবং মহামারীর মত ভীষণ আকারে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব তার সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে। সুতরাং পাহাড়ী ব্যাধিকে ভয় পাবার দরকার নেই। তবে একটা কাজ দরকার। পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে যাঁরা নিজের উন্নতির সাথে জগতের উন্নতি কামনা কর্ব্বেন, বিঘ্ন-বিপদের দিনে তাঁদের পিছনে গিয়ে সাহায্যের প্রেমময় বাহু প্রসারণ ক'রে দাঁড়াবার জন্য একটা সঙ্ঘবদ্ধ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান চাই। একটা কর্ম্মী রুগ্ন হ'লে তার স্থানে আর একটী কর্ম্মী সরবরাহ করা, কোনো কর্ম্মী রুগ্ন হ'লে অবিলম্বে তাকে নিয়ে এসে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থানে রেখে তার পূর্ব্বস্বাস্থ্য ও পূর্ণবলের পুনরুদ্ধার করা, মারাত্মক কোনো মহামারীর সম্ভাবনা দেখা মাত্র তার প্রতিরোধের জন্য সুব্যবস্থা করা, অর্থাভাব ঘট্‌লে সাময়িক ভাবে মূলধনের যোগাড় ক'রে দেওয়া,—ইত্যাদি ক'রে সর্ব্বপ্রকারে এদের পিছনে লেগে থাকার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান চাই।

মানব-জাতির দেশ

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বিশেষ ক'রে বলার হেতুটী কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই রাজ্যটি তোমাদের নিতান্ত ঘরের কাছে, এমন কি পনের বিশ মাইলের ভিতরেই এর সীমান্ত। নতুবা এ রাজ্যের জন্য আমি "ব্রীফ" নিই নাই। এ রাজ্য থেকে আমার কর্ম্ম, চিন্তা, আদর্শ বা প্রচার এখন পর্য্যন্ত এমন কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা পায় নি, যার জন্য তার তরফ থেকে আমার ওকালতী করার ধর্ম্মতঃ কোনো কারণ আছে। আমার দৃষ্টি কোনো রাজ্যবিশেষের শ্রীবৃদ্ধিতে নয়, আমার সমগ্র দৃষ্টি মানব-জাতির উন্নতিতে। মানুষ মানুষ হোক্ এটাই আমার কাম্য। তোমাকে মানুষ হবার পন্থা বল্‌তে গিয়ে ত্রিপুরা পাহাড়ে বসতি স্থাপন কত্তে বল্‌ছি, অপর একজনকে হয়ত বল্‌ব গওয়ালিয়ার রাজ্যে যেতে। ত্রিপুরাই বল আর অন্য কোনো রাজ্যই বল, কোনো রাজ্যের প্রতিই আমার কোনো পক্ষপাতের কারণ নেই। আমি বল্‌ছি তোমাকে ত্রিপুরা রাজ্যে উপনিবেশ কত্তে, আর নিজে হয়ত গিয়ে উপনিবেশ বসাব বেলুচিস্থানে বা কাশ্মীরে। আমার চক্ষে সকল দেশই মানবজাতির দেশ, কোনও নির্দ্দিষ্ট রাজার দেশ নয়।

ধর্ম্মের পশ্চাতে অর্থের সহযোগ

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে দুই তিনটি যুবক। দ্বিপ্রহরের আলোচিত বিষয়েই কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঐহিকের লক্ষ্য নিয়ে নয়, ভারতের চিরন্তনী সাধনার মর্ম্ম-রহস্যের দিক্ থেকেই আজ

ধর্ম্মের পশ্চাতে অর্থের সহযোগ প্রয়োজন। আবার ভারতে সহস্র সহস্র ধর্ম্ম-বীরের পুনরাবির্ভাব আমরা চাই। চিরকাল ভারতবর্ষকে অজ্ঞান-তমসার সঙ্গেই জড়তার মধ্যে প'ড়ে থাকতে দিতে তোমরা পার না। সহস্র সহস্র ব্যক্তির আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে ভারতের ধর্ম্মকে জগতের বুকে জ্বলন্ত ভাস্করের মত দেদীপ্যমান ক'রে তুল্‌তে হবে এবং ক্ষুধিত উদরে ধর্ম্মচিন্তা অসম্ভব ব'লেই ধর্ম্মকামী প্রত্যেক নরনারীর মুখে পাপ-বর্জ্জিত অন্নের গ্রাস তুলে ধর্‌তে হবে। ধর্ম্মার্থী নরনারীগণের পেটের চিন্তা দূর করার ব্যবস্থা ক'রে তাঁদের ধর্ম্মলাভের চেষ্টাকে নির্ব্বিঘ্ন এবং নির্ব্বিবাদ কত্তে হবে।

হৃষীকেশের অন্নসত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, হৃষীকেশে বাবা কালী-কমলীওয়ালা প্রভৃতির সত্র আছে, যার জন্য সাধু সন্ন্যাসীদের খাওয়া-দাওয়া বা থাক্‌বার স্থানের জন্য মোটেই ভাব্‌তে হয় না। এইরূপ দানক্ষেত্র আরও কতকগুলি আছে। বাবা কালী-কমলীওয়ালার সত্রে বেলা দশটায় জন পিছে তিন খানা ক'রে রুটি আর এক মুষ্টি অন্ন পাওয়া যায়। পাঞ্জাব, নেপাল ও সিন্ধু সত্রেও বড় বড় চার পাঁচ খানা রুটি মিলে। একজন বাঙ্গালী সাধু এক বেলায় এত রুটি খেতে পারেন না। আবার বিকাল বেলায়ও চার জায়গা থেকে ঐ রকম আটখানা রুটি

পাওয়া যায়। যাঁরা অসুস্থ, তাঁরা বাবা কালী-কমলীওয়ালার সত্র থেকে রোজ আধ সের ক'রে দুধ ও কিঞ্চিৎ চিনি পান। প্রত্যেক পনের দিন অন্তর অন্তর ক্ষৌর-কার্য্যের জন্য টিকিট পান এবং নাপিতকে সেই টিকিট দিয়ে বিনামূল্যে ক্ষৌরী হন। এসব কতকগুলি সুবিধা থাকাতে কতক সংখ্যক সাধুর নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মচর্চ্চার একটা পথ স্থানে স্থানে আছে।

দান-সত্র সমূহের ব্যর্থতার কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর মধ্যে কয়জনের জন্য এই সুবিধা? ধর্ম্মার্জ্জন প্রত্যেকের প্রয়োজন, আর দান-সত্র সমূহের নিশ্চিন্ত অন্নের ব্যবস্থা মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েক জনের জন্য। তাও আবার সকল সময়ে সৎপাত্রেই অন্ন বিতরিত হচ্ছে না। অনেক দাগী আসামী চুরি বা ডাকাতির ওয়ারেন্ট ঢেকে রাখ্‌বার জন্য গেরুয়া প'রে এসব সত্রের অন্ন গ্রহণ করে। অনেক পেন্সনভোগী চিরসংসারী পেন্সনের টাকাটা পুরাপুরি বাঁচাবার জন্য লাল কাপড় প'রে এখানে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকৃত সাধকদের মধ্যে অনেক লোককে বিমুখ হ'য়েও ফিরে আসতে হয়। অবশ্য, কে প্রকৃত সাধু, কে বা অসাধু, তা নির্ণয়ের জন্য সত্রগুলিতে প্রশ্ন করার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু কোন্ প্রশ্নের কি জবাব দিলে সত্রের অন্ন পেতে বাধা হয় না, দুষ্ট লোকের পক্ষে তা আয়ত্ত কর্ত্তে দীর্ঘ সময় লাগে না। এর ফলে এ সব পবিত্র দান-সত্র

প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। অনেক সময়েই সাধক প্রতিপালিত না হ'য়ে এসব প্রতিষ্ঠানের দানের ভিতর দিয়ে অসাধক কতকগুলি অকর্ম্মণ্য অলসও প্রতিপালিত হচ্ছে। সংসারের লিপ্সা যাদের বিন্দুমাত্রও কমে নি অথচ সংসারে থেকে খেটে খেতে নারাজ, এমন কতগুলি কুঁড়ের বাদশা দিব্যি সাধুবেশ ধারণ ক'রে আলস্যে দিনকর্ত্তনের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ কচ্ছে।

দানসত্র তথা স্বাবলম্বন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর দেখ, শুধু ভিক্ষান্ন দিয়ে একটা জাতিকে-জাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। দেশের সর্ব্বত্র-প্রসারিত বিশাল ক্রয়-বিক্রয়-কেন্দ্রসমূহ সৃষ্টি ক'রে সেই সকল স্থানে যথাযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগের দ্বারা শত শত নরনারীর পবিত্রতা ও নৈতিক সংযম অক্ষুণ্ণ রেখেই ধর্ম্মোপেত অন্নে উদরের ক্ষুধা নিবারণের উপায় ক'রে দিতে হবে। দানসত্র নয়, ধর্ম্মতঃ উপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্রই হচ্ছে সমস্যার প্রকৃত সমাধান। ভিক্ষান্ন নয়, স্বোপার্জ্জিত অন্নই হবে সাধক-জীবনের সাধন-ভজন চালাবার সুব্যবস্থার ভিত্তি। হরিদ্বার-হৃষীকেশের দানসত্র-সমূহের প্রয়োজন হচ্ছে বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, জরাজীর্ণ, দেহশ্রমে অপটু সাধন-জীবন-যাপন-কারীদের জন্য। যারা শ্রম ক'রে নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জন কর্ত্তে পারে, তাদের জন্য ঐসব দানসত্র নয়। যে নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জনে সমর্থ,

প্রতিদিন শ্রমাবসরে নিশ্চিন্তে ব'সে দুদণ্ড ক'রে ভগবানকে ডাক্‌তেও তার সমর্থ হওয়া উচিত। দানসত্র এ যুগের আদর্শ নয়, স্বাবলম্বনই এ যুগের আদর্শ হবে। তুমি অর্জ্জন কর্ব্বে তোমার ধর্ম্ম, তুমি অর্জ্জন করবে তোমার স্বর্গ, তুমি চাইবে তোমার নিজের পরকালের কুশল, তবে তুমি পরের দানের প্রত্যাশা কেন কত্তে যাবে? বলিষ্ঠ বলদ হালের জোয়াল টেনে নিজের শ্রমের বলে নিজের তৃণাশনের উপরে দাবী করে, দুগ্ধদা গাভী গৃহস্থকে প্রচুর দুগ্ধ দিয়ে তার বিনিময়ে চণা-ভূষি-খইল প্রত্যাশা করে,—আর দুর্ব্বল ক্ষীণেন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হ'লে পিঁজরাপোলে দারিত্বহীন নিশ্চিন্ত সেবার প্রত্যাশা করে। হরিদ্বারে হৃষীকেশে দানসত্র থাকা উচিত, কিন্তু নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জনে অক্ষম, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল-দেহ সাধুদেরই জন্য। অপর সাধুরা সমাজের স্কন্ধের উপরে নিজেদের গুরুভার চাপাতে বিরত হবেন, এইটী হচ্ছে এই যুগের স্ফীতোদরের গণদেবতাদের অলঙ্ঘনীয় আদেশ।

চুয়ান্ন লক্ষ বনাম চল্লিশ কোটি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধুদের কৃষি কত্তে নেই, উনানে আগুন ধরাতে নেই, এসব ব'লে প্রতিবাদ উঠ্‌বে। কিন্তু সাধুদের সম্পর্কে এসব আপত্তি তখনই গ্রাহ্য ছিল, যখন ভারত স্বাধীন ছিল, যখন নরপতিদের প্রচুর ক্ষমতা ছিল লক্ষ লক্ষ সাধুকে অন্ন দেবার, যখন সাধুরা সমাজের এক বিশাল

শক্তি ব'লে বিবেচিত হতেন। আজ ভারতের অন্নের মালিক ভারতবাসী নয়, সারা পৃথিবীর ছত্রিশ জাত, আজ সাধুরা সমাজের এক মহাশক্তি নন, তাঁরা আজ সমাজের এক বিষম গলগ্রহ,—অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এঁদের পরিত্যাগ করার রুচি দেশের নেই, ভবিষ্যতের সম্পর্কে আতঙ্ক বশতঃ এঁদের প্রতি প্রাণের অনুরাগও দেশের নেই। সাধুরা আজ ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছেন। তাই সাধুদের অনেক প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন ক'রে যুগের গতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। আত্মপ্রতারণা ক'রে লাভ ত' নেই। সাধুদের যদি কৃষি কত্তে নেই, তবে এক একজন সাধু আবার মস্ত মস্ত মঠের মোহান্ত হ'য়ে বিরাট জমিদারী তদারক ক'রে হাতীতে চ'ড়ে বছর বছর নজরাণা আদায়ের জন্য বের হচ্ছেন কেন? এসব অসামঞ্জস্যেরও ত' একটা সত্যিকারের জবাব চাই! নইলে যুক্তিবাদী বর্ত্তমান মানব এঁদের কথা, এঁদের মতামত শুন্‌বেই বা কেন, গ্রাহ্যই বা কর্ব্বে কেন? কিন্তু বাছা সাধুদের সংখ্যা ত' মাত্র চুয়ান্ন লক্ষ, পরন্তু ভরতবাসীর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটি। চুয়ান্ন লক্ষ তাঁদের নিজের মনোমত প্রথা পালন করেন করুন, চল্লিশ কোটির পথ আলাদা।

ভবিষ্যদ্-বংশাবলীর অদৃষ্ট-চিন্তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চুয়ান্ন লক্ষ সাধু যদি ভিক্ষাটন ক'রেই বেড়ান, বেড়াবেন। কিন্তু চল্লিশ কোটি লোকের জন্য

কখনো ভিক্ষাটনের ব্যবস্থা হ'তে পারে না। ভবিষ্যদ্-বংশাবলীর অদৃষ্টে কি আছে, সে চিন্তা এই চুয়ান্ন লক্ষ না কত্তে পারেন, কারণ বৈধ-ভাবে তাঁদের কোনো বংশাবলী থাক্‌তে পারে না, কিন্তু ভবিষ্যদ-বংশাবলীর অদৃষ্ট-চিন্তা চল্লিশ কোটি কখনো ছেড়ে দিতে পারে না। ছেড়ে দিতে গেলে তা' হ'বে তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক, তা হবে তাদের পক্ষে আত্মহনন।

কৃষি ও উপনিবেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মকে বাঁচাবার জন্যই ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণকারীদের জন্য বিশাল কৃষিশালা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে কর্ম্মসংস্থান ক'রে দিয়ে দেশের সহস্র সহস্র নর-নারীকে দুর্ভিক্ষের করাল আক্রমণ হ'তে রক্ষা কত্তে হবে। এই তোমাদের ঘরের কাছে লক্ষ লক্ষ বিঘা অনাবাদি জমি, আজ ত্রিপুরা রাজ্য, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, খাসিয়া পাহাড়, গারো পাহাড়, লুসাই পাহাড়, মণিপুর রাজ্য প্রভৃতি অঞ্চলে বৃথাই পড়ে রয়েছে। পদ্ধতিবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা চালাতে পারলে লক্ষ লক্ষ পরিবার গিয়ে সেই সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপনে সফলতা অর্জ্জন কত্তে পারে এবং নিজেদের ও সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়ক হ'তে পারে। আর সব পতিত ভূমির কথা ছেড়ে দিলেও, একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই প্রায় এক শত মাইল দীর্ঘ স্থান জুড়ে উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ভূমি প'ড়ে রয়েছে। দেশের লোক অল্পই

সেই দিকে চিন্তা পরিচালন করেছেন। হা-অন্ন জো-অন্ন নিয়ে সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা কিছু কিছু হচ্ছে, বড় বড় সহর এবং সহরতলীগুলির ভিড় কমিয়ে নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রান্তরে অন্নার্জ্জনেচ্ছুদের পরিচালনের চিন্তা কত্তে কাকে কাকে দেখেছ? একাকী একটী ব্যক্তি বা দুইটী পরিবার হয়ত একথা ভেবেছেন এবং সকল দিকে প্রস্তুত না হ'য়েই বনে-জঙ্গলে ঢুকেছেন। ফলে এসব পথের পথিকদের মৃত-কঙ্কালগুলি ঐ সব আরণ্য-প্রদেশের গভীর জঙ্গলে পচে পচে ক্রমশঃ জমির সার বৃদ্ধি কচ্চে। আর কিছু লাভ হয়নি।

উপনিবেশ স্থাপনে পদ্ধতিবদ্ধ চেষ্টা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চেষ্টা যতক্ষণ পদ্ধতিবদ্ধ না হবে এবং পদ্ধতির অনুবর্ত্তন যতক্ষণ না সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে হবে, ততক্ষণ এসব অস্বাস্থ্যকর ও দুর্গম স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা সফল হ'তে পারে না। কিন্তু সে ভাবে কোনো চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত হয়নি, এমন কি চিন্তাও হয়ত সেই ধারায় কেউ করেন নি। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের বলি মাত্র। কিন্তু আজ আমি যা বলছি, তা' কর্ম্মে রূপান্তর ঠিক্ কাল প্রভাতেই নাও হ'তে পারে। আমি বলি, আর তোমরা শোন। অশ্রদ্ধায় শোন, একথা বলতে পারি না, কিন্তু শোনার পরে সবাই মিলে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে পাচ্ছ না। প্রত্যেকের কল্পনা ব্যক্তিগত সুখ, কারো ঝোঁক শুধু ব্যক্তিগত adventure-এর দিকে।

দশজনকে নিয়ে সুখের কল্পনা বা দশজনকে নিয়ে একটা নূতন কিছু করার কামনা, এ' ত' তোমাদের জেগে উঠ্‌ছে না!

উপনিবেশ ও সুচিন্তিত ধারণা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সঙ্ঘবদ্ধ উপনিবেশ পরিচালনের জন্য গোড়ায় যে ভাবে প্রস্তুত হওয়ার আবশ্যকতা, তদ্বিষয়ে আগে চাই সুচিন্তিত ধারণা। নিজেদের অনুমানগুলিকে যথাসাধ্য অভ্রান্ত করার জন্য এই পথের পূর্ব্বগামীদের খুঁজে খুঁজে বের ক'রে কাকে কি অসুবিধার দরুণ ক্ষতি স্বীকার কত্তে হয়েছে এবং কি কি কারণে তাদের চ'খের সম্মুখে অপরেরা মৃত্যু বরণ করেছে, সেই সব তথ্য সংগ্রহ কত্তে হবে। একটা মহাযুদ্ধ চালাতে হ'লে সমর-মন্ত্রীর যেমন শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষের সমগ্র বলাবল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নিতে হয় এবং সর্ব্বপ্রকার সম্ভব-অসম্ভব দুর্য্যোগ ও দুরবস্থার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে যাবতীয় আয়োজন সুসম্পন্ন কত্তে হয়, তোমাদের এ কাজেও তাই আবশ্যক। গভীর চিন্তাশক্তির, ব্যপক কল্পনাশক্তির সুদূরপ্রসারিত ভবিষ্যদ্দৃষ্টির হবে প্রয়োজন। পৃথক্ ভাবে একটা একটা ক'রে ঔপনিবেশিক কেন্দ্র তোমরা গ'ড়ে যেতে পার, কিন্তু সবগুলি পৃথক্ কেন্দ্রকে একটা মহাকেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে বহুযুগব্যাপী জন-স্রোত পরিচালনের একটা সুগভীর ও কার্য্যকর পরিকল্পনার বাঁধন এতে থাকা চাই।

ভৈষজ্য উদ্যান ও ফলের বাগান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে জিনিষ শুষ্ক অবস্থায় বিক্রী চলে অথচ যার দাম বেশী, এমন সব বনাজ্জি বেনেতি উপাদান নিজেদের উদ্যানে উৎপন্ন ক'রে বাইরে সরবরাহ করার জন্য বিলনিয়া থেকে সুরু ক'রে মাইলের পর মাইল স্থান নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিশাল ভৈষজ্য-উদ্যান সমূহ তোমরা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেতে পার। এ রাজ্যের রাজার আইন তাতে বাধা দেয় ত' পার্ব্বত্য প্রদেশের অভাব উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে কোনো দিকে ত' নেই। তোমরা যে-কোনো পার্ব্বত্য অঞ্চলকে শত শত ভৈষজ্য-উদ্যান তথা কৃষিউদ্যান দিয়ে পরিকীর্ণ ক'রে রাখতে পার। মূল মহাকেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য ও জনবলের সহায়তা নিয়ে এভাবে তোমরা তোমাদের ভবিষ্যদ্-বংশীয়দের জন্য স্থায়ী এবং লাভজনক উপনিবেশ রচনা কত্তে পার। একটা পদ্ধতিবদ্ধ চেষ্টার ভিতর দিয়ে যদি ধারাবাহিক উদ্যম চলতে থাকে, তবে জগতে কি আর অসাধ্য আছে? নেপালের পাহাড় থেকে নানা ভৈষজ্য-উপাদান এসে পাটনার বাজারে হাজির হয়, সেইখান থেকেই আবার কিনে এনে বাংলার প্রায় দুই লক্ষাধিক কবিরাজ নিজেদের ঔষধাদি প্রস্তুত করেন। কিন্তু বাংলার কাছাকাছি পাহাড়গুলিতে যদি তার কিছু-কিছুরও চাষ সুরু হয়, তবে সে জিনিষগুলি একেবারে তৈরী বাজার হাতের

কাছে পাবে। এমন অনেক বেনেতি পদ আছে, যা এক বছরে উৎপাদিত হয়। প্রথম প্রথম সেই সব সরবরাহ কত্তে কত্তে আস্তে আস্তে তোমরা ফলের বাগানও সাজিয়ে তুল্‌বে। কৃষির প্রাথমিক শিক্ষাটুকু হাতে-হেতেড়ে অর্জ্জন ক'রে তারপরে যারা যাবে ভৈষজ্য-উদ্যান গড়্‌তে, দেখ্‌তে না দেখতে কয়েক বছরের ভিতরে তারা ঐ অর্থহীন লক্ষ্যহীন সহস্র সহস্র জঙ্গলা গাছের বনকে আয়প্রদ লক্ষ্যযুক্ত প্রীতিবর্দ্ধক ফলের বাগানে পরিণত ক'রে তুল্‌বে। ভৈষজ্য-উদ্যানের পরিচর্য্যায় যতগুলি লোককে অন্নার্জ্জনের পথ ক'রে দেওয়া যায়, ফলোদ্যানের পরিচর্য্যায় তার দশগুণ লোককে কর্ম্মের সংস্থান ক'রে দেওয়া সম্ভব। উপযুক্ত বাজারে নিয়ে পৌছাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'লে দৈনিক একলক্ষ মণ ক'রে পেয়ারা, কুল, পেঁপে, কালোজাম বা আনারস বিক্রী অসম্ভব নয়। দৈনিক দশলক্ষ মণ কাগজী লেবু উৎপাদন কর্ল্লেও তার কখনো চাহিদা কমবে না। যেখানে টাট্‌কা ফল বাজারে পৌছান সম্ভব নয়, সেখানে সামান্য শিল্প বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে চাট্‌নি, জেলি, মোরব্বা, প্রভৃতি তৈরী কর্ল্লে তাতে চারআনার খরচের জিনিষ দিয়েই চারটাকা আয় সম্ভব হ'তে পারে। বনপাহাড়ের মাঝে মাঝে কয়েকটা কৃষি-ক্ষেত্রের কেন্দ্রবর্ত্তী স্থানে একটা ক'রে যদি ফল-রক্ষণের, জেলি, চাট্‌নি প্রভৃতি প্রস্তুত-করণের কারখানা থাকে, তাহ'লে পাহাড়-জোড়া উৎপাদিত লক্ষ মণ ফলের পরিপূর্ণ সদ্‌ব্যবহারের ব্যবস্থা হ'য়ে যেতে পারে এবং শুধু ভারতের সর্ব্বত্রই নয়,

ভারতের বাইরেও নানা দেশে রপ্তানি ক'রে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা বিদেশ থেকে দেশে আনা যেতে পারে। এক একটা ফলের চাষ পাঁচ সাত, দশ লক্ষ বিঘা ভূমি নিয়ে কর্‌লে ও বণ্টনের সুব্যবস্থা থাক্‌লে উৎপাদনের পরিমাণ দেশের প্রয়োজনের চাইতে অধিক হ'য়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, একথা নিশ্চিত জানবে। জিনিষের চাহিদার অন্ত নেই, কিন্তু কোন্ ফসলের দাম হবে সোণার মত, সেই দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন কমলোকে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে অথবা একটা বিশাল পরিকল্পনার অঙ্গীভূত ক'রে কোনও চেষ্টাও এ পর্য্যন্ত হয় নি।

পার্ব্বত্য উপনিবেশে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুর্গম, অরণ্য-বহুল বা পার্ব্বত্য প্রদেশে উপনিবেশ গড়্‌তে গেলে অনেকগুলি বিপদ-আপদ বাধা-বিঘ্ন আছে। কিন্তু তাদের দমনের জন্য সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাও প্রয়োজন। তা' তোমাদের অবলম্বন কত্তে হবে। সকল মাটিতে সকল ফসল ফলে না, সকল চাষে সকলে সমান অভিজ্ঞ হ'তে পারে না। এজন্য ভ্রম-প্রমাদ এড়িয়ে চল্‌বার সদুপদেশ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির হিতোপদেশ সহজলভ্য করা চাই। সকলে সমান মূলধন নিয়ে কৃষির কাজে হাত দিতে পারে না, আর মূলধনের কত অংশ যে কোন্ কাজে ব্যয়িত হ'লে উদ্দেশ্য সফল হবে, তাও আগেই হঠাৎ নির্ণয় করা সহজ নয়। হাজার বাজেট ক'রে রেখেও কার্য্যকালে তাল

সামলান যায় না, অপ্রত্যাশিত অবস্থা বা অজ্ঞাত বাধা এসে হিসাবের অঙ্ক গুলিয়ে দেয়। এজন্য প্রয়োজনের সময়ে কাজ না আটকে যায়, তার জন্য সাময়িক তাল সামলাবার মত অর্থের সরবরাহ করার ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া চাই। পরিচালক পাওয়া গেলেও অনেক সময়ে এসব কাজে কিঙ্করের অভাব হয়, জন-মজুরের অভাবে দামী কাজ প'ড়ে থাকে বা সময়ের কাজ সময়ে না ক'রে অসময়ে করার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়। এজন্য জন-মজুর, কুলী-কামিন, করাতি, কাঠুরে, লোহা ও কাঠের কারিকর এ সব সময়মত উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে। গরু ছাড়া কৃষি চলে না, কিন্তু পাহাড়ীদের নিজেদের প্রয়োজনীয় গরুই আছে কি না সন্দেহ, সুতরাং বাইরে থেকে পাহাড়ী আবহাওয়া সহ্য কত্তে সমর্থ হালের গরু, দুধের গাই অবিরাম সরবরাহ করার একটি অতি নিখুঁত বন্দোবস্ত রাখতে হবে। এমন কি পার্ব্বত্য মূষিকের হাত থেকে ফসল এবং গৃহের তৈজস পত্র বাঁচাবার জন্য বস্তা-বোঝা বিড়ালও হয়ত চালান দেবার ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন হবে। রক্ষিজাতীয় গৃহপালিত পশু বল্‌তে কুকুরের মত কেউ নেই এবং বন-জঙ্গলের বিজন-বাসে এই সঙ্গীটী না থাক্‌লে বিপদের ভয় পদে পদে। সুতরাং ভাল জাতের কুকুরের বংশ বৃদ্ধি ক'রে প্রয়োজনমত সংখ্যায় তাও চালান দেবার সুব্যবস্থা প্রয়োজন। একটা কৃষিক্ষেত্রে অসাফল্য হ'লে অপর কৃষিক্ষেত্রের আয়ের দ্বারা সঙ্ঘের ক্ষতি সামলাবার ব্যবস্থা

প্রয়োজন। একটা কৃষি-উদ্যানে আয় সুরু হ'তে দেরী হ'লে যাতে অপর উদ্যানের আয় দিয়ে তাল সামলান যায়, তার ব্যবস্থা প্রয়োজন। এখানে সেখানে তালে-বেতালে কৃষি-প্রতিষ্ঠান সব না গ'ড়ে এমন একটা নক্‌সার অধীন ক'রে সব কেন্দ্র-নির্ব্বাচন প্রয়োজন যে, প্রথম গ্রামটি যেন দ্বিতীয়টীর base হয়, দ্বিতীয়টী যেন তৃতীয়টীর base হয়। এক একটা কৃষিকেন্দ্র পরবর্ত্তী কেন্দ্রের হবে যেন আরোহণের সিঁড়ি বা পাদপীঠ। তার ফলে ধীরে ধীরে মূল মহাকেন্দ্রের সরবরাহ অনধিক ক্লেশে দূর-দূরান্তরে অবস্থিত কৃষিকেন্দ্রে গিয়েও পৌঁছুবে, এখন তা জনেরই সরবারহ হোক বা ধনেরই সরবরাহ হোক কিম্বা তৈজস-সামগ্রী, ঔষধ, পথ্য, যন্ত্রপাতি বা পুস্তকেরই সরবরাহ হোক, কিম্বা নূতন নূতন আবশ্যকীয় জন্তু-জানোয়ারেরই সরবরাহ হোক। একদল কর্ম্মী শ্রান্ত, পীড়িত, আত্ম-বিশ্বাস-বর্জ্জিত, বিমর্ষ, হতাশ বা পলায়মান হ'লে যাতে সৈনিক-বাহিনীর মত আর এক দল কর্ম্মীকে সেই স্থানে সঙ্গে সঙ্গে কাজের ভার দিয়ে বসিয়ে দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা দরকার। কোনও কর্ম্মী রুগ্ন বা হীনবল হ'লে সঙ্গে সঙ্গে যাতে তাকে নীচের মূলকেন্দ্রে ফিরিয়ে নিয়ে এসে শুশ্রূষা, চিকিৎসা, পথ্য ও বিশ্রাম দিয়ে পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্ ক'রে তোলা যায়, তার ব্যবস্থা দরকার। বিবাহে অনিচ্ছুক নয় কিন্তু অবিবাহিত যেসব কর্ম্মীরা পাহাড়ের কাজে যাবে, তারা যদি পাহাড়ী জাতির ভিতরে উপযুক্ত ভাল মেয়ে পায় এবং পাহাড়ী সমাজের মধ্যে গুরুতর

কোনো বিপ্লবাত্মক বিক্ষেপ সৃষ্টি না ক'রে যদি সেই মেয়েকে বিবাহ দ্বারা পত্নীত্বে গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করে, তবে তাদের এই কার্য্যকে সম্পূর্ণরূপে নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সমর্থন দেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। ব্রহ্মদেশে হাজার হাজার বাঙ্গালী গেল এবং যাচ্ছে, বিবাহের এদের প্রয়োজন ছিল এবং আছে, তাই অসংখ্য বর্ম্মী মেয়েকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ কল্ল এবং কচ্ছে কিন্তু দেশে ফিরে আসার সময়ে যে তারা পুত্রকন্যাসহ সবগুলি স্ত্রীকে প্রতারণা ক'রে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এল বা আস্‌ছে, তার অন্যতম কারণ এই যে, এই মিলনের পশ্চাতে এদেশের সমর্থন নেই। নারীর সঙ্গে পুরুষের মিলনের চেষ্টা যতক্ষণ স্বাভাবিক থাক্‌বে, ততক্ষণ এই মিলনকে স্বীকার ক'রে নিয়ে ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততিকে পিতৃ-গোত্রে পরিচয় দেবার অধিকার দিতেই হবে। এ অধিকার না দিলে সমাজ হবে ধ্বংস, সমাজের মানুষ হবে চরিত্রহীন আর ভিন্ন সমাজের নারীরা হবে পতিত। এতগুলি অপরাধ থেকে বেঁচে চলবার ব্যবস্থা তোমাদের কত্তেই হবে। তাই বল্‌ছি, পাহাড়ী মেয়েকে তোমাদের ঘরের ছেলেরা গিয়ে বিয়ে ক'রে তাকে বিজন বনের কঠোর ক্লেশের চিরসঙ্গিনী ক'রে নিলে সেই মেয়েকে আশীর্ব্বাদ দিয়ে তোমাদের সমাজে সম্মানের সহিত বরণ ক'রে তুলে নিতে হবে। পাহাড়ী মেয়ের সাথে বিয়ে হবার পরে কিম্বা দেশে এসে দেশী মেয়ের সাথে বিয়ে হবার পরে বিবাহিত দম্পতী পাহাড় অঞ্চলে যুগলে কাজ সুরু করলে

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যাতে স্ত্রীটিকে প্রয়োজন হ'লে নীচের মূল মহাকেন্দ্রে বা মধ্যবর্ত্তী স্থানের কোনও উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে নিয়ে এসে গর্ভকাল, প্রসবকাল ও স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার-কালটী উপযুক্ত যত্নে শুশ্রূষায় ও তত্ত্বাবধানে রেখে নির্ব্বিঘ্ন হওয়া যায় এবং তারপরে সকল দিক্ নিরাপদ দেখে শিশু সহ নবপ্রসূতি মাতাকে উপযুক্ত সময়ে পুনরায় পাহাড়ে ফিরিয়ে নেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা রাখ্‌তে হবে। পাহাড়ীদের সাথে রক্তসম্বন্ধ স্থাপন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবাগত বধূদের ভিতরে আদর্শ শিক্ষা ও দীক্ষার প্রসারের সুব্যবস্থা কত্তে হবে, নইলে তাদের গর্ভে কতকগুলি কুলি-মজুর ছাড়া আর কিছুই জন্মাবে না। যাতে পাহাড়-অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ স্থাপনকারীদের মধ্যেই বৈধভাবে রক্ত-সম্বন্ধ ও তজ্জনিত আত্মীয়তা-কুটুম্বিতার সৃষ্টি ক'রে বনবাসকেও একান্ত প্রীতিপ্রদ ও রুচিকর ক'রে তোলা যায়, তার ব্যবস্থা রাখ্‌তে হবে। সেই দুর্গম অঞ্চলে মণিপুরী অশ্বের প্রবর্ত্তন ক'রে যাতায়াতকে যাতে সহজতর সুগম করা যায়, আর অশ্বসরবরাহকে সহজতর করার জন্য যাতে মূল মহাকেন্দ্রের সন্নিকটে বা পাহাড়ের কেন্দ্র-বিশেষে অশ্ব ও অশ্বিনীগণের বংশবৃদ্ধি-কল্পে বিস্তীর্ণ অশ্বশালা ও অশ্বচারণ-প্রতিষ্ঠানসমূহ রাখা হয়, তারও ব্যবস্থা কত্তে হবে। প্রথম সময়েই প্রতি উপনিবেশে একজন ক'রে শিক্ষিত চিকিৎসক রাখা সম্ভব হবে না, এজন্য প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন উদ্যান-উপনিবেশে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন ক'রে যাতে

একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়মিত ভ্রমন ক'রে সকলের স্বাস্থ্য দেখে যেতে ও আবশ্যকীয় চিকিৎসাগত সাহায্য ক'রে যেতে পারেন এবং মাসে অন্ততঃ দুবার ক'রে স্বাস্থ্য সম্পর্কে এবং নিজেদের চিকিৎসা নিজেরাই আপৎকালে চালিয়ে যাবার যোগ্যতা অর্জ্জনের মত শিক্ষা দেবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকেরা ক্লাস ক'রে যেতে পারেন, সে সব ব্যবস্থা রাখ্‌তে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম এই তিনটীকে নিয়েই পাহাড়ে যেতে হবে, এই তিনটীকে না খুইয়ে যাতে বজায় রাখা যায়, বাড়ান যায়, প্রচার করা যায়, নিরক্ষর পাহাড়ীদের লিখতে শিখিয়ে পড়্‌তে শিখিয়ে তোমার সাহিত্যের কৌস্তুভমণির সাথে পরিচিত ক'রে মহামারী-পীড়িত পাহাড়ীদের প্রাণ রক্ষা ক'রে, স্বল্পধর্ম্মবোধযুক্ত পাহাড়ীদিগকে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বোধে উদ্দীপিত ক'রে, সমগ্র মানবজাতির গৌরব বৃদ্ধির সম্পূর্ণ আয়োজন কি ক'রে করা যায়, তাই তোমাদের দেখতে হবে। কিন্তু এইরূপ সকল দিকে একটা সুশৃঙ্খল সুব্যবস্থা রেখে পাহাড় অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের চিন্তাই এ দেশে এখনো কেউ করে নি। তোমাদের তা' কত্তে হবে। *

(* উল্লেখ প্রয়োজন, শ্রীশ্রীবাবামণি নিজে এই কার্য্যে সাত বৎসর পরে ১৩৪৮এ হাত দিয়াছিলেন, বিলনিয়ার নিকট পরশুরামে তাহার base-ও করিয়াছিলেন। সেই উদ্যম সফল হয় নাই। আর, বর্ত্তমানে দেশ-বিভাগ হেতু এই পরিকল্পনা রূপান্তর ও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে।)

শিবপুর (কুমিল্লা)
১১ই বৈশাখ, ১৩৪১

জীবনের মহৎ সৌভাগ্য

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি বিভিন্ন গ্রামের সমবেত যুবকদের নিয়া মাঠে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বাঘাউড়া গ্রামের দিকে যাইতে যাইতে একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—জীবনে সৌভাগ্য ব'লে গণনা কর্ব্বে কাকে জানো? যেখানে ভগবানের নাম-কীর্ত্তন হয়েছে, মহিমা-বর্ণন হ'য়েছে, সাধকেরা যেখানে তাঁকে স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন করেছেন, সেই স্থানের একটী কণা ধূলির রেণু যদি ভক্তিভরে শিরে স্পর্শ কত্তে পারো, তবে জান্‌বে, এটা জীবনের মহৎ সৌভাগ্য।

আত্মাহুতি দিয়া ভক্ত
করে তাঁর নাম গান,
নিজেরে বিলুপ্ত করি'
সবারে প্রদানি' প্রাণ,—
সে স্থান পরম তীর্থ
বিশ্বপ্রভু নিরঞ্জন
প্রতি ধূলি-কণা মাঝে
আনন্দে করে রমণ।

সৎসঙ্গের সৌভাগ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনের আর এক মহৎ সৌভাগ্য হচ্ছে, সৎসঙ্গে বাসের সুযোগ পাওয়া। যাঁর সঙ্গ লাভে চিত্তে প্রেমের মুকুল প্রস্ফুটিত হয়, যাঁর সংসর্গে মোহতন্দ্রা দূর হয়, আলস্য-জড়তা দূরে পলায়, হিংসা-বিদ্বেষ লজ্জায় মুখ লুকায়, প্রাণভরা প্রীতির আর সর্ব্বজীবে মমতার প্রস্ফুরণ হয়, তাঁর সঙ্গলাভ জীবনের পরম সার্থকতার লক্ষণ।

যাঁহারে পাইলে কাছে
অন্তরের নীচতা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে
"হায়রে যাই কোথা?"
তাঁহারে জানিবে তুমি
সাধু-জন-সুনিশ্চয়,
যাঁহার সঙ্গের গুণে
মনোব্যাধি নিরাময়।

স্বাধ্যায়ের সৌভাগ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে গ্রন্থের পাঠে সাধনের রুচি বর্দ্ধিত হয়, সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্জাত হয়, সাধন-বিঘ্নসমূহের সম্পর্কে সাবধানভাব জন্মে, অনিত্য বস্তুতে অরুচি এবং নিত্যবস্তুতে অভিনিবেশ বাড়ে, তেমন মহাগ্রন্থকে নিজে পাঠ

করা, অপরকে পাঠ ক'রে শুনান অথবা অপর কর্ত্তৃক তা' পঠিত হ'তে শোনা,—এসবও মহৎ ভাগ্য সন্দেহ নেই।

প্রতিটি অক্ষর-মাঝে
নিত্য সুধা-বরিষণ
প্রতিটি শব্দের মাঝে
দিব্য-প্রেম-প্রস্ফুরণ,
প্রতিটি বাক্যের মাঝে
কেবলি আশার বাণী,
শাস্ত্রগণ মধ্যে তারে
শিরোমণি বলি' মানি।

ভগবৎ-প্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তপোময় পবিত্র স্থানে বাসের দরুণ বা সৎসঙ্গের বা স্বাধ্যায়ের ফলে কিম্বা এসব থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হ'য়েও আপনা-আপনি যদি এমন আচরণে রুচি, প্রবৃত্তি ও চেষ্টা ধাবিত হয়, যার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ভগবৎ-প্রেম লাভ, তবে তা' হচ্ছে জীবনের মহত্তর সৌভাগ্য।

প্রতি কার্য্যে নিরন্তর
সত্য পানে চিত্ত ধায়,
বিশ্বের প্রভুরে নমি'
আপন করিতে চায়
বিশ্ববাসী প্রতি জনে
দিয়া প্রেম-আলিঙ্গন,

সে জনার হৃদে ফোটে
নিত্য প্রেম-বৃন্দাবন।

নামে-ডোবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর যদি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ভুলে, ইহকাল পরকাল ভুলে, আদি-মধ্য-অন্ত ভুলে, কার্য্য ও তার পরিণাম ভুলে, বীজ এবং তার ফল ভুলে, সর্ব্বপ্রকার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পরিহার ক'রে, নিষ্কাম অন্তরে ভগবানের অমৃতমধুর নামে ডুবে যেতে পারো, তবে এটা হবে তোমার জীবনের মহত্তম সৌভাগ্য।

ইহকাল পরকাল
সকলি ভুলিয়া যায়,
কর্ম্ম করে তাঁরি তরে
প্রতিদান নাহি চায়,
নিজেরে ডুবায়ে দিয়া
প্রেমের সমুদ্র মাঝে
শুধু প্রেম-ইচ্ছা-রূপে
তাঁরি বক্ষ মাঝে রাজে।

নামের সাধক ও বিচার-বিতর্ক

কিছুকাল নিঃশব্দে পথ চলিবার পরে একটী যুবক প্রশ্ন

করিলেন,—নামের সাধকদের বিচার-বিতর্কে রত হওয়া উচিত কিনা?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধক অসাধক সকলের পক্ষেই বিতর্ক ও বিতণ্ডা বর্জ্জনীয়। কিন্তু বিচার কখনো বর্জ্জনীয় হ'তে পারে না। যে পথে তুমি চলেছ, এই পথ কোনো অবস্থাতেই যে তোমার বর্জ্জনীয় নয়, এই পথকেই যে তোমাকে আমরণ নিষ্ঠায় শক্ত ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে হবে, চিত্তের ভিতরে এই প্রত্যয়টীকে দুর্ব্বল হতে না দেওয়ার জন্যও ত' তোমার বিচারের প্রয়োজন। নিজের মত ও পথ সম্বন্ধে নিষ্ঠাকে নিত্যই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার জন্য তোমার বিচারের প্রয়োজন। লোকে ত' বলে যে, বৈষ্ণবেরা অন্ধ-ভক্তির সমর্থক। কিন্তু দেখ, তাঁরাও কি ভাবে অনুকূল বিচারকে সমর্থন কচ্ছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের আদির অষ্টমে এবং মধ্যের চতুর্ব্বিংশতিতে রয়েছে,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার,
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।
বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়,
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়।।"

চৈতন্যচরিতামৃতের অনুবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ ব'লে জ্ঞান করেন ত'! তাঁরা বলছেন যে,—ভগবানের যে প্রত্যক্ষ ও প্ররোক্ষ দয়া অবিরাম জীবের উপরে বর্ষিত হচ্ছে, তার সম্পর্কে যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসকে অবলম্বন

ক'রে না থেকে শাণিত যুক্তির মুখে তার বিচার ক'রে দেখ যে, সেই দয়া কিরূপ আশ্চর্য্য, কিরূপ অপরিমেয়, কিরূপ অতুলনীয়, অপ্রতিদ্বন্দী ও অনাবিল। বিচার ক'রে যদি বোঝ যে তাঁর দয়া কেমন এক অত্যাশ্চর্য্য বস্তু এবং তাঁর দয়া ছাড়া জগতের আর সব কিছুই অবস্তু, তা হ'লে তোমার যে সুগভীর ভক্তি উপজাত হবে, সেই ভক্তিই ভগবানকে লাভের পথ সহজ ক'রে দেবে। বিচার ক'রে যদি বুঝে নাও, তা হ'লে তোমার ভজনাঙ্গ প্রত্যেকটী আচরণ হবে নির্ভুল, নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল, নিখুঁত। তার ফলে শ্রীভগবানে তোমার সুদৃঢ়া রতি জন্মাবে, তোমার বুদ্ধিবৃত্তির বহির্বিলাস থেমে যাবে, অন্যাভিলাষিণী প্রবৃত্তির ধ্বংস হবে এবং একান্ত মনে একাগ্র প্রাণে পরমৈকনিষ্ঠায় তুমি তোমার সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরই চরণ লাভ করার জন্য ব্যগ্র হবে। যাঁরা অন্ধ-ভক্তির সমর্থক ব'লে অন্যসম্প্রদায়ের কাছে নিন্দিত, সেই বৈষ্ণব সাধকেরাই যদি অনুকূল বিচারের প্রয়োজন স্বীকার করেন, তবে অন্যেরা কর্ব্বে না কেন?

জিজ্ঞাসাকে ভয় কি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রশ্ন শুনলেই চটে যাওয়া একটা নিছক্ দুর্ব্বলতা। সত্যবস্তু জিজ্ঞাসাকে ভয় পাবে কেন? তুমি যথার্থতঃ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছ তো? লোকের সংশয় ও তজ্জনিত সমাধান-চেষ্টা তোমার কাছে ভয়ের কিছুই নয়। ভগবান যদি সত্য হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে সংশয়ীর জিজ্ঞাসা

কেন ভগবদ্‌ভক্তকে অধীর কত্তে সমর্থ হবে? তোমার ট্যাঁকে যদি সত্যই সোণার মোহর গোঁজা থাকে, তা হ'লে অনেকে তাকে গিল্‌টি করা পিতল ব'লে ভ্রম কর্ল্লেই কি তুমি তা ছুঁড়ে নর্দ্দমায় ফেলে দেবে? অপরের সংশয় তোমার বিশ্বাসকে গভীর করুক, অপরের সন্দেহ তোমার আস্থাকে নিবিড় করুক।

সবাই যখন সংশয়ে জ্ব'লে মরে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

সবাই যখন
সংশয়ে জ্বলে মরে,
আমি ত' জানি হে
তুমি যে আমারি ঘরে
রত্ন-সিংহাসনের উপরে
বিচিত্র রূপ ধ'রে
নিজ মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে
সেজেছ সাড়ম্বরে।।
কিবা অপরূপ বিচিত্র রূপ,
জ্বলে দীপমালা, সুরভিত ধূপ,
মহাকোলাহল একেবারে চুপ,
বিনীত যুক্ত-করে
বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীরা
তোমারে প্রণতি করে।।

যে যেথায় হ'ল বিদ্রোহী তব,
যে করে অস্বীকার,—
সবারে জানিছ হৃদয়ের ধন,
করিছ অঙ্গীকার;
সবারে বিতরি' মুক্তির বর
বিলাইছ সুধা অবিনশ্বর;
বিচিত্র এই সৃষ্টির মাঝে
আপনার হাত ধ'রে
টানিয়া আনিছ সব সন্তানে
নিজের বক্ষোপরে।।

তোমায় হানিল যারা পদাঘাত,
তাদেরও তুমি দিলে সাক্ষাৎ,—
তুমি যে সবার চির আপনার,
তাই, নিশ্চিত তাই,
সবাই পাইল তোমার বক্ষে
প্রেম-সুকোমল ঠাঁই;
"আছ কিবা নাই" সংশয় করি'
ছাড়ে ধরি আর ধ'রে পুনঃ ছাড়ি',
তার অগণিত দুর্ব্বলতায়
লক্ষ্যটুকু না ক'রে
টানিয়া লইছ সব অজ্ঞান
বিভ্রম-জর্জ্জরে।

অনন্ত আর অনাদি অসীম
অমিত শক্তি তব,
তাই না হাজার যুক্তি-বিচার
মানিতেছে পরাভব।
বিতর্ক দিয়া চিহ্ন-বিহীন
করিবে তোমারে, এমনি কি হীন
দুর্ব্বল আর পঙ্গু হে তুমি?
তর্কে কি বাঁচে মরে—
তোমার অমোঘ দিব্য সত্তা—
টলে বিচারের ঝড়ে?
তুমি যে অচল, তুমি যে অটল,
তবু আঁখি-ভরা প্রেম ঢল-ঢল;
চির-সুস্থির, তবু অস্থির
ভক্ত যখন কাঁদে
তোমারে চাহিয়া তবু না পাইয়া
ব্যাকুল প্রেমোন্মাদে;
অটল তখন হয় টলমান,
নিজ অশ্রুতে করি' আম্লান
অরূপ তখন বাহু পসারিয়া
ভক্তেরে বুকে বাঁধে;—
তব এ মধুর অবচন লীলা
অনন্ত কাল ধ'রে

সিঞ্চিছে কত অপূর্ব্ব মধু
সবার হৃদয় ভ'রে।

ভগবান্ কি?

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভগবান্ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ কথার জবাব এক সময় অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছিলেন। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়"—আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ",—আমিই হচ্ছি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। যতজন যত ভাবে যত রকমের পূজা, অর্চ্চনা বা ভক্তি নিবেদন করে—"তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্",—হয়ত বিধি-অতিক্রম ক'রে করে, কিন্তু সবাই আমার পূজা করে। অর্থাৎ যাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেই, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি ছাড়া আর ভোক্তা নেই, যিনি সব কিছুর ভোক্তা, যাঁর উপর প্রভু নেই, যিনি সকলের প্রভু, বৈধ বা অবৈধ, স্থূল বা সূক্ষ্ম, অনাড়ম্বর বা সাড়ম্বর, গুপ্ত বা প্রকাশ্য প্রভৃতি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বপ্রকার যজন-ভজনের একমাত্র লক্ষ্য যিনি, তিনিই ভগবান্।

স্বীয় অভিপ্রায়কে ভগবদভিপ্রায়ে নিমজ্জন

প্রশ্ন হইল,—ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের ভিতরে নিজের অভিপ্রায়কে ডুবিয়ে দেবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বদা ভগবানে যুক্ত থাকার চেষ্টা কর। প্রীতিপূর্ব্বক নিরন্তর তাঁর ভজনে চেষ্টাশীল হও। অনুক্ষণ ভগবৎ কথা কীর্ত্তন কর এবং সাধু, সন্ত, প্রেমিকের মুখে সেই কীর্ত্তন শ্রবণ কর। এর ফলে তোমার জীবন ভগবানের লীলাক্ষেত্র হবে, দেহ ভগবানের পূজা-মন্দির-স্বরূপ হবে, তুমি ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন বিগ্রহে পরিণত হবে। তখন তোমার স্বকীয় ব'লে কোনো পৃথক্ অভিপ্রায় বা অভিলাষের অস্তিত্বমাত্র থাক্‌বে না, সবই হবে ভগবদভিপ্রায়ের প্রকাশ।

ভক্তি কাহাকে বলে

আর একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভক্তি কাহাকে বলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের স্বভাব-ধর্ম্মে স্থিত হওয়ার নামই ভক্তি। নিয়ত অনন্যশরণের শরণে অবস্থানই তোমার স্বভাব-ধর্ম্ম। বাহ্য উচ্ছ্বাস, বহির্ম্মুখ অভিলাষ ও আত্মসুখেচ্ছাকে সবলে গুটিয়ে এনে সমগ্র অস্তিত্ব এবং যাবতীয় বৃত্তিনিচয়কে পরমৈকাশ্রয় শ্রীভগবানের আশ্রয়ে এনে অর্পণ করার নামই ভক্তি।

শিবপুর (ত্রিপুরা)
১২ই বৈশাখ, ১৩৪১

শাস্ত্র কাহাকে কহে

একজন প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—শাস্ত্র কাহাকে বলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি উত্তর করিলেন,—অনাদি কাল থেকে ভগবৎ-প্রেমিক সিদ্ধসাধকদের হৃদয়ে যে নিত্যসত্য অপৌরুষেয় বাণী জাগ্রত হয়েছেন, তার সম্পূর্ণ, অংশ বা আভাস যে গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে, তারই নাম শাস্ত্র।

নিজেরে ভুলিয়া গিয়া দেহে মনে প্রাণে,
সম্যক্ করিয়া দান ঈশ্বর-চরণে
বাক্যরূপে মহাশক্তি হইল প্রকাশ,
শাস্ত্র বলি' তারে কর অন্তরে বিশ্বাস।

শাস্ত্রপাঠের ফল

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—শাস্ত্রপাঠের ফল কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনাদি অনন্ত অমৃতময় পরম সত্য তোমারও ভিতরে প্রসুপ্ত অবস্থায় বিরাজ কচ্ছেন। শাস্ত্রপাঠের ফলে সেই সত্যকে জাগ্রদ্-রূপে প্রত্যক্ষ কত্তে তোমার অভিলাষ, রুচি ও অধ্যবসায় জন্মে। এই হচ্ছে শাস্ত্রপাঠের ফল।

তোমার অন্তরে সত্য অনন্ত-বিস্তার
প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, স্বরূপ তাহার
নিজের দৃষ্টিতে পুনঃ হ'য়ে প্রকাশিত
মৃত্যুময় অন্ধকার করি' পরাহত
অনন্ত জীবন-সত্তা করিছে প্রদান,—
শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নে এই লভ দান।

শাস্ত্রজ্ঞের জীবনে অসত্যের প্রভাব

প্রশ্ন হইল,—অনেকে শাস্ত্র প'ড়ে দারুণ পণ্ডিত হন কিন্তু জীবনের উপর থেকে অসত্যের প্রভাব দূর কর্ত্তে সমর্থ হন না। এর কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এর কারণ এই যে, এঁরা শাস্ত্রের শব্দগুলিকে আয়ত্ত করেন, শাস্ত্রের অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করেন না। তাই পাণ্ডিত্যের পসরা উদর ও মস্তিষ্ককে বোঝাই করে, কিন্তু তার 'ক' অক্ষরও জীর্ণ হয় না।

শব্দরাশি নহে শাস্ত্র, অর্থরাশি হয় ;
এক এক বাক্য-মাঝে বিশ্ব-সমুচ্চয়।
অর্থেরে করিয়া ত্যাগ অনর্থ-সাধনে
লভ্য নাস্তি, অহঙ্কার বাড়ে শুধু মনে।

শাস্ত্রার্থ জীর্ণ করিবার উপায়

পুনরপি প্রশ্ন হইল,—শাস্ত্রার্থকে জীর্ণ করিবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শাস্ত্র-পাঠকে শুধু পাঠ-মাত্রেই পর্য্যবসিত না ক'রে প্রত্যেকটী বাক্যকে নিজের জীবনে মূর্ত্তিমন্ত ক'রে তোলবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ পোষণ করাই হচ্ছে শাস্ত্রার্থকে জীর্ণ করার উপায়।

শাস্ত্রমধ্যে যাহা পাও সদ্বাক্য-রতন,
জীবনে দানিতে রূপ করিও যতন।

একবাক্য লক্ষ বার ধ্যান কর মনে,
কেন না হইবে সিদ্ধ অসাধ্য-সাধনে?

ঋষি-জীবনে বিশ্বাস

প্রশ্ন ঃ—এ আগ্রহ সৃষ্টি করার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি ঃ—প্রাচীন ঋষিদের সত্যোপলব্ধিময় জীবনকে কল্পিত কাহিনী ব'লে জ্ঞান না ক'রে জ্ঞানোপলব্ধিময় সত্যপূর্ণ জীবন ব'লে বিশ্বাস করা।

প্রশ্ন ঃ—এ বিশ্বাস আসে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের জীবনকে সত্যময় ও পূর্ণ ক'রে তোলার আগ্রহ থেকেই পূর্ব্বগ-গণের জীবনকে সত্যময় ব'লে বিশ্বাস করার রুচি আসে। অর্থাৎ এদুটী হচ্ছে অঙ্গাঙ্গী।

নিজেরে রাখিবে যত পাপে ডুবাইয়া
অপরে বিশ্বাস তত যাইবে মুছিয়া।
নিজে যত হবে, তুমি সংযত সুন্দর,
মহতে বিশ্বাস তব হবে গাঢ়তর।

শাস্ত্র-বিদ্বেষীদের প্রতি কর্ত্তব্য

প্রশ্ন ঃ—যারা শাস্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ-প্রচার করে, তাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি ঃ—প্রথমতঃ উপেক্ষা। দেহে মনে প্রাণে

সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা, কায়মনোবাক্যে ঔদাসীন্য। কিন্তু এতে ত্রিবিধ অহিত হ'তে পারে। প্রথমতঃ শাস্ত্র-বিদ্বেষীদের আধ্যাত্মিক ক্ষতি। দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্র-বিশ্বাসীদের বিশ্বাস-ভঙ্গজনিত অনিষ্ট। তৃতীয়তঃ শাস্ত্র-বিদ্বেষীদের ঐক্যহেতু পরিণামে বিশ্বাসীদের উপরে উৎপীড়ন। এজন্যই ত' বলেছি প্রথমতঃ উপেক্ষা। সম্যক্ উপেক্ষার ফলে অনেক বিদ্বেষীর বিদ্বেষ-প্রচার বন্ধ হ'য়ে যাবে। অথবা বিদ্বেষীদের ভিতরেই মতামতের খুঁটিনাটি পার্থক্যের উপরে পারস্পরিক আত্মকলহ সুরু হ'য়ে তাদের অস্তিত্বের অবসান ঘটাবে। কিন্তু স্বভাবের নিয়মেই এভাবে যারা নিরস্ত হ'য়ে যাবে না, আমি কিছু বলি আর না বলি, স্বভাবেরই নিয়মে তাদের বিরুদ্ধে শাস্ত্র-বিশ্বাসীদের তরফ থেকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের সৃষ্টি হবে। সেই প্রতিরোধ যাতে উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হ'য়ে না যেতে পারে, সেই অভ্যুত্থান যাতে এক কাজ কত্তে গিয়ে আর এক কাজ ক'রে না ফেলে, তার জন্য প্রত্যেক শাস্ত্র-বিশ্বাসীর শাস্ত্রানুযায়ী জীবন যাপনের দিকেই প্রখরতম দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের শক্তি যদি দুচার-দশ জনের ভিতরেও পরিপূর্ণ রূপে জাগ্রত হয়, তা'হ'লে অস্ত্র ধারণ না ক'রেও অধর্ম্মের বিকট অট্টহাস্যকে স্তব্ধ ক'রে দেওয়া যায়।

প্রতিবেশীদের প্রতি শাস্ত্র-বিশ্বাসীদের কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এজন্য শাস্ত্র-বিশ্বাসীদের কর্ত্তব্য

নিজ নিজ শাস্ত্র প্রতিবেশীদের ভিতরে প্রচার করা। অপরের ধর্ম্মমতকে নিরস্ত করার জন্য নয়, অথবা অপরের ধর্ম্মমতকে ভ্রান্ত ব'লে প্রমাণ করার জন্য নয়, পরন্তু তোমার শাস্ত্রের ভিতরে সকল মতের সকল পথের লোকের জন্য যে হিতকথা রয়েছে, তার প্রতি সকলকে শ্রদ্ধান্বিত ও আগ্রহী করবার জন্য তুমি তোমার শাস্ত্র প্রতিবেশীদের প'ড়ে শুনাবে। ব্যাখ্যার অতিভারে শাস্ত্রকে দুরূহ ও দুর্বোধ্য না ক'রে, সরল সহজ আলোচনার ভিতর দিয়ে যাতে তারা অনায়াসে বা অতি অল্প আয়াসে শাস্ত্রের হিতকথাগুলির মর্ম্ম বুঝতে পারে, তাই কর্‌বে। ব্যাখ্যার জটিলতা সকল সময়েই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ নয়, অনেক সময়ে তা' হচ্ছে, নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে লুকিয়ে রাখারও চেষ্টা। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান, হাটের কুলী, মাঠের চাষা, অশিক্ষিত কামার, কুমার, কাঁসারি, সোণার এরাও যাতে সত্যদর্শী ঋষিদের তত্ত্বার্থ-প্রকাশক ভাব-গম্ভীর বাণীর মর্ম্ম ভেদ কত্তে পারে, সেই দিকে থাক্‌বে তোমার লক্ষ্য।

প্রতিবেশী শব্দের অর্থ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু প্রতিবেশী বল্‌তে বুঝ্‌বে কাকে? বাড়ীর আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে চেঁচালে যাদের যাদের বাড়ীর লোকের কাণে তোমার কণ্ঠস্বর গিয়ে পৌঁছুবে, তারা তোমার প্রতিবেশী। কিন্তু জগতে সবাই ত' আর স্থূল চীৎকার করেন না, কারো কারো চীৎকার অতি সূক্ষ্ম। স্থূল চীৎকার যতদূর

যায়, সূক্ষ্ম চীৎকার তার চেয়ে বেশী দূর যায়। নিজের কথা যত দূরবর্ত্তী পরের কাছে পৌঁছাবার তোমার সামর্থ্য আছে, তত দূরবর্ত্তী সকল লোককেই তোমার প্রতিবেশী ব'লে জান্‌বে। বাঘাউড়ার আশুবাবুর বাড়িতে যদি বাস কর, তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁর বাড়ির কাছাকাছি বাড়ীগুলির লোক তোমার প্রতিবেশী। কিন্তু শোনবার আগ্রহ যদি তুমি লোকের কাণে সৃষ্টি কত্তে জান বা পার, তা' হ'লে মীরপুর, শিবপুর, নাটঘর, রুদ্রাক্ষবাড়ী, খড়িয়ালা, বিদ্যাকূট, মেরকোটা, বগডহর, মোলা প্রভৃতি সব গ্রামের লোকেরাই তোমার প্রতিবেশী। তোমার কথা কাণ পেতে শোনার আগ্রহ যদি লোকের মনে সৃষ্টি কত্তে পার, তবে এই ত্রিপুরা জেলার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি সব জেলার লোকই তোমার প্রতিবেশী। তোমার কণ্ঠস্বর শুনে যদি এর চেয়ে দূরের লোকের প্রাণে প্রতিবেশীরই কণ্ঠস্বর ব'লে ধারণা জন্মে, তবে ব্রহ্ম, আসাম, নেপাল, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের লোকও তোমার প্রতিবেশী। এভাবে তোমার সামর্থ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, পেরু, ব্রেজিল, মেক্সিকো, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, গ্রীণল্যাণ্ড, আলাস্কা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, সাইবেরিয়া, চীন, আফগানিস্থান, পারস্য, তুরস্ক, আরব, মিশর, সুদান, কঙ্গো, ম্যাডাগাস্কার, প্রভৃতি সব দেশের লোকই তোমার প্রতিবেশী সংজ্ঞা পাবে। শুধু প্রতিবেশী নয়, তুমি যখন অজ্ঞানীর চিত্তজয়

ক'রে জ্ঞানকে সেখানে সুজাগ্রত কর্ব্বে, তুমি যখন অনাচারীর কদভ্যাস জয় ক'রে সদাচারকে সেখানে ভিত্তিমান্ কর্ব্বে, তুমি যখন অবিবেকীর বিবেককে প্রবুদ্ধ ক'রে তাকে ব্রাহ্মী স্থিতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে, তখন এরা কেউ আর তোমার প্রতিবেশী-মাত্রই থাক্‌বে না, এরা হবে সব তোমার ঘরের লোক, এক পরিবারের সদস্য, তোমার প্রাণপ্রিয় আপনার জন। এভাবেই জগৎ থেকে ভেদ-বিদ্বেষের হলাহল জীর্ণ হবে এবং প্রেম ও অখণ্ডতার চিরশান্তিময় অমৃতের অধিকার জন্মাবে।

সবারে আপন কর

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি আবৃত্তি করিলেন,—

সবারে আপন কর, বিশ্বেরে কর ঘর,—
নিখিল ভুবনে যেন কেহ নাহি থাকে পর।
অজানা আঁধার মাঝে
কে কোথা লুকায়ে আছে,
ছোট বড় দীন ধনী সুখী দুখী নারী নর,
চেতন কি অচেতন,—নিখিল এ চরাচর।
বিদ্বেষী, বিধর্ম্মী, বিপরীত আচরণ,—
ভেবে দেখ,—সেও তব কত আপনার জন;
বাহির মরিয়া যাবে,
ভিতরে তাহারে পাবে,
তার সাথে মিলন যে অজর চির-অমর!

সবারে আপন কর, বিশ্বেরে কর ঘর।
যতই রয়েছ দূরে রচি' যত ব্যবধান,
তোমারি পরম প্রেম করিবে তা অবসান;
প্রাণঢালা ভালবাসা
প্রাণে জাগাইবে আশা,
দূর হবে সকলের যত ভয়, যত ডর,—
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি—আঁখি-নীর দরদর!
পরেরে আপন করি' মরম-মণি-গেহে
চেয়ে দেখ, বুঝে দেখ, কাহারে পাইলে হে;
প্রিয়তম তব আসি'
অধরে মধুর হাসি'
কহিতেছে,—"নাও, নাও! কিবা চাও? দিব বর!'
সবারে আপন কর, বিশ্বেরে কর ঘর।

প্রাণের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াল

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও আবৃত্তি করিলেন,—

প্রাণের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াল
প্রাণের দয়াল দেবতা মোর,
ছুটিলাম আমি অর্ঘ্য লইয়া,
অঞ্জলি ভরা নয়ন-লোর।
কহিলাম,—"প্রভো, আসিয়াছ তবে,
দয়াময় তুমি সত্যি বটে!

শাস্ত্র ও গুরু, মহাজনগণ
কথা কি কখনো মিথ্যা রটে?
জানতাম আমি আসিবেই তুমি,
না আসিয়া তব উপায় কি?
আমারে না পেলে বিশ্ব লভিয়া
তব পূর্ণতা রহে বাকী।"
মুচকী হাসিয়া কহিল দেবতা,—
"তোরে ছাড়া আমি পূর্ণ নই।
তুই যে সবারে করেছিস পর,—
আমি তোর নিজ কেমনে রই?
কৃত্রিম কত মিথ্যা রচিয়া
সকল প্রাণীরে করিলি পর;
ভুলিয়াই গেলি, তোর হৃদি-খানা
আমার নিজের বসতি-ঘর।
সবারে প্রেমের বাহু আগুলিয়া
না দিলে সেখানে বসার ঠাঁই,
অত যে ক্ষুদ্র হৃদয়-খানাতে
বিরাট মহান্ কেমনে যাই?
আমারে সে পায়, সবারে যে চায়;
আমারে সে পায়, সবার যে; —
ক্ষুদ্র তাহারে মহীয়ান্ করি
আপনার হাতে আমি নিজে।"

সংযমী সন্তান-লাভের জন্য পিতামাতার অনুশীলন

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

'তোমার ছেলে হইয়াছে সংবাদে আনন্দিতই হইয়াছি। তুমি মনে মনে আশঙ্কা করিয়া বসিয়া আছ যে, তোমার দাম্পত্য জীবনের অসংযম দেখিয়াই আমি বরং চটিয়া যাইব, ইহা অমূলক। স্বামী ও পত্নীর মধ্যে অন্তরের অপরিসীম প্রেমই শারীরিক ক্রিয়া-বিশেষের রূপ লয়,—যেই ক্রিয়াটির ফল হইতেছে সন্তান। ভালবাসা না থাকিলে সুস্থমনাঃ কোনও ব্যক্তি এই ক্রিয়াতে রত হইতে পারে না,—অসুস্থমনাঃ মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে যদিও সকল অবস্থাতে সকল পাত্রে এবং কারণে অকারণেই ইহা সম্ভব। তোমাদের একটী সন্তান হইয়াছে, কথাটার মানে আমি এই ভাবে বিচার করি যে, তোমাদের দুইজনের মধ্যে ভালবাসার গভীরতার আর একটী দলিল তোমরা সর্ব্বজনসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া ধরিলে। তোমাদের ভালবাসার এই ফল জগতেরও প্রতি ভালবাসা বিস্তার করুক, সমগ্র জগৎকে আপন ভাবিয়া তাহাদের সেবার মধ্য দিয়া জীবনকে সদ্ব্যবহারে আনয়ন করিতে সমর্থ হউক এবং এই মহনীয় উদ্দেশ্যের সুসমাপ্তিকল্পে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করুক, ইহাই আমি আশীর্ব্বাদ করি।

"অর্থনীতিবিশারদ পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমি চাহি না যে, তোমাদের সন্তান-সংখ্যা কমুক। আমার সন্তান-মাত্রেই বিবাহের পর হইতেই সংযম পালন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। আমার সন্তান-মাত্রেই প্রতিদিন উপাসনাকালে জগতের মঙ্গল সঙ্কল্প করিয়া সমগ্র দেহটীকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহাদের ঔরসে ও গর্ভে সন্তান আসিলে সেই সন্তানেরা সংযম-পালনের স্বাভাবিক সামর্থ্য কতক পরিমাণে হইলেও নিয়া আসিবে, জগৎকল্যাণের রুচি সামান্য হইলেও স্বাভাবজাত সম্পদের ন্যায় পাইবে, ইহা ধ্রুব। সুতরাং তাহাদের জন্মলাভ জগতের পক্ষেই লাভজনক। আমার অনুবর্ত্তীদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে, অতএব তোমাদের সন্তানসন্ততির জন্ম হউক, আমার দৃষ্টিকোণ ইহা নহে। জগতে স্বভাবজাত সংযমের শক্তি লইয়া বহু নবজাতক আবির্ভূত হইবে এবং তাহারা স্বভাব-সংস্কারেই জগৎকল্যাণের ব্রতকে পাইবে এই যুক্তিতে আমি তোমাদের সন্তানসন্ততির আবির্ভাবকে অভিনন্দন করি।

"সুতরাং আমার কল্যাণীয়া মা-টীকে বল, সূতিকাগৃহে বসিয়াই যেন সে সন্তানকে কোলে নিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-সমূহের অনুশীলন আরম্ভ করিয়া দেয়। একবিন্দু দুগ্ধ দান-কালেও যেন নিজের মনকে নীচের দিকে না নামিতে দেয়। তোমাদের যেই দিনকার শারীর-ঘনিষ্ঠতার ফলে এই সন্তান তোমাদের ঘরে আসিবার পাকা ব্যবস্থা করিল, সেই দিন সেই

সময়ে তোমাদের মনে যে সকল পবিত্র চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহারই অনুরূপ একটী জীবাত্মা আসিয়া তোমাদের শুক্র-শোণিতে দেহ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং সেইদিন যদি সে কিছু সম্পদ পাইয়া থাকে, তবে তাহা তাহার মজ্জাগত ও মৌলিক সম্পদ। এখন মাতৃস্তন্যে সে যাহা পাইবে, তাহা হইবে তাহার অনুপূরক।

"দক্ষিণ-তিব্বত-নিবাসী একজন তান্ত্রিক সাধক আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন সঙ্গমপরায়ণ হন, তখন যদি দৈবাৎ তাঁহার মনে কোনও নীচভাব জাগরিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গম বন্ধ করিয়া দিয়া উচ্চভাবকে অন্তরে জাগরূক করিবার চেষ্টা করেন। কামাখ্যা পাহাড়ে অবস্থিতিকারী অপর একজন তান্ত্রিক সাধক আমাকে বলিয়াছিলেন,—স্ত্রীগর্ভে শুক্র আহিত হইবার কালে যখন দেহমনপ্রাণ দিব্যভাবে বিভাবিত হইয়া যায় এবং শরীর হইতে সদ্‌গন্ধ নিঃসারিত হইতে থাকে, আর নয়নসমক্ষে শুভ্রজ্যোতি ইষ্টদেব ফুটিয়া ওঠেন, তখন তিনি মনে করেন যে স্বয়ং বিশ্বনাথ ভক্তের প্রতি করুণা করিয়া তাহার সন্তান হইয়া আসিতেছেন। এই সকল উক্তি হইতে ইঙ্গিত পাইবে যে, দম্পতীর কেমন হওয়া উচিত। পরিকল্পন, অনুশীলন, পরিশীলন, পরিমার্জ্জন, নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ—দাম্পত্য জীবনের মধ্যে ইহাদের নিয়া বসাইতে হইবে। পশুর মতন ক্ষণিক সুখের লোভে একটা-কিছু হঠাৎ করিয়া ফেলা নহে, সঙ্কল্প

লইয়া সব করা, কি করিতেছ, তাহা বুঝিয়া সব করা,—কি পাইলে কি খোয়াইলে, তাহার হিসাব-নিকাশ করিয়া অনুতাপে জর্জ্জরিত হইবার জন্য নহে, কি পাইলে আর কি পাইলে না, অথচ একটু চেষ্টা থাকিলেই পাইতে পারিতে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা করিবার করা,—ইহাই হইবে কর্ম্মনীতি। রতি কেবলই একটা ক্রিয়া নহে, ইহা একটা শাস্ত্র। কিন্তু শাস্ত্রীয় গবেষণা ও তাহার ফল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তোমরা লুপ্তোদ্ধার করিবে।"

নাম বিশ্ববিঘ্ন-বিনাশক

অপর এক পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানের অমৃতময় নামে মনটীকে সর্ব্বদা লাগাইয়া পথ চল। সকল পথ সরল হইয়া যাইবে। দুর্গম অরণ্য হইতে বৃক্ষগুল্মাদি সরিয়া গিয়া তোমার জন্য পথ করিয়া দিবে। সাগরের বারি শুকাইয়া গিয়া তোমার জন্য পথ করিয়া দিবে। পাহাড়-পর্ব্বত সমতল হইয়া তোমার জন্য পথ ছাড়িয়া দিবে। যেখান দিয়া তোমার যাওয়া প্রয়োজন, সেখান দিয়াই তোমার জন্য পথ খুলিয়া যাইবে। পথের দুর্লঙ্ঘ্যতা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যাইও না। বিঘ্নবিপত্তি যত অধিক পরিমাণে আসিয়া হাজির হইবে, ততই তুমি অধিক পরিমাণে মঙ্গলময় নামে নির্ভর কর। আকাশে বজ্র যত অধিক গর্জ্জন করিবে, তোমার মনকে তত অধিক পরিমাণে নামে সংলগ্ন কর। নাম বিশ্ব-বিঘ্ন-বিনাশক।

"সকল দুঃখ-বেদনা সন্তাপ-শোক নামের সেবায় ডুবাইয়া দাও। দুঃখের সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গে কেবল নামই উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠুক। জ্ঞানসূর্য্যের তরুণ আলোকে সেই তরঙ্গায়িত নামরাশি অপরূপ শোভা বিস্তার করুক। তরঙ্গ-রাজির আক্ষেপে-বিক্ষেপে বাষ্পায়িত নামের শীকর-কণা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া বিস্তারিত হইয়া সকলের দেহমনঃপ্রাণ শীতল করুক। তোমার দুঃখাভিহত চিত্তের সমুদ্র-মন্থন কোটি বিশ্বের জন্য শান্তির অমৃত আহরণ করুক।

"দুশ্চিন্তা না করিয়া কেবল নামই করিয়া যাও। নামের প্রতাপে সকল অমঙ্গল দূর হইবে। বিপত্তিকালই ত' তাঁহার নাম করিবার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সময়, কারণ তখন বিনা চেষ্টায় মন জগতের অসংখ্য অবান্তর বিষয় ভুলিতে বাধ্য হয়। বিপদের গভীরতা মনের একাগ্রতা বর্দ্ধনেরই উপায়, ইহা জানিয়া লও এবং এই বিপদকে তাঁহার মঙ্গলময় নামের সেবায় নিয়োগ করিয়া সার্থক কর। বিপদ আসিবে এবং চলিয়া যাইবে, মাঝখান হইতে তুমি তোমার প্রাণের প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইলে। ইহা পরম লাভ।"

নাম-সাধনে আত্ম-কল্যাণ ও জগৎ-কল্যাণ

অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সর্ব্বদা নামে মন লাগাইয়া রাখিবে। তাহাতে নিজের অপার আনন্দ আস্বাদনের সাথে সাথে নিখিল ভুবনের প্রতিটী জীব কল্যাণ লাভ করিবে। ভগবানের নামের সেবার মধ্য দিয়া নিজের কুশল না চাহিলেও তাহা নিজের জন্য আসে, জগতের কুশল না চাহিলেও তাহা জগতের জন্য যায়। সর্ব্বজীবের কুশল সম্পাদনের এমন অমোঘ সদুপায় আর কিছু নাই। এই জন্যই আমি তোমাদের নির্দ্দেশ দিয়াছি, আগে তুমি নিজেকে সর্ব্বজীবের কুশলকারী বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া লও, তাহার পরে নিরহঙ্কার চিত্তে নিরভিলাষ মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন প্রাণে যতক্ষণ প্রাণ চাহে, ততক্ষণ নাম জপিয়া যাও। নামের সেবার মধ্য দিয়া তোমার সুপ্ত শক্তি-সমূহ জাগিয়া উঠুক, জগতের সুপ্ত চেতনার অরুণোদয় হউক। ফলাভিসন্ধিহীন সরল নাম-সাধনার তুল্য অমৃত ত্রিজগতে আর কি আছে?"

আদর্শ ও বাস্তবতার মিলন

চট্টগ্রাম রাউজান-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি তোমার সঙ্ঘের কাজ লইয়া দিনের পর দিন অগ্রগমন করিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছ, তাহার পশ্চাতে জনসমর্থন আসিয়া কি ভাবে দাঁড়াইতেছে, তাহা অবশ্যই তোমাকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। জনসমর্থন আসিলেই আমি মনে করিব না যে, তুমি ঠিক ভাবেই কাজ

চালাইয়া যাইতেছ, অথবা জনসমর্থনের অভাব দেখিলেই আমি বুঝিব না যে, তোমার কাজ ভুল হইতেছে। কেমন জনগণের সমর্থন তোমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে এবং কেমন জনগণ কিছুতেই তোমার পৃষ্ঠপোষণে সম্মত হইতেছে না, তাহা অবশ্যই দেখিতে হইবে সকলের আগে। তুমি লটারীর টিকিট বেচিতে গেলে যেমন লোকেরা তোমাকে সমর্থন করিতে আসিবেন বলিয়া আশা করিতে পার, তুমি হীরা-জহরত বেচিতে গেলে তেমন লোকেরাই আসিবেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। হীরা-জহরতের ক্রেতা ও লটারীর টিকিটের ক্রেতার মধ্যে চরিত্রগত, আদর্শগত ও সামর্থ্যগত পার্থক্য রহিয়াছে। আদর্শবাদী উন্নতচেতা জনগণ তোমাকে সমর্থন করিতেছেন ত'? এই প্রশ্নের জবাবে যদি বলিতে পার, 'হ্যাঁ', তবেই বুঝিব, তুমি কাজ কিছু করিতেছ। তামসিক নরনারীকে আকর্ষণ করিতে কি লাগে? খেমটা-নাচ বা যাত্রাগান তাহাদের জন্য যথেষ্ট! নিম্ন-তামসিকেরা আবার খেমটা-নাচ পাইলে কিছুতেই যাত্রাগানও শুনিতে আসিবে না। দেখ, তামসিক নরনারীর মধ্যেও কত ইতর বিশেষ রহিয়াছে। হয়ত তোমার দলে জগতের খুব কম লোকেই ভিড়িবেন, তবু তাঁহারা হউন আদর্শবাদী, উন্নতচেতা ও উন্নতরুচির লোক, আমি ইহাই চাহি। পরের সম্পদ অপহরণ করিবার জন্য মানুষ যখন দলবদ্ধ হয়, তখনও তাহাদের সঙ্ঘের মধ্যে একতার দৃষ্টান্ত অসাধারণত্ব অর্জ্জন করে সন্দেহ নাই এবং দলবদ্ধতার গুণে তাহারা পৃথিবীতে পার্থিব প্রতিষ্ঠাও

অর্জ্জন করে অনেক সময়ে, কিন্তু মানুষের সমাজে তাহাদের সম্মান কতটুকু? আদর্শবাদীরা নিজ নিজ আদর্শের চুলচেরা বিচার লইয়া আবার এমনই প্রমত্ত রহিয়াছেন যে, পরস্পর মিলিত হইয়া দানবের জগৎকে মানবের জগতে রূপান্তরিত করিবার কার্য্যে তাঁহাদের আর আত্মদান করিবার অবসরই ঘটে নাই! মানুষ একদিকে নামিতে নামিতে হিংস্র পশুর পর্য্যায়ে গিয়াছে, পরনারী-পরকন্যা অপহরণের মতন কাজকে ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া দলবদ্ধ ভাবে তাহাই করিয়া করিয়া বেড়াইয়াছে, অপর দিকে মানুষেরা দেবতা হইয়া গিয়া সংসারের সকল আবিলতার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি দিতে গিয়া সংসারের সকল প্রয়োজনীয় কাজের মূলভিত্তিস্বরূপ একতাকে করিয়া দিয়াছেন অকল্পনীয় ভাবে শিথিল, যাহার ফলে স্বর্গচ্যুত দেবতারা মর্ত্ত্যেও আবাসস্থল নির্ম্মাণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন, আর পাতালবাসী দানবেরা স্বর্গ হইতে দেবতাদের বিতাড়িত করিয়া দিয়া মর্ত্ত্যেও তাহাদের নিবাস অসম্ভব-প্রায় করিয়া তুলিল। তাই দেবতাদের আদর্শবাদের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে কতকটা নামিয়া আসিয়া মর্ত্ত্যের ধূলি গায়ে মাখিতে হইবে এবং সেই ধূলি তাহাদের দেহ-মন-প্রাণকে কলুষিত না করিয়া নিখিল বিশ্বের প্রতিটি আততায়ীর হননে এবং প্রতিটি নিরীহ ব্যক্তির রক্ষণে কি করিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্‌ভাবন করিতে হইবে। আদর্শ নিজেকে বিসর্জ্জন না দিয়াও বাস্তবিকতার সহিত কি করিয়া পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে, তাহাই

দেখিতে হইবে। অপরিণীত সন্ন্যাসীর মতন আদর্শ নিঃসঙ্গ পদসঞ্চারে চলিয়াছে বলিয়াই না তাহার বংশবৃদ্ধি নাই, সে একক থাকিতে ভালবাসে বলিয়াই না বিপত্তিকালে তাহার পিছনে আসিয়া কেহ দাঁড়ায় না। ইহা মনে রাখিতে হইবে। তাহার পরে যাহা কর, তাহাই ইহকাল তথা পরকালের কুশল যুগপৎ আহরণ করিবে।”

কৃষ্ণ-কথার বাধা

অপরাহ্নে ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীবাবামণি মাঠে বেড়াইতে বাহির হইলেন। কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বাঘাউড়া, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইলেন।

আশুবাবুর জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন চক্রবর্ত্তী হারমোনিয়াম নিয়া আগাইয়া আসিলেন, আশুবাবু মৃদঙ্গ ধরিলেন।

যামিনীবাবু বলিলেন,—বহুদিন স্বামিজীর কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত শুনি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বুকে বাঁধা প্লুরিসির প্রলেপটী দেখাইয়া বলিলেন,—এই দেখুন, আমার কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনের পরম-শত্রুদের,—প্রলেপটী হচ্ছে জটিলা, আর ব্যাণ্ডেজটী হচ্ছে কুটিলা। মায়ার প্রলেপ শরীর-মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে না পার্‌লে কৃষ্ণকথা হয় না। আর সংস্কারের সহস্র বন্ধন ছিঁড়ে ফেল্‌তে না পারলে, নাম মুখে ফুট্‌তে চায় না।

মধুমাখা নাম জপিতে জপিতে

শ্রীশ্রীবাবামণির বুকের ব্যথার কথা শুনিয়া আশুবাবু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং মৃদঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে গান গাহিতে বিরত হইতে বলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি উপস্থিত সকলের আগ্রহের সাত্ত্বিকতা উপলব্ধি করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—এই বাড়ীতে ব'সে কম গানের রচনা নয়। এখানে আস্তে আস্তে গান গাইলে তত কষ্ট হবে না।

মৃদু কণ্ঠে শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিতে লাগিলেন,—

মধুমাখা নাম জপিতে জপিতে
জীবন যেন গো বহিয়া যায়,
বিষয়ের বিষ-প্রলোভন পানে
নয়ন যেন না ফিরিয়া চায়॥

রসনা যেন গো গাহি' নাম গান
আকুলিত করে জগতের প্রাণ,
প্রাণ ভরি' করি প্রেমরস পান,
নিজে জাগে আর সবে জাগায়॥

তোমারি সরস পরশ লভিয়া
হরষে নাচিয়া ওঠে যেন হিয়া,
আপনারে তব চরণে সঁপিয়া
তাপিত পরাণ যেন জুড়ায়॥

নাহি যেন বাছি ছোট-বড় জাতি,
সকলেরে যেন দেই কোল পাতি',
তোমারি সেবায় রহি' দিবারাতি
প্রাণ যেন লোটে সবার পায়॥

সেই প্রেমমাখা কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত সকলে উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

যাব ভেসে, যাব ভেসে

যাব ভেসে, যাব ভেসে
প্রেম-নদীর ঐ জোয়ার-জলে,
দুল্‌বে আমার ভগ্ন তরী
'জয় গুরু শ্রীগুরু' ব'লে॥

আসবে যখন তুফান ভারী,
আমার তখন জম্‌বে পাড়ী,
টান্‌ব রে দাঁড় দু হাত ক'যে
পার হব রে নামের বলে।

ভয় কি আমার আছে রে আর,
নাম যে আমি করেছি সার,
আঁধার-ঘনে মনের কোণে
নাম-রতনের জ্যোতি জ্বলে।

ভাঙ্গবে যে দিন জীর্ণ এ নাও,
দুঃখ ব'লে গণ্‌ব না তাও,
নামের স্রোতে ভাঁটার টানে
ডুব্‌ব প্রেম-অতলের তলে;
(কত) হীরা-মাণিক তুল্‌ব রে ভাই,
আদর ক'রে পর্‌ব গলে।

অবাধ বাঁধনে বাঁধিল আমারে

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—
অবাধ বাঁধনে বাঁধিল আমারে
সে মোর জীবন-ধন রে।
করিল শীতল যত দাব-দাহ
জুড়াইল প্রাণ-মন রে।।
ভয়, সঙ্কোচ, মোহ বিদূরিয়া
হতাশ জীবন দিল জাগাইয়া,
প্রেমের পরশে নামের হরষে
করিল চির-আপন রে।।
পুলকিত তনু পুণ্য-কিরণে,
টানিয়া লইল অভয়-চরণে,
স্বপ্নের ঘোরে কিবা জাগরণে
চির অনাথ-শরণ রে।।

এসেছ কি জীবনের জুড়াইতে যাতনা

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিয়া চলিলেন,—
এসেছ কি জীবনের জুড়াইতে যাতনা
কোমল কুসুম-রাশি হাসে?
এসেছ কি প্রাণভরা প্রেমরাশি লইয়া
মাতাইতে স্নেহ-মধু-ভাষে?
হে প্রিয়তম প্রভো, তুমি যে আমারি
অণুতে রেণুতে আমি শুধু যে তোমারি,
সে কথা জাগিয়ে দিতে
মম প্রাণ-মনো-চিতে
নাচিয়া আইলে ফুলবাসে?
তিরপিত কামনা নিভৃত এ হৃদয়ে,
মৌন বাসনা-চয়, তব পরশ পেয়ে
অপগত যত শোক
লভিয়া চরণালোক,
জ্যোছনা জাগিল অমাকাশে।।

কিবা মোহন মূরতি রে

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—
কিবা, মোহন মূরতি রে।
চিদ্‌ঘন পদ্ম বিকাশে ধীরে।

শত রাগ-মেলা
করে কত খেলা,
শান্ত বিজলী ভাতি রে!
মরণ দুঃখ ভয়
পাইল চিরবিলয়,
অন্ধকার-চয়
নিমেষে করিল জয়।
দূরে পলাইল রাতি রে!

বাহিরের কোলাহল

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

বাহিরের কোলাহল গেল রে থামিয়া,
শান্তিময় প্রেমামৃত আইল নামিয়া।।
পূজারী স্পন্দনহীন, শঙ্খনাদ নভোলীন,
পুষ্পচয় দেবতার চরণে পড়িয়া।।
ফুরায়ে গিয়াছে আজ বাহিরের শত কাজ,
নিবিল আরতি-বাতি প্রাণাহুতি দিয়া।।

তোরা কে ভাগ নিবিরে

শ্রীশ্রীবাবামণি গান থামাইলেন। ইতিমধ্যে কোন্ এক অবসরে শ্রদ্ধেয় আশুবাবুর ইঙ্গিতে তাঁহার কুমারী কন্যাদ্বয়

ঘরে ধূপ-প্রদীপ আনিয়া বসাইয়াছেন এবং একটী নৈবেদ্য-থালিকায় লুটের বাতাসা সজ্জিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যামিনী বাবু বলিলেন,—নাম, রূপ, মিলন তিনই ত' হ'ল। এখন লুটের গানটা হবে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া গান ধরিলেন। সকলে মিলিয়া দোহারী করিতে লাগিলেন,—

তোরা কে ভাগ নিবিরে চল।
খেয়াঘাটেই কুড়িয়ে পাবি
ঐ পারের সম্বল।।
সুখের মাঝে দুখের মাঝে
প্রাণ-বঁধুয়ার বংশী বাজে,—
শুনবি কি সেই সুরের লীলা,
আনন্দ-চঞ্চল?
এপার হ'তে ওপার যেতে
আয়রে তোরা হর্ষে মেতে,
আঁখির কমল মুক্তা-ঝরায়
করুক রে টলমল।।
পারের কড়ির ভাবনা কিরে?
চিত্ত ডুবুক স্রোতের নীরে।
মুগ্ধ নাদে প্রাণের সাধে
বলরে হরি বল্।।

শিবপুর, ত্রিপুরা
২০শে বৈশাখ, ১৩৪১

আমি আমার কর্ত্তব্যে রত

১৩ই বৈশাখ হইতে ১৯শে বৈশাখ পর্য্যন্ত সাত দিন শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনব্রতী রহিলেন, এই সময়ের মধ্যে যত দর্শনার্থী বা জিজ্ঞাসু আসিলেন, কাহাকেও লিখিয়াও কোনও উপদেশ দিলেন না। এই কয় দিনে দুই একখানার বেশী পত্রও লেখেন নাই। যে দুই একখানা পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কোনটীতেই দশ পনেরটীর অধিক শব্দ ছিল না। গৌরীবাবু অনুভব করিলেন, শ্রীশ্রীবাবামণি সুনিশ্চিত কোনও বিশেষ কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই তিনি এমনই কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন, যেন শ্রীশ্রীবাবামণির বাসগৃহখানার নিকটে কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্ত্তাও না বলে। এতদঞ্চলে প্রখ্যাত ও বহুজনমান্য কয়েক জন হিন্দু ও মুসলমান সাধক এই সময়ের মধ্যেই শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ বিরাট শিষ্য-মণ্ডলীর গুরু, কেহ কেহ নিরতিশয় ভগবৎ-সঙ্গীতপ্রিয় সাধক পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা দীর্ঘকাল নীরবে অবস্থান করিয়াই অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রস্থান করেন। মহৎ লোক আসিয়াছেন বলিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাঁহাদের আদর আপ্যায়ন করিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবামণি মুক্তকচ্ছ হইলেন

না দেখিয়া একজনেও কোনও অভিমানের আঘাত নিয়া ফিরেন নাই, ইহা গৌরীবাবুর নিকটে আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। অদ্য প্রাতঃকালে যখন শ্রীশ্রীবাবামণি মৃদুকণ্ঠে হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিয়া মৌন-ভঙ্গ করিলেন, তখন গৌরীবাবু এই প্রশ্নটীই করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা যে সাধক! যাঁরা নিজেরা সাধন করেন, তাঁরা অন্যের কর্ত্তব্য-পালনকে মর্য্যাদা দিতে পারেন। ওঁরা জানেন যে—I am on duty, আমি আমার কর্ত্তব্যে রত, এখন আমার অন্য কারো দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর নেই, অধিকার নেই।

গৌরীবাবু প্রশ্ন করিলেন,—কি কাজটা এই সাতদিন ধ'রে করলেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—একদিকে আপনাদের মধ্যে আপনাদেরই একজন হ'য়ে আপনাদের সকলকে দেখ্‌ছিলাম। অন্য দিকে সমগ্র বিশ্বের বাইরে দাঁড়িয়ে বিশ্বটাকে দেখ্‌লাম।

প্রশ্ন হইল,—আপনি নিজে কোথায় গেলেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার কথা? আমি আমাকে আপনাদের মাঝখানে ফেলে রেখে আমিত্ব-বর্জ্জিত সত্তাটাকে বিশ্বের বাইরে দাঁড় করিয়ে তার ভিতর দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে দর্শন কর্ল্লাম। কি দেখ্‌লাম তা' বলা কঠিন। হয়ত মানুষের ভাষায় সেই কথাটা কেউ স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে পারে নি।

জিহ্বার যেমন এক পাশে মিষ্ট স্বাদ আর এক পাশে তিক্ত স্বাদ পাওয়া যায়, চিরতার সাথে চিনি মিশিয়ে তাকে জিহ্বায় দিলে জিহ্বা যেমন তার দুই অংশের অনুভূতিশীল তন্তুগুলি দিয়ে দুইটী রসকেই যুগপৎ আস্বাদন করে, আমি তেমনি ক'রে একই সময়ে একটী চক্ষু দিয়ে বিশ্বের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম নিখিল বিশ্বকে, আর একটী চক্ষু দিয়ে বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুর মধ্যে দর্শন কর্লাম নিজেকে। একই সময়ে আমি সকলের সাথে নিজেকে দেখ্‌লাম অভেদ, অভিন্ন, অদ্বৈত সত্তা, আবার দেখ্‌লাম, সবই উপাধির বোঝা, আমি অনাদি, অনন্ত, নিরঞ্জন। ভাষায় তা বোঝান যাবে না।

বিশ্বের সবার তরে

অদ্যই অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসিয়াছেন। পদব্রজে কিছুটা গিয়া নৌকায় উঠিয়াছেন। গোকর্ণঘাট পৌঁছিয়া ঘোড়ার গাড়ী ধরিয়াছেন। পূর্ব্বেই খবর পাইয়া শ্রীযুক্ত নীলমোহন ঘোষ সহর হইতে গাড়ী নিয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত নীলমোহন বলিলেন,—আজ সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই আপনার উপদেশামৃত পান কর্‌বার জন্য আস্‌বেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমরা খবর দিয়েছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভুল করেছ বাবা, ভুল করেছ। নিজের যদি লাভের লোভ থাকে, তা হ'লে ভিড় যত কম জমাবে, ততই ভাল।

শ্রীযুক্ত নীলমোহন বলিলেন,—যদি আমার নিজের লাভের লোভ না থাকে, আর পরার্থেই সব কাজ করি?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তা হ'লে অবশ্যই তুমি অতি মহৎ। নিজেকে বঞ্চিত রেখেও পরের পেট ভরাবার জন্য যাঁরা ব্যস্ত, তাঁরা সকলের নমস্য। পরের সেবা কত্তে কত্তে পরোক্ষে নিজেরও সেবা কখনো কখনো হ'য়ে যায়। ঠাকুরের জন্য যে ভোগ সাজায়, সে কি প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়? কি বল?

নীলমোহন হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সত্যই এ জগতে একদল মহৎ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা যা-কিছু করেন, সবই পরের জন্য। নিজের সুখে লক্ষ্য নেই, নিজের তুষ্টি, পুষ্টি, হৃষ্টি কিছুই তাঁরা চান না, কেবল চান, জগতের লোকের ভালো হোক, আমি যেন জগতের মঙ্গলকারী হ'তে পারি,—ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি।

নিজের লাগিয়া তার কিছু নাহি ভবে,
বিশ্বের সবার তরে কাঁদিছে নীরবে।

বক্তৃতা ও চিন্তাশক্তি

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে সত্যসত্যই কয়েকজন সৎকথাশ্রবণেচ্ছু সজ্জনের সমাগম হইয়াছে। মেড্ডা-নিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—আপনি আসবেন আগে জানলে একটা

জন-সভার ব্যবস্থা কত্তাম। বিশেষ ক'রে ছাত্রদের আজ আপনার বাণী শ্রবণ প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাড়া বাঁধতে ঢেকীর আপত্তি নেই। কিন্তু ঢেকর ঢেকর শব্দ কি সত্যই সকলের শ্রুতিসুখকর? মুখে কথা না ব'লে এক মাত্র চিন্তার শক্তিতে যে কাজটুকু কত্তে পারি, তাতেই জীবের নির্ব্বিরোধ সেবা আর সুনিশ্চিত কল্যাণ। মুখের কথার আভ্যন্তর অর্থ অনেক সময়ে শ্রোতার বোধগম্য হয় না, বাইরের শব্দগুলিকে নিয়ে সে বিতর্ক-বিচার করে, অনেক সময়ে ভুলও বোঝে, কিন্তু চিন্তার স্পর্শ যার মনের গায়ে লাগে, সে ভাষা শোনে না, চিন্তাকে তার স্বচ্ছ অনাবিল অভ্রান্ত মূর্ত্তিতে সে পায়। সতেরোটা জামা-পরা বরকে নববধূ যেমন তার ছোট হাত দুটীর নাগালের মধ্যে পায় না, বক্তৃতার দশাও অনেক স্থলে তাই।

সকল মত ও সকল পথকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখ

ইহার পরে অনেক মহাপুরুষ এবং অনেক ধর্ম্মমতের কথা উঠিতে লাগিল। প্রত্যেক মহাপুরুষেরই একটা না একটা বিশেষত্বের বিষয়ে আলোচনা চলিল। একজনের কথার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, দেখে মুগ্ধ হও। বৈষ্ণব প্রেমে কোমল, শাক্ত সাধনে দৃঢ়, ব্রাহ্ম সারদর্শী, বৈদান্তিক অনাসক্ত, কর্ম্মযোগী পরার্থ-জীবন,—প্রতিটি মতাবলম্বীর ভিতরে কি বিচিত্র

সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রেমমাধুরী-মাখা মূর্ত্তির কথা চিন্তা ক'রে দেখ ত'? নিরভিমান, ঈর্ষ্যা-অসূয়া-হীন, পরনিন্দায় রুচিহীন, অন্তরের সমস্ত অর্ঘ্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ-রত সমস্ত অন্যাভিলাষ বর্জ্জন ক'রে পরিপূর্ণ ভাবে ঈশ্বরনিষ্ঠ, ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, অপরের অহিতচিন্তা নাই। ভাবতেই ভক্তি আসে, দৈবক্রমে এমন ব্যক্তির দর্শন পেলে ত' ভাগ্যের সীমাই নাই। যথার্থ শাক্তের নির্ভীক নিঃশঙ্ক মূর্ত্তিটীর কথা একবার ভেবে দেখ দেখি? ভূত, প্রেত, পিশাচ, কবন্ধ কিলিকিলি খিলিখিলি ক'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার সাধনায় সে অটল, অচল,—সাধনায় সিদ্ধি সুনিশ্চিত, একথা সে জানে, তাই বিভীষিকা দেখে সে আর্ত্ত হয় না, কোনো বিপজ্জনক অবস্থায়ই তার হৃৎকম্প নেই। এই ভাবে প্রত্যেক মতাবলম্বী আদর্শ পুরুষের দিকে দৃষ্টি দাও। মুসলমানের স্বমতনিষ্ঠা, ধর্ম্মসাধনায় ঐক্যানুশীলন, খ্রীষ্টানের সর্ব্বমানবের হিতার্থে তনু-মন-ধন দিয়ে সেবা,—সবই তখন সুন্দর ব'লে মনে হবে। তখন দেখবে জগতের প্রত্যেকটি মত কত সুন্দর, প্রত্যেকটি পথে কত শত শত ছায়াপ্রদ মহামহীরুহ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যদি মত-বিশেষের অনুসরণকারী অনাদর্শ ব্যক্তিদের দিকে দৃষ্টি দাও, তা হ'লে দোষদৃষ্টি তোমার চক্ষুকে ছেয়ে ফেলবে, তখন তুমি যে মতের দিকে তাকাবে, দেখবে সেটাই বুঝি একটা নরক-কুণ্ড। তাই জগতে যত মত ও যত পথ আছে, সকলের প্রতি সশ্রদ্ধ, সপ্রশংস, সাদর ও সসম্মান দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হয়।

সম্প্রদায়বৃদ্ধি-বুদ্ধির কুফল

একজন প্রশ্ন করিলেন,—কিন্তু নিজের ধর্ম্মে হয়ত ঈর্ষ্যা, পর-নিন্দা প্রভৃতি বর্জ্জনের উপদেশ আছে, তবু অনেক ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা বা ধর্ম্ম-প্রচারকদের পরনিন্দা কত্তে দেখা যায়, অপর সম্প্রদায়কে আঘাত ক'রে অন্যায় কুযুক্তি বিস্তার কত্তে দেখা যায়। এর কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খুব সঙ্গত কোনো শাস্ত্রে বা কোনো ধর্ম্মেই এসকলের সমর্থন নেই। কিন্তু তবু যে এসব হয়, তার কারণ আধ্যাত্মিক নয়, নিতান্তই বৈষয়িক। কেউ হয়ত নিজের শিষ্যসম্প্রদায়কে পুষ্ট কত্তে চান, অথচ দেখ্‌তে পাচ্ছেন, ভিন্ন পথের পথিকেরা নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার ক'রে বসেছেন। তখন ঈর্ষ্যা এবং স্বার্থবুদ্ধি এঁদের দিয়ে সকলের নিন্দা, সকলের গর্হণ করিয়ে নেয়। এসব কার্য্যও রীতিমত শাস্ত্রবিদ্বেষ। যাঁদের নিজের সম্প্রদায়-বৃদ্ধির জন্য কোনো কৃত্রিম চেষ্টা নেই বা সেই দিকে কোনো প্রখর লক্ষ্য নেই, ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের নিন্দা করার তাঁদের আবশ্যকতা খুবই কম। কেউ কেউ একজন হয়ত ভক্তি-বাদ প্রচার কচ্ছেন, ভক্তিবাদী অবশ্যই কোনও না কোনও প্রকারের দ্বৈতবাদী হবেনই, কতক সময়ের জন্য হ'লেও তাঁকে সাধ্যে ও সাধকে দ্বিত্ব কল্পনা কত্তে হবেই। তিনি দ্বৈতবাদের প্রশংসা কত্তে গিয়ে দ্বৈতবাদের সঙ্গে যে সব মতবাদের অমিল আছে, তুলনার্থে তার আলোচনা কত্তে পারেন। তাঁর যখন লক্ষ্য দ্বৈতবাদকে

শ্রেষ্ঠ করা, তখন তিনি আংশিক ভাবে নিম্বার্ক-বেদান্তকে এবং পূর্ণভাবে শাঙ্কর-বেদান্তকে খণ্ডনের চেষ্টা কত্তে পারেন। তিনি নিজে যত অধিক পণ্ডিত হবেন, আলোচনা-ক্ষেত্রে বা তুলনামূলে দুইটী আলোচ্য মতের মধ্যে তাঁর মতে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ও কোন্‌টী অপকৃষ্ট, তার সম্পর্কে কথাও তত বেশী হবে। কিন্তু মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব বা অপকৃষ্টত্ব আলোচনার জন্য যুক্তি-বিস্তারেরও একটা সীমা আছে। নির্দ্দিষ্ট পরিধির পরে তাকে থাম্‌তে হয়। অথচ বক্তার আসল উদ্দেশ্য শিষ্য বাড়ানো, অপরের দল ভাঙ্গানো, তাই তিনি ত' আর সেখানে থাম্‌তে পারেন না। তাঁকে তখন যুক্তি ও সুজনতা পরিহার ক'রে খেউড়ে নাম্‌তে হয়। যে আত্মস্থতা থাক্‌লে যুক্তি-বিস্তার ক'রেই থেমে যাওয়া যায়, শিষ্য-সংগ্রহ লোভাতুরদের পক্ষে সে আত্মস্থতা বজায় রাখা সম্ভব নয়, তাই টপ্‌ গিয়ারে মোটর চালিয়ে দিয়ে আর ব্রেক কষতে পারেন না। তখন শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত কুকথার পঙ্কিলতায় করে অবতরণ এবং মূত্র-পুরীষ-মিশ্রিত পাপ-প্রবাহে করে অবগাহন। যারা সৎকথা শুন্‌তে দলে দলে এসে ভিড় জমিয়েছে, তারা মনকে হাল্কা ক'রে নিয়ে ঘরে ফিরতে পারে না, কতকগুলি আবর্জ্জনা বোঝাই ক'রে তারা নিতান্তই ক্লান্ত ক্লিষ্ট হ'য়ে ঘরে ফেরে।

ধর্ম্মের ঘরে অধর্ম্মের বাসা

প্রশ্ন হইল,—এসব ক্ষেত্রে আমাদের কি কর্ত্তব্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে বাবা তোমরা চিন্তা কর। আমি হ'লে এসব ধর্ম্ম-কথায় সময় নষ্ট না ক'রে অন্য কোনো স্থানে গিয়ে নিজের প্রিয় ভগবানের কোনো নাম-গান শুনে সময়ের সদ্ব্যবহার কর্‌ব। জীবন অনিত্য। তার অধিকাংশই ত' বৃথা কেটে যাচ্ছে। ভগবানের নামে রুচি-বর্দ্ধনের জন্যই ত' সৎলোকের সৎকথা শোনা। নামে রুচি যদি বর্দ্ধিত না হ'ল, কাণ আর প্রাণ পূর্ণ হ'ল সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষবার্ত্তা দিয়ে, তবে সৎকথা শোনা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। ধর্ম্ম জীবে জীবে দেবে ঐক্যবোধ, মমত্ববোধ, আপনত্ব-বোধ। কিন্তু ধর্ম্ম যখন এর বিপরীত বস্তু কর্ব্বে পরিবেশন, তখন জান্‌বে, ধর্ম্মের ঘরে অতি সঙ্গোপনে অধর্ম্ম বাসা বেঁধেছে। তখন ধর্ম্মচর্চ্চা অপেক্ষা আত্ম-রক্ষাই অধিকতর কর্ত্তব্য হবে।

হিন্দুর কাপুরুষতা

একজন বলিলেন,—আপনি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে সকল ধর্ম্মমতের সৌন্দর্য্যের প্রতি সমদৃষ্টিশীল ও শ্রদ্ধাযুক্ত হ'তে বল্‌ছেন। কিন্তু খ্রীষ্টান-মুসলমানকে নিয়ে আমাদের ধর্ম্ম প্রচারকদের মাথা-ব্যথা নেই। তাঁদের যত আক্রমণ সবই হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তী অন্য উপসম্প্রদায়ের প্রতি। ব্রাহ্মরা নিরাকার উপাসনা করেন, আমি করি সাকার মূর্ত্তির পূজা। সুতরাং ব্রাহ্মরা পাষণ্ড, নাস্তিক, নিরয়ী। শাক্তেরা মা-কালীর

উপাসনা করেন, আমি করি শ্রীকৃষ্ণের। অতএব, তাঁরা অধার্ম্মিক, বিপথ-গামী এবং দুরাচার। কিন্তু মুসলমানরা নিরাকার উপাসক, অতএব তাঁরাও পাষণ্ড, একথা বল্‌বার তাঁদের সাহস নেই। শিখরা গ্রন্থ-সাহেবের পূজা করেন, অতএব তাঁরাও ভ্রান্ত, একথা বল্‌বারও সাহস নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—দুই কারণে নেই। এক কারণ, মুসলমানকে দীক্ষা দিয়ে নিজের সম্প্রদায়-পুষ্টির পথ কোথায়? সনাতনী হিন্দুরা যে চ'খের উপরে নিজের সম্প্রদায় থেকে দলে দলে ছেলে-মেয়েদের ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ দেখেও চিরকালই চুপ ক'রে থাক্‌তে অভ্যস্ত। মুসলমানকে শিষ্য ক'রে হিন্দু ক'রে নেবার প্রায় সকল পথই ত' তোমরা বন্ধ ক'রে রেখেছ! তোমাদের এক অতি চমৎকার আত্মতৃপ্তি এই যে, সনাতনধর্ম্ম নিত্য সত্য সনাতন, চল্লিশ কোটি হিন্দুও যদি আস্তে আস্তে মুসলমান হ'য়ে যায়, তা হ'লেও হিন্দুর অস্তিত্বলোপ হবে না। এই গেল এক কারণ। আর এক কারণ এই যে, হিন্দুর ঘরের এক সম্প্রদায়ের ছেলেকে বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যে মুগ্ধ ক'রে অন্য সম্প্রদায়ে টেনে আনলে হিন্দু তোমার মাথায় লাঠি চড়াবে না। এ বিষয়ে তুমি একেবারে নিশ্চিত। এক দল হিন্দুর ধর্ম্মমতকে সমালোচনা কর্ল্লে, গালাগালি দিলে বা অপবাদগ্রস্ত কর্ল্লে, অমনি তারা এসে অপর দলের মাথা ফাটাবে না, ছুরি মার্‌বে না। কিন্তু হজরত মহম্মদের ধর্ম্মটী নিয়ে সমালোচনা করেছ কি সঙ্গে সঙ্গে ধন্বন্তরীর দাওয়াই

প্রয়োগ হবে। এক্ষেত্রে দেওয়ানী আইন বাতিল। সব-কিছুর ব্যবস্থা হবে একেবারে কোর্ট মার্শালে। বিদায়-দক্ষিণা একেবারে নগদা-নগদ। সুতরাং তোমার মতে নিরাকার উপাসনা যদি খারাপও হ'য়ে থাকে, তবু গালাগাল দেবে কেবল ব্রাহ্মদেরই, এর বাইরে গণ্ডী পার হবার তোমার সাধ্য কি? শিখরাও নিজের ধর্ম্মের কোনো প্রকার অবমাননা সহ্য করেন না। এই বিষয়ে তাঁরা মুসলমানেরই হিন্দু-সংস্করণ। সুতরাং তাঁদের মতামত সম্পর্কেও সাবধান অবশ্যই হ'তে হয়। নিজ মতকে গাল দিলেও যারা সহ্য ক'রে যায়, তোমরা তাদের উপরেই বেশী ক'রে চাড়াও হও। অফিসে বড় বাবুর তর্জ্জনে-গর্জ্জনে যারা দিনে তিনবার ক'রে টেবিলের নীচে মাথা গলিয়ে প্রাণ বাঁচায়, বাড়ী এসে সেই কাপুরুষগুলিই বৌকে ধ'রে লাঠি-পেটা করে, খড়ম-পয়জার মারে। সবলকে সেলাম করা আর, দুর্ব্বলকে প্রহার করা কাপুরুষের ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম কত দিকের বিচারে কত মহৎ, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা আস্তে আস্তে একটা বিরাট কাপুরুষের জাতিতে পরিণত হয়েছে। মুসলমান হিন্দুর মেয়ে নিয়ে বিয়ে করলে তোমরা যুক্তি দাও, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই মেয়েটা বিধর্ম্মী-পত্নী হ'ল। কিন্তু একজন শূদ্রের ছেলে অশূদ্রের মেয়েকে বিয়ে কর্ল্লে তোমরা তখন আর মেয়েটার কর্ম্মফল ভেবে নিশ্চিন্ত থাক্তে পার না, সেই শূদ্রের ঘরে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দাও। মুসলমান তোমার বিশ্বনাথের মন্দির ভেঙ্গে তাতে মসজিদ নির্ম্মাণ কর্ল্লে বড়-জোর তোমরা একটু

কাঁদ্বে, কখনো বা সুলতান মামুদের পায়ে প'ড়ে বলবে,—এই নিন্ অত লক্ষ টাকা, তবু আমার সোমনাথকে ছেড়ে দিন্। তোমাদের বিক্রম অতটুকু। কিন্তু ছোট জাত তোমার বিশ্বনাথ মন্দিরে, বৈদ্যনাথ-মন্দিরে ঢুকতে যাক্, অমনি তুমি লাঠি-সোটা নিয়ে এসে রুখে দাঁড়াবে। ছোট জাতের প্রতিনিধিরা হয়ত তোমাদের যুক্তি শুনাতে যাবেন যে, শিবপূজা দক্ষ-যজ্ঞের আগে ভারতীয় আর্য্যসমাজে প্রবর্ত্তিত হ'তে পারে নি, কারণ শিব ত' অনার্য্যদের দেবতা। তাই শিবপূজায় জাতিভেদ নেই, মন্ত্র-তন্ত্রের কচ্‌কচানি নেই, সরল মন, সহজ বিশ্বাসই যথেষ্ট। কিন্তু কে শুনবে সে কথা? বেদমন্ত্র উচ্চারণ কর্ত্তে কর্ত্তে জলদগম্ভীর স্বরে ব্রাহ্মণের পুত্রেরা আদেশ করবেন,—স'রে যাও। জটাজূটমণ্ডিত মস্তকে বড় বড় মঠের সাধু-মহন্তেরা এসে শাস্ত্রবচন আউড়ে বলবেন,—দূরে যাও। হিন্দু ধর্ম্মাচার্য্যদের একমাত্র নীতি হচ্ছে,—বহিষ্কার। যত লোককে তোমরা বাইরে সরিয়ে দিতে পার, ততই যেন তোমাদের পৌরুষ। এই যে ধিক্কারজনক অনুদারতা, এই যে ন্যক্কারজনক আত্মপ্রবঞ্চনা, এইটেই এখন তোমাদের বিশেষত্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর সব-ধর্ম্মাবলম্বীরা জানে, হিন্দুরা কাপুরুষ। তাই তারা লুটের মহালে লুট চালাচ্ছে। আর দিন দিন তোমাদের সংখ্যা যত ক'মে যাচ্ছে, ততই তোমরা নিজেদের মধ্যে আত্মকলহকে বেশী ক'রে খুঁচিয়ে তুলছ। একটা কথা আমি শতবার বলি,—"আত্মকলহ কার ধর্ম্ম? কুক্কুরের ধর্ম্ম।"

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্ম নিয়ে লক্ষ লক্ষ সাধক সমগ্র জীবন কীর্ত্তন করেছেন, সব ছেড়ে ছুড়ে একমাত্র ধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রেই আমৃত্যু কাটিয়েছেন। তাঁরা নমস্য। কিন্তু তবু তোমাদের ভিতরে ধর্ম্মের সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বতোভদ্র সর্ব্বসুসমঞ্জস মূর্ত্তি ফুটে ওঠে নি, যা পারে নিজেরই বলে জগতের সকল সমস্যার সমাধান কত্তে। কখনো ধর্ম্ম এমনভাবে প্রচারিত হয়েছেন, যাতে স্বাধীন জাতি পরাধীন হয়েছে। কখনো ধর্ম্ম এমনভাবে প্রচারিত হয়েছেন, যাতে নারী হয়েছে উৎপীড়িতা, দুর্ব্বল হয়েছে নিষ্পেষিত, অক্ষম হয়েছে উপদ্রুত। কখনো ধর্ম্ম এমনভাবে প্রচারিত হয়েছেন, যাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিজের ভিতরে এনে হজম ক'রে ফেলবার ক্ষমতা তোমাদের হয়েছে হ্রস্বীভূত। কখনো ধর্ম্ম এমনভাবে প্রচারিত হয়েছেন, যাতে কোনো নূতন সমস্যা এলে তোমরা হয়েছ সমাধানে অপারগ এবং প্রাণপণে কেবল দিয়ে গেছ গোঁজামিল; ধর্ম্মকে মানুষের ভিতরে না জাগিয়ে তোমরা মানুষকে ধর্ম্মের ভিতরে ঢুকাতে চেয়েছ, ধর্ম্ম মানুষের ভিতরে আর বাইরের সকল বন্ধন কেটে ফেলে বিশ্বতোমুখ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা কত্তে অক্ষম হ'য়ে জীবন্ত মানুষকে ধরে ধরে কেবল শৃঙ্খলিত করেছে আর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে দেখিয়েছে চোখরাঙ্গানি, মানুষের উপলব্ধিকে করেছে শাসন। তারই জন্য

না তোমাদের অত উচ্চ চীৎকার সত্ত্বেও তোমাদের প্রত্যেকের ঘরের ছেলেরা ক্রমে ক্রমে হ'য়ে উঠ্ছে ধর্ম্মে অবিশ্বাসী। তোমরা যখন পরের ছেলেকে নিজের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে ধার্ম্মিক করার জন্য অত সদম্ভ তত্ত্বপ্রচার ক'রে বেড়াচ্ছ, ঠিক সেই সময়ে তোমার আত্মজ পুত্র রজনীতে হচ্ছে যবনী-জার, আর দিনমানে হচ্ছে নোংরা রেষ্টুরেন্টের অখাদ্য মাংসের শিক্-কাবাব-ভোজী। ধর্ম্মই যদি চাই, তবে তাকে চাইব আজ তার সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভায়, তার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহিমায়, তার সর্ব্বতোভদ্র সামর্থ্যে। এক টুকরা ধর্ম্ম আর দুই টুকরা ধর্ম্ম ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু জাতিকে রক্ষা কত্তে সমর্থ হবে না।

শেষ রাত্রি সাড়ে চারিটার ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া ত্যাগ করিলেন।

হবিগঞ্জ (শ্রীহট্ট)

২১শে বৈশাখ, ১৩৪১

অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি হবিগঞ্জ আসিয়াছেন। পুরাতন মুন্সেফি নামক মহাল্লা-নিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আহ্বানে তিনি আসিয়াছেন। ঈশ্বর বাবু আতিথ্যের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। কৃষি-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর বাসায় শ্রীশ্রীবাবামণির অবস্থিতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যামিনীবাবু বড়ই ভক্তিমান্ ব্যক্তি। তাঁহার ব্রাহ্মণীও তদ্রূপ। ছেলেপিলেগুলি যেন এক একখানা সুদৃশ্য ছবি। শ্রীশ্রীবাবামণি

যেন খেলার সাথী পাইলেন। দশ মিনিটে সকলে অতি আপনার হইয়া গেল।

সবাই সবার

যামিনীবাবু বলিলেন,—আপনাকে যেন কত কালের পরিচিত মনে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

সবাই সবার চির আপনার
দোষ শুধু ভুলে যাওয়া,
যে ছিল আপন, ভাঙ্গিলে স্বপন,
তাহারেই ফিরে পাওয়া।
যে ছিল নিকট, ভাবি তারে দূর,
কহিয়াছি শুধু,—"যারে আরো দূর।"
কে জানিত আগে গায়ে এসে লাগে
তারি যে গায়ের হাওয়া?
সবাই আপন, কেহ পর নয়,
সকলের মাঝে নিজ পরিচয়,—
আপনা পাসরি' হৃদয়ে আবরি'
সবারে সবার চাওয়া।

লক্ষ্য কর মহৎ

শ্রীরাসবিহারী সরকার হবিগঞ্জ কলেজে পড়েন। চাঁদপুরে থাকিতে ইনি শ্রীশ্রীবাবামণির কৃপা পাইয়াছেন। কলেজে

যুবকদের মধ্যে ইনি খুব কাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির পুস্তকাবলি ছাত্রদের মধ্যে পাঠের জন্য দিয়া দিয়া বেশ একটী প্রভাবশালী কেন্দ্র গড়িয়া লইয়াছেন।

ছাত্রদের অবস্থা বিস্তারিত শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে বর্ণনা করিলে পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা কথা মনে রেখো, ছেলেদের অন্তরের ভাব-পরিপুষ্টির জন্যই তুমি তাদের ভিতরে কাজ কচ্ছ। তাদের সবাইকে এনে আমার কাছে দীক্ষিত করিয়ে গুরু-ভাইদের সংখ্যা বাড়ানো তোমার লক্ষ্য হবে না। দল ভারী করার বুদ্ধি এলেই মিথ্যার প্রতি আসক্তি আসে, যার কাছে যে কথা বল্লে তাকে সহজে ফাঁদে ফেলা যাবে, তার কাছে তৈরী ক'রে সেই কথা বল্‌বার প্রলোভন জন্মে। মহাদুর্দ্ধর্ষ জগৎকল্যাণকারী শক্তিশালী এক নবজাতির সৃষ্টি তোমাদের লক্ষ্য। টেনে বুনে গল্প রচনা ক'রে, ধর-পাকড় ক'রে গুরু-ভাই জুটিয়ে ধর্ম্ম-সংঘটির সর্ব্বনাশ সাধন তোমাদের লক্ষ্য নয়। ধর্ম্ম-প্রচার কর্ব্বে নিষ্কাম হ'য়ে, আদর্শ প্রচার কর্ব্বে নিঃস্পৃহ হ'য়ে, তত্ত্ব-ব্যাখ্যা কর্ব্বে সমগ্র বিশ্বের প্রতি মানবের মুখপানে তাকিয়ে। ছোট্ট একটা দল, ছোট্ট একটা খোঁয়াড়, ছোট্ট কয়েকখানা পশু বাঁধবার দড়ি তোমার লক্ষ্যও হবে না, হাতিয়ারও হবে না। লক্ষ্য কর মহৎ।

মানুষ চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব'লো না যুবকদের—"আমার

দলে এসো"। ব'লো তাদের—"মানুষ হও।" মানুষ দেবতারও আরাধ্য। তাই ভগবানকে বারংবার মানুষ-মূর্ত্তিতে অবতার ব'লে পূজা করা হয়েছে। মানুষ-জন্ম দেবতাদেরও বাঞ্ছিত। তাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-মানসে দেবতাদের এই মানুষের ধরায় বারংবার নেমে আসতে হয়েছে। গরু চুরি ক'রে ঋষির শাপে দেবতা এলেন মনুষ্য-ঘরে জন্ম নিতে, এসব কেচ্ছা ভুলে যাও। মানুষ না হ'লে প্রকৃত দেবত্বের বিকাশ ঘটে না ব'লেই অষ্ট বসুর এক বসু ভীষ্ম হ'য়ে গঙ্গাপুত্ররূপে জন্ম নিলেন। সকল পুরাণ-কাহিনী থেকে বেছে বেছে সমস্ত দেবতাদের চরিত্র আলোচনা কর, আর মনুষ্য ভীষ্মের চরিত্রকে তার সঙ্গে তুলনা কর। দানবকে পরাভূত করার জন্য তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব নাশ প্রয়োজন হয় যে দেবতাদের, তাঁদের চেয়ে মানুষ ভীষ্ম অনেক মহৎ। গুরুপত্নীতে ইন্দ্রিয়-লালসা দমনে অক্ষম দেবতাদের চেয়ে মানুষ ভীষ্ম অনেক মহৎ। মানুষ যে দেবতার চাইতেও মহৎ, এই বোধ সকলের মধ্যে জাগিয়ে দাও, আর তার ফলে দেবতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণই শেষ পরিণতি না হ'য়ে নিজের ভিতরে জাগ্রত জীবন্ত ভাস্বর এক মনুষ্যত্ব-লাভের দুশ্চর তপস্যায় তাদের কর ব্রতী। আমার দল আমি চাই না, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বল আমি চাই।

যাহা ভাবিবে, তাহাই হইবে

পরিতৃপ্ত মনে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী স্বস্থানে রওনা হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দাঁড়া, "স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব" ফেণী গোবিন্দ প্রেসে ছাপা হচ্ছে। আমার পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে যা। খুব সুস্পষ্ট আর নির্ভুল ভাবে অনুলিপী করা চাই, যেন প্রেসে কম্পোজিটারদের বুঝতে কোনো কষ্ট না হয়। বইখানা লিখেছিলাম, জেল থেকে বেরিয়ে ঠিক তার পরে ময়মনসিংহ ব'সে। এতদিনে ছাপা সম্ভব হচ্ছে।

রাসবিহারী সানন্দে সম্মত হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীন কালে হাতে লিখেই সব দেশে সদ্‌গ্রন্থের প্রচার হত। যাঁরা লিখ্‌তেন, তাঁরা সাধারণ জ্ঞানের মানুষ হ'লেও সদ্‌গ্রন্থের অনুলিপি তৈরী কত্তে কত্তেই মহাজ্ঞানী হ'য়ে যেতেন। নকল করার সময়ে মাছি-মারা কেরাণীর কাজ করিস না, গণেশ যেমন অর্থ বুঝে বুঝে ব্যাসদেবের মুখনিঃসৃত মহাভারত লিখেছিলেন, তেমনি ক'রে কাজ কর্‌বি। তা' হ'লেই এক ঢিলে দুই পাখী মর্‌বে,—প্রেসেও যাবে নির্ভুল পাণ্ডুলিপি, তোরও হবে মহচ্চিন্তার অনুধ্যান। "জগতের প্রত্যেক রমণী তোমার জননী",—এই কথা ভাবতে ভাবতে দেখবি তুই সত্য সত্য প্রত্যেক জননীর কোলের পাপচিন্তাহীন নিষ্কলুষ একটী সন্তানে পরিণত হ'য়ে গেছিস্। কেবল ভাব্‌বি, তুই পবিত্র। কেবল ভাব্‌বি, তুই সুন্দর। কেবল ভাব্‌বি, তুই সুন্দর অপাপবিদ্ধ। যা ভাব্‌বি, তাই হবি। চিন্তার এত শক্তি।

বিধবা-বিবাহ

স্থানীয় কোনও অনুন্নত-সমাজের একটী হিন্দু যুবক দেখা করিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সাদরে যুবকটীকে বসাইলেন, কুশলপ্রশ্ন ও প্রয়োজন-জিজ্ঞাসার পরে যুবকটী বলিলেন,— বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে আপনার মত কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মত কি, তাতে ত' কিছু আসে যায় না বাবা। তোমার মত কি, সেইটাই হচ্ছে আসল কথা। তোমার যা মত, তাতে যদি সমাজ-হিতের লক্ষ্য থাকে, তবে আমারো তাই মত। আমি সংসারী নই, সন্ন্যাসী। বিবাহাদির বিষয়ে আমি যে মতই পোষণ করি না কেন, তাতে আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব অল্প। তোমরা সংসারী, তোমাদের দায়িত্বই এতে অধিক। তাই, তোমাদের মতই আগে জানা দরকার।

যুবক বলিলেন,—আমাদের ত' মত এই যে, সকল বিধবাদের পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার ইচ্ছা নেই, তারও?

যুবক।—হ্যাঁ, তারো। কারণ, দিন দিন হিন্দুর সংখ্যা ক'মে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংখ্যা বাড়াবার তোমাদের সাহস কৈ? ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ সমাজে গ্রহণে তোমাদের আশ্চর্য্য উদাসীনতা। নিজেদের সমাজের মধ্যে ছোট-বড়'র

পঞ্চাশটা থাক্। ব্রাহ্মণ তোমাকে হেয় জ্ঞান করে, তাই তুমি মুসলমান বা খ্রীষ্টান হ'য়ে গেলে তার মনে হয় না যে, তারই অঙ্গচ্ছেদ হ'ল। তুমি আবার চাঁড়ালকে নিকৃষ্ট মনে কর, তাই চোখের উপরে ধর্ম্মান্তরের ফলে তাদের সংখ্যা ক'মে গেলে তোমার মনে দুঃখ হয় না। তবে সেন্সাস রিপোর্ট থেকে সামগ্রিক ভাবে হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের যে পরিচয় মাঝে মাঝে পাও, তাই থেকে একটু উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌তে থাক, "হিন্দুর সংখ্যা বাড়াও, সংখ্যা বাড়াও, নইলে পরিণামে ভোট গণনায় হেরে গিয়ে নৌকা বান্‌চাল হবে।" কেমন? এই ত' তোমাদের মনের সত্যিকার অবস্থা? কিন্তু বিধবা মাত্রেই পুনর্বিবাহের যোগ্যা নয়। এদিকে হাজার হাজার মেয়ে পাত্রাভাবে পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করার জন্য প্রায় তৈরী।

যুবক বলিলেন,—বিধবা বেচারীদের প্রতি গোড়া থেকেই আপনাদের এক বিষদৃষ্টি রয়েছে। সেই ভয়েই ত' বিধবারা আবার বিয়ে কত্তে চায় না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির বিরুদ্ধ মনোভাব যে বিবাহেচ্ছুকা বিধবারও পুনর্বিবাহে অসম্মতি প্রকাশের একটা কারণ, ইহা সত্য। কিছু পুরুষদের কাছ থেকে বাধা আসে যতটা, তার দশগুণ বাধা আসে নারী-সমাজ থেকেই। একটী বিবাহিতা মহিলার পক্ষে সমাজের অসংখ্য পুরুষের সহিত দেখা-শুনার সুযোগ কম, তার কথা বলার অধিকাংশ সাথীই স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক নিয়েই তার সমাজ। সুতরাং স্ত্রীজাতির মধ্যে

উদার অসঙ্কীর্ণ ভাব না এলে পুনর্বিবাহিতা বিধবা নিজেকে অধিকতর কষ্টপ্রদ একটী নূতন পিঞ্জরে আবদ্ধ পশু ব'লেই ভাব্‌তে বাধ্য হবে। স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের প্রতি যত ক্ষমাহীন, পুরুষেরা স্ত্রীলোকের প্রতি তত নয়।

যুবক বলিলেন,—বিধবার বিবাহ সম্পর্কে আপনার সুস্পষ্ট মতামত আমি জান্‌তে চাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিনয় কুমার সরকারের নাম শুনেছ? বিক্রমপুরে জন্ম, কল্‌কাতায় প্রতিভার প্রকাশ, সমগ্র পৃথিবী যাঁর কর্ম্মস্থল,—বর্ত্তমান বাংলার যিনি একটা গৌরবের সামগ্রী।

যুবক বলিলেন,—হাঁ শুনেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই বিনয় সরকার বিলেতে এক মহামনীষী ইংরাজের সঙ্গে দেখা কত্তে গিয়েছিলেন। বল্লেন,—"ভারতবর্ষ সম্পর্কে আপনার মতামত কি, জান্‌তে চাই।" মনীষী নিজ ঘড়িটীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—"আমার লেখা কুড়ি ভলিউম বই আগে পড় গিয়ে। তা'পড়েও যে বিষয় জানো নি ব'লে বুঝবে, মাত্র সেই কথাটা জিজ্ঞেস করার জন্য এসো।" বিধবাদের সম্পর্কে আমার অধিকাংশ মনোভাব ও মতামত "বিধবার জীবন-যজ্ঞে" প্রকাশ করা আছে। কষ্ট ক'রে বইখানা পড়্‌বে। তাতে তোমার আমার উভয়েরই সময় বেঁচে যাবে। সময় হচ্ছে পরমায়ু, এতে এক কণাও অত্যুক্তি নেই। যতটুকু সময় গেল, ততটুকু পরমায়ু গেল।

জীবিত সমাজ

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—সমাজের কুশলের দিকে তাকিয়েই কুমারীর বল, বিধবার বল, বিবাহের ঔচিত্য-নির্দ্ধারণ হবে। সমাজে নানা সময়ে নানা পরিস্থিতি হচ্ছে এবং হবে। সেই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমাজকে পুনঃ সংস্কার ক'রে নেওয়াই হচ্ছে জীবনের চিহ্ন। মৃত কেবলই পচে, জীবিত পচে না কিন্তু কাল-সহকারে রূপান্তরিত হয়। মূল সত্যে সুস্থির থেকে কোনো দিকে বাড়ে, কোনো দিকে কমে, এই হচ্ছে জীবিত সমাজের লক্ষণ। যে বৃক্ষ মূলোৎপাটিত হয় নি, তার একটা ডাল ঝড়ে ভাঙ্গলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক দিয়ে নূতন শাখার উদ্‌গম হয়। ইহাই জীবনের নিয়ম। জীবনের সেই নিয়মের সঙ্গে মিল রেখে উচ্চ লক্ষ্যকে চোখের সামনে জাজ্জ্বল্যমান ক'রে ধ'রে যা করবে, জান্‌বে,—তাই হচ্ছে ঈশ্বরানুমোদিত। তোমার আমার মতামত কারো উপরে চাপাবার বা চালাবার চেষ্টারই কোনো প্রয়োজন নেই। যাকে ঈশ্বরানুমোদিত ব'লে অনুভব কর্ব্বে, নির্ভয়ে তাই প্রচলনে লেগে যাও।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গোছের লোক নিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি চেয়ার হইতে উঠিলেন এবং অন্য ঘর হইতে চেয়ার আনাইয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে বসিতে দিলেন।

ঈশ্বর বাবু শ্রীশ্রীবাবামণির সম্মুখে চেয়ারে বসিতে সম্মত হইলেন না।

পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল না, নাম শুনিয়া দেখিয়া যাইতে আসিয়াছেন। দুই চারিটি কথাবার্ত্তার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

সম্মান সকলকেই করণীয়

কিন্তু যেই যুবকটি এতক্ষণ ধরিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে বহু পরিমিত কালক্ষেপ করিতেছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন,—একটা অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্রাহ্মণকে আপনি এত সম্মান দিতে গেলেন কেন? সে না বসা পর্য্যন্ত আপনি নিজ চেয়ারে বস্‌লেন না!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"সে" শব্দটি তুচ্ছার্থে বল্‌ছ। "তিনি" বল।

যুবক।—কেন? গলায় একটা পৈতা আছে ব'লেই তাকে সম্মান কত্তে হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বয়সে তিনি তোমার পিতার চাইতেও বড়, এই জন্যেও সম্মান কত্তে পার।

যুবক।—কিন্তু সম্বল ত' ঐ একটা ছিন্ন মলিন যজ্ঞসূত্র। একজন ধোবা বা মজুর এলেও কি আপনি তাকে এই সম্মান কত্তেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিশ্চয় কত্তাম, যদি বুঝতাম, এই সম্মানে

আবার সে উল্টে অসম্মান বোধ করবে না। যাঁর প্রতি যেরূপ ব্যবহারে যিনি প্রীত হন, তাঁর প্রতি তদ্রূপ ব্যবহারই সম্মানের পর্য্যায়ে পড়ে। পৃথিবীর প্রতিটী প্রাণীকে আমি সম্মান কত্তে বাধ্য, কারণ আমার পরমেশ্বর প্রতিজনের মধ্যে বিদ্যমান। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অল্প সময় ছিলেন, কিন্তু আমি দেখ্‌লাম তাঁর ঐ ছিন্ন নামাবলীর নীচে একটী শ্রদ্ধাবান্ হৃদয় বাস কচ্ছে। তাই, তাঁকে আরো বেশী ক'রে সম্মান কি ক'রে দেখান যেতো, সেই বিচার আমার এখন মনে এসেছে। তুমি এসেছ পেট ভরা অশ্রদ্ধা নিয়ে, কেবল প্রতি কথাতেই একটা ক'রে এমন ইঙ্গিত কচ্ছ যেন অপরের প্রতি ভদ্রতা-বোধ নিছক বর্ব্বরতা। কিন্তু তুমি আসা মাত্র যদি তোমাকে চেয়ারে বসতে বল্‌তাম, তা হ'লে তাকে হয়ত তুমি উপহাস ব'লে ভ্রম কত্তে পার, তাই ভেবে তখন তোমার জন্য চেয়ার আনানো হয় নি। তবে সম্মান তোমাকেও কত্তে চাই। এস বাবা, লক্ষ্মী ছেলেটীর মত এই চেয়ার খানায় এসে ব'সো।

হবিগঞ্জ

২৩শে বৈশাখ, ১৩৪১

বাঙ্গালীর পাঁচটা

অদ্য স্থানীয় টাউন হলে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রথম বক্তৃতা হইল। সকল স্থানের ন্যায় এখানেও সর্ব্বসাধারণকে জানান হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীবাবামণি ঠিক্ নির্দ্ধারিত সময়ে ঘড়ি ধরিয়া বক্তৃতারম্ভ

করিবেন। কিন্তু অনেকেই এই কথার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। প্রায় সকলেই ভাবিয়াছেন,—আরে, বাঙ্গালীর পাঁচটা ত'?

পাঁচটা বাজিতে মাত্র দুই মিনিট থাকিতে শ্রীশ্রীবাবামণি টাউন-হলে প্রবেশ করিলেন। অন্যতম উদ্যোক্তা ক্যাপ্টেন প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত ব্যতিত আর কেহ তখনো আসেন নাই। মিনিট খানেক পরে আরও দুইজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসিলেন। পাঁচটা বাজিতে অৰ্দ্ধ মিনিট থাকিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা-মঞ্চে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং উপস্থিত মাত্র ছয়জন শ্রোতা লইয়াই ঠিক্ পাঁচটায় বক্তৃতা সুরু করিলেন।

হবিগঞ্জের প্রত্যেকটী বক্তৃতাই খুব উচ্চস্তরের হইয়াছিল কিন্তু কেহ কোনও 'নোট' রক্ষা করেন নাই বিধায় আমরা এখানে উপহার দিতে পারিতেছি না। বৃক্তৃতার মধ্যাংশে 'হল' প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শ্রোতাদের অর্দ্ধেকের অধিক ছাত্র, সিকি পরিমাণ স্থানীয় অভিভাবকবৃন্দ এবং অপর সিকি নানা জাতির মিশ্রিত।

বালকের মন

বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ বিশ্রাম-স্থানে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যামিনী বাবু বলিলেন,—বক্তৃতা অতি অপূৰ্ব্ব হয়েছে, এ সহরে এরূপ বক্তৃতা কেহ কখনো শুনেছে কিনা, জানি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকের শ্রোতারা অধিকাংশই বালক।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেবোন্মুখ চিত্ত নিয়ে যদি একটী বালকও বক্তৃতা শুনে থাকে, তবে সেটা ত' বক্তার পক্ষে এক মহাভাগ্যের কথা। বৃদ্ধেরা হচ্ছেন কেউ জঙ্গলা জমি, কেউ বা আবাদি জমি।—জঙ্গলা জমিতে এত আগাছা জ'ন্মে থাকে যে, তাতে বীজ বপন কল্লে তা' আগাছার গোড়াতেই প'চে নষ্ট হয়। আর আবাদি জমিতে ফসল থাকে ব'লে সেখানে পুনরায় বীজ বপন কত্তে যাওয়া বীজের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। বালকদের মন আর যুবকদের মন হচ্ছে তৃণহীন উর্ব্বর প্রান্তর, সামান্য কর্ষণ ক'রে যা বোনা যাবে, তাতেই অপ্রত্যাশিত ফসল পাওয়া যাবে। একটী বালকও যদি মন দিয়ে সৎকথা শোনে, তাহ'লে পরিপূর্ণ যৌবনে সে সেই কথাকে কাজে পরিণত কত্তে প্রয়াস পাবে, পরিপক্ক প্রৌঢ়ে সে সেই কার্য্যের প্রতি আরও শত জনকে আকৃষ্ট কর্ব্বে এবং পরিণত বার্দ্ধক্যে সে হবে সহস্র জনের আদর্শ-স্থানীয় জ্ঞানদাতা গুরু।

হবিগঞ্জ

২৪শে বৈশাখ ১৩৪১

গুরু-বন্দনার আবশ্যকতা

জনৈক বর্ষীয়ান্ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভারতের প্রায় প্রত্যেক সাধক-সম্প্রদায়েরই দেখা যায় যে, সাধন বা উপাসনা সুরুর প্রারম্ভেই গুরুবন্দনা রয়েছে। এর তাৎপর্য্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরু-বন্দনার ফলে গুরুদত্ত

সাধনের প্রতি একনিষ্ঠ ভাব জন্মে। এতে সাধন জমাট হয়। নিত্য নূতন পন্থায় নিত্য নূতন প্রণালীতে উপাসনা কত্তে গেলে ক্রমশঃ মূল সাধনের প্রতি একটা অনাস্থা এসে যায়, যার ফলে শেষে আর কোনো সাধনেই মন থাকে না বা মন বসে না। তাই সকল অনাস্থা ও সকল অ-নিষ্ঠার মূলোৎপাটনের জন্য গুরু-বন্দনার ব্যবস্থা। এইটী হচ্ছে প্রথম তাৎপর্য্য। কিন্তু দ্বিতীয় বা গভীরতর তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, অনিত্য বস্তুতে গুরু-ভাব আরোপের দ্বারা স্বকীয় সাধন-নিষ্ঠায় অনিত্যতা-বোধ সঞ্চারণ যাতে না হয়, তার জন্য নিত্য সত্য নিরঞ্জন অদ্বিতীয় পরমপ্রভুই যে সাধকের অনন্যশরণ অনন্যাশ্রয় শ্রীগুরু, এই কথা সাধকের সাধনের সুরুতেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া অত্যাবশ্যক।

পিতৃমাতৃসেবা ও ভগবৎ-সেবার বিরোধে কর্ত্তব্য

অপর একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতৃমাতৃ-সেবার সঙ্গে ভগবৎ-সেবার বিরোধ ঘটলে কি করণীয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই বিরোধের যাতে দ্রুত অবসান ঘটে, তাই সর্ব্বপ্রযত্নে করণীয়। ভগবৎ-সেবাই জীবের একমাত্র অবশ্যকরণীয়, অন্য সকল কর্ত্তব্য স্থল-বিশেষে উপেক্ষণীয় এবং স্থল-বিশেষে প্রতিপাল্য। কিন্তু তুমি যদি পিতামাতার সহায়তা না পেতে, তা হ'লে ভগবানকে ভজবার

জন্য এই দেহ লাভ কত্তে না এবং এই দেহের তথা দেহমধ্যস্থ মস্তিষ্কের সেই পরিমাণ পুষ্টি-তুষ্টিও ঘটত না, যার ফলে আজ ভগবৎসেবাই অবশ্য-কর্ত্তব্য ব'লে অনুভব কচ্ছ। সুতরাং পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যকে এক কথায় তুচ্ছ ক'রে দিতে পার না। এই জন্যই পিতৃমাতৃসেবা ও ভগবৎ-সেবা উভয় সেবার কোনটীর প্রতিই উপেক্ষাশীল না হ'য়ে দুটীর মধ্যে থেকে বিরোধের কারণটুকুকে দূর করার চেষ্টাই একান্ত ভাবে করণীয়। সে চেষ্টার পশ্চাতে সুকৌশলী বুদ্ধির প্রয়োজন এবং তার জন্য সংযত মনের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। এজন্য অনুক্ষণ ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাও। সর্ব্বসঙ্কটতারণ পরমপ্রভু তোমার সঙ্কট-বিদূরণ কর্ব্বেনই কর্ব্বেন।

কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, এরূপ এক যুক্তি উপস্থাপিত করা যেতে পারে যে, ভগবানই সর্ব্বেশ্বর পরমপ্রভু, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত মাতাও গর্ভধারণে সমর্থ হন না, পিতাও সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হন না, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া পিতা মাতার প্রাণেও বাৎসল্য-রসের সঞ্চার হ'তে পারে না, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া মাতার স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হয় না, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া পিতার বাহুতে অন্নার্জ্জনের সামর্থ্য আসে না, সুতরাং পিতামাতা যে জন্ম দিলেন, পালন কর্ল্লেন, শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা কর্ল্লেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত একমাত্র পরমপ্রভুর শ্রীচরণে,

পিতামাতার নিকটে নয়। তত্ত্বের দিক থেকে এ বিচার ঠিকই। কিন্তু যতক্ষণ না পরিপূর্ণ ব্রাহ্মী নিষ্ঠায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পার্থিব জগতের হিসাবেই কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার বিচার হবে এবং পার্থিব কর্ত্তব্যে উপেক্ষা তোমার আধ্যাত্মিক অধোগতিরই কারণ হবে। এই পৃথিবীর দৃষ্টিতে মানুষের সকল কর্ত্তব্যের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। এই পৃথিবীর দৃষ্টিতে মানুষের সকল অন্যায়ের সেরা অন্যায় হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা। যতক্ষণ নিজের উচ্চানুভূতি ও তত্ত্বোপলব্ধির মহিমায় এই পৃথিবীর ন্যায়ান্যায়ের উর্দ্ধে গিয়ে স্থান ক'রে নিতে না পাচ্ছ, ততক্ষণ এই জাতীয় যুক্তি আত্ম-প্রতারণারই সহায়ক হবে।

পিতামাতার প্রতি কখন অকৃতজ্ঞ হওয়া যায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রাহ্মী নিষ্ঠার পরিচয় হবে কিসে জান? তোমার চিরপ্রেমময়ী ভার্য্যাকে হঠাৎ পরপুরুষে অনুরক্ত দেখে যখন তুমি বিচার কর্ব্বে যে, ঈশ্বরেচ্ছা ছাড়া ত' আর হৃদয়ে প্রেম কেউ কোনো আধারে অর্পণ কত্তে পারে না, অতএব এই ব্যাপারের কর্ত্তা তোমার পত্নী নন, কর্ত্তা হচ্ছেন ভগবান, অতএব দায়িত্ব বা দোষ যাই থাকুক, কিছুই তোমার স্ত্রীর নয়, সবই ভগবানের,—তখন তোমার পক্ষে মাতাপিতার স্নেহের জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ না হ'য়ে এক মাত্র ভগবানেরই প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া সঙ্গত হবে। তোমার চিরস্নেহাধার নয়নের মণি পুত্রকে

আততায়ী দস্যু তোমার চক্ষের সমক্ষে হত্যা করলে যখন তুমি বিচার কর্ব্বে যে, ভগবৎ-প্রেরণা ছাড়া জগতে কেউ কারো বিরুদ্ধে কনিষ্ঠাঙ্গুলীটীও উত্তোলন কত্তে সমর্থ হয় না, অতএব এই দস্যুর উপরে তোমার পুত্র-হননের দায়িত্ব অর্পণ করা চলে না, এ কার্য্যের ভাল-মন্দ সব কিছুর জন্য সর্ব্বেশ্বর পরমপ্রভুই একমাত্র দায়ী,—মাত্র তখনই তোমার পক্ষে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। পুত্র যে ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, পিতা কেন সেইধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ভজনা কর্ল্ল না, এই জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ সন্তান পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে নিষ্প্রয়োজন বিচার ক'রে পিতাকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা ক'রে ঈশ্বরের প্রীতিজনক কার্য্য করল ব'লে মনে করেছে, এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম-বিপ্লবের অলিখিত ইতিহাসে রয়েছে। কিন্তু সেই পুত্রই যদি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'য়ে বহু পরনারী আহরণ করার পরে তার ভোগ-বিলাসের তৃপ্তির জন্য রমণীবিশেষ সকল লাজ-লজ্জায় সতীত্ব-সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সহিত কেন মাদক-পূর্ণ পান-পাত্র হস্তে এসে নিকটে দাঁড়াল না ব'লে সেই রমণীর মস্তক স্কন্ধচ্যুত কত্তে দ্বিধা বোধ না করে, এই রমণীর এইরূপ মারাত্মক নৈতিক দ্বন্দ্বের সময়ে এর ভিতরে একবার ঈশ্বরাভিপ্রায়কে স্মরণ কত্তে চেষ্টা না করে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, পিতৃহত্যাকালীন তার যে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঘোষণা, ওটা ভাব নয়, নিতান্তই একটা ভাণ মাত্র।

পিতামাতার প্রতি মহাপুরুষের আচরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু যিনি যত বড়ই হউন, পৃথিবীর ইতিহাসে মাতাপিতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হ'তে কোনো মহাপুরুষকেই দেখা যায় না। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্তি ত্যাগ করেন নি, একথা সত্য; কিন্তু পিতার প্রতি তার কোনো অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের কথাও কেউ কখনো শোনে নি। সুতরাং তোমাদের উচিত মাতৃ-পিতৃ-সেবাকে ভগবৎ সেবারই অঙ্গীভূত এক মহাকর্ত্তব্য জ্ঞান ক'রে চল্‌তে চেষ্টা করা। যেখানে পিতামাতা ধর্ম্মদ্বেষী, সেখানে তাঁহাদের ধর্ম্মদ্বেষ হ্রাসের জন্য হিতকর পন্থা সুকৌশলে অবলম্বন কর, কিন্তু পিতৃমাতৃদ্বেষী তুমি হ'য়ো না।

গুরুজনকে উপদেশ দানের বিপদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুজনকে উপদেশ-দান অনুজনের পক্ষে বিপজ্জনক। বিপদ বহুবিধ। প্রথম বিপদ হচ্ছে এই যে, উপদেশ দিতে গেলেই তোমার অজ্ঞাতে তোমার মনে আত্মাভিমানের উৎপত্তি হবে এবং নিজেকে গুরুজনদের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করার দরুণ নৈতিক অধোগতি এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতি হবে। দ্বিতীয় বিপদ এই যে, তোমার দৃষ্টান্ত দর্শন ক'রে আরো আরো স্থানে অপরাপর অনুজনেরা নিজ নিজ গুরুজনদের

উপদেশ-দান কৰ্ত্তে সোৎসাহে লেগে যাবে, কারণ, জগতে কুদৃষ্টান্ত সুদৃষ্টান্ত উভয়েরই সংক্রামকতা অতি অসাধারণ। তৃতীয় বিপদ হচ্ছে এই যে, অবিবেকী গুরুজনেরা হিতকথায় চটে যাবেন এবং একটি অনর্থের স্থলে দশটী অনর্থ উৎপাদন ক'রে তোমার সাধন-জীবনের শান্তি নাশ কর্ব্বেন। আর তাঁরা যদি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবেক-প্রবুদ্ধ হনও, তবু ভিতরে অবিবেকের প্রাচুর্য্য-হেতু হিতকথাকে হিতজনক জেনেও নিজেদের আত্ম-সম্মান ও মান-মর্য্যাদায় আঘাত পড়্‌ল জ্ঞান ক'রে অতিশয় অবাঞ্ছিত ও বিরক্তিকর ব্যবহার কর্ব্বেন। ফলে তোমার চেষ্টার সুফল কিছুই হবে না।

অবিবেকী গুরুজনদের বিবেক প্রবোধিত করার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুতরাং অবিবেকী গুরুজনদের বিবেককে প্রবোধিত করার ভার অন্যের উপরে ন্যস্ত ক'রে নিজেরা আড়ালে থেকে মাত্র যোগাযোগটুকু সম্পাদন কর্ব্বে। যাঁরা নিঃসন্দেহে তোমার অবিবেকী পিতামাতার চেয়ে নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ, এমন লোক ছাড়া অন্যের হিতোপদেশ তাঁরা কাণে তুল্‌বেন না,—এটা সংসারী লোকের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। যাঁদের নিজের অন্তর বিবেকের বিমল কিরণে উদ্ভাসিত নয়, এমন অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির উপদেশে অপরের চক্ষুরুন্মীলন অসম্ভব, এই কথাটাও স্মরণে

রাখ্‌তে হবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রবোধিত বিবেক এই দুই বস্তুর যুগপৎ-অধিকারী ব্যক্তির সাথে যাতে তোমার অবিবেকী গুরুজনদের ঘন ঘন সমাগম ঘ'টে যেতে পারে, তার ফিকিরে থাক্‌বে। তোমারই চেষ্টা বা উদ্যমের ফলে যে এসব আকস্মিক দর্শন, কথোপকথন বা ভাববিনিময় ঘট্‌ছে, এই কথাটুকু সযত্নে গোপন থাকাই বাঞ্ছনীয়। উভয় পক্ষের মধ্যে বারংবার দর্শনাদির ফলে প্রাণের এক স্বাভাবিক প্রীতি সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার কর্ত্তব্য হবে নেপথ্যে অবস্থান।

ধর্ম্মদ্বেষী ও ধর্ম্মধ্বজী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার গুরুজনেরা যদি হন ধর্ম্মদ্বেষী, তা' হ'লে প্রেমময় ব্যবহারের দ্বারা ধর্ম্মের মধুময় পন্থায় তাঁদের টেনে আনা যে-কোনও সৎপুরুষের পক্ষে খুব কঠিন হবে না। সময়-সাপেক্ষ হ'তে পারে, কিন্তু অসম্ভব হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি হন ধর্ম্মধ্বজী, তবে বড়ই মুস্কিলের কথা। ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিকেরা প্রায়ই যুক্তিবাদী, সদ্‌যুক্তি দেখ্‌লে বিরুদ্ধ পক্ষের কথা মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে ক্লেশকর হ'লেও তাঁরা তা' মেনে নেন এবং সামান্য মত-পরিবর্ত্তনের এই অস্পষ্ট আলোকেই নিজেদের সকল বদ্ধমূল পূর্ব্ব-ধারণাকে বারংবার নূতন ক'রে বিচার ক'রে দেখ্‌তে চেষ্টিত হন। কিন্তু ধর্ম্মধ্বজীদের আচরণ অন্য প্রকারের। তাঁরা জেগে ঘুমান, এজন্য তাঁদের ঘুম কেউ ভাঙ্গাতে পারে না। না ম'রেও যাঁরা

মৃতের ভাণ করেন, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবন-মন্ত্রও তাঁদের নবজীবন দান কত্তে পারে না।

ধর্ম্মধ্বজিতার লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মধ্বজীদের লক্ষণ কি? নিজেরা ধর্ম্মকে মানবেন না, কিন্তু ধার্ম্মিকের খ্যাতিটুকু সর্ব্বাঙ্গে মেখে রাখবার জন্য শত চেষ্টা কর্ব্বেন,—এইটীই হচ্ছে ধর্ম্মধ্বজিতার লক্ষণ। ঈশ্বর নাই, এইটী হচ্ছে তাঁদের অন্তরের কথা, কিন্তু কেউ নাস্তিক বল্লে সগৌরবে সেই সংজ্ঞা বহন কত্তে তাঁরা অক্ষম,—লোকে তাঁদের ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক মনে করুন, এইটীই হচ্ছে কামনা। ধর্ম্মধ্বজিতার অপর লক্ষণ এই যে, অকারণে অযথা অপরের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথের উপরে কটূক্তি বর্ষণে, দোষখ্যাপনে ও আক্রমণে নিত্যকাল পরমোৎসাহ, কিন্তু নিজ মত ও পথের সম্পর্কে অপরে যুক্তিসঙ্গত মাৎসর্য্যবিহীন সমালোচনা কর্ল্লেও তাকে ক্ষমা কত্তে অক্ষম হওয়া। এইরূপ ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিদের যদি গুরুজন-রূপে পাওয়ার তোমার দুর্ভাগ্য ঘ'টে থাকে, তবে তাঁদের সংসর্গ বর্জ্জন ক'রে চ'লে নিজের সাধননিষ্ঠাকে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য,—তার ফলে বৈষয়িক দুর্ভাগ্য বা নির্য্যাতন যতই হোক্।

তীর্থাদি-ভ্রমণের উদ্দেশ্য

একজন প্রশ্ন করিলেন,—তীর্থাদি-গমনের উদ্দেশ্য কি?

রাখ্‌তে হবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রবোধিত বিবেক এই দুই বস্তুর যুগপৎ-অধিকারী ব্যক্তির সাথে যাতে তোমার অবিবেকী গুরুজনদের ঘন ঘন সমাগম ঘ'টে যেতে পারে, তার ফিকিরে থাক্‌বে। তোমারই চেষ্টা বা উদ্যমের ফলে যে এসব আকস্মিক দর্শন, কথোপকথন বা ভাববিনিময় ঘট্‌ছে, এই কথাটুকু সযত্নে গোপন থাকাই বাঞ্ছনীয়। উভয় পক্ষের মধ্যে বারংবার দর্শনাদির ফলে প্রাণের এক স্বাভাবিক প্রীতি সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার কর্ত্তব্য হবে নেপথ্যে অবস্থান।

ধর্ম্মদ্বেষী ও ধর্ম্মধ্বজী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার গুরুজনেরা যদি হন ধর্ম্মদ্বেষী, তা' হ'লে প্রেমময় ব্যবহারের দ্বারা ধর্ম্মের মধুময় পন্থায় তাঁদের টেনে আনা যে-কোনও সৎপুরুষের পক্ষে খুব কঠিন হবে না। সময়-সাপেক্ষ হ'তে পারে, কিন্তু অসম্ভব হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি হন ধর্ম্মধ্বজী, তবে বড়ই মুস্কিলের কথা। ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিকেরা প্রায়ই যুক্তিবাদী, সদ্‌যুক্তি দেখ্‌লে বিরুদ্ধ পক্ষের কথা মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে ক্লেশকর হ'লেও তাঁরা তা' মেনে নেন এবং সামান্য মত-পরিবর্ত্তনের এই অস্পষ্ট আলোকেই নিজেদের সকল বদ্ধমূল পূর্ব্ব-ধারণাকে বারংবার নূতন ক'রে বিচার ক'রে দেখ্‌তে চেষ্টিত হন। কিন্তু ধর্ম্মধ্বজীদের আচরণ অন্য প্রকারের। তাঁরা জেগে ঘুমান, এজন্য তাঁদের ঘুম কেউ ভাঙ্গাতে পারে না। না ম'রেও যাঁরা

মৃতের ভাণ করেন, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবন-মন্ত্রও তাঁদের নবজীবন দান কত্তে পারে না।

ধর্ম্মধ্বজিতার লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মধ্বজীদের লক্ষণ কি? নিজেরা ধর্ম্মকে মানবেন না, কিন্তু ধার্ম্মিকের খ্যাতিটুকু সর্ব্বাঙ্গে মেখে রাখবার জন্য শত চেষ্টা কর্ব্বেন,—এইটাই হচ্ছে ধর্ম্মধ্বজিতার লক্ষণ। ঈশ্বর নাই, এইটা হচ্ছে তাঁদের অন্তরের কথা, কিন্তু কেউ নাস্তিক বল্লে সগৌরবে সেই সংজ্ঞা বহন কত্তে তাঁরা অক্ষম,—লোকে তাঁদের ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক মনে করুন, এইটাই হচ্ছে কামনা। ধর্ম্মধ্বজিতার অপর লক্ষণ এই যে, অকারণে অযথা অপরের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথের উপরে কটূক্তি বর্ষণে, দোষখ্যাপনে ও আক্রমণে নিত্যকাল পরমোৎসাহ, কিন্তু নিজ মত ও পথের সম্পর্কে অপরে যুক্তিসঙ্গত মাৎসর্য্যবিহীন সমালোচনা কর্ল্লেও তাকে ক্ষমা কত্তে অক্ষম হওয়া। এইরূপ ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিদের যদি গুরুজন-রূপে পাওয়ার তোমার দুর্ভাগ্য ঘ'টে থাকে, তবে তাঁদের সংসর্গ বর্জ্জন ক'রে চ'লে নিজের সাধননিষ্ঠাকে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য,—তার ফলে বৈষয়িক দুর্ভাগ্য বা নির্য্যাতন যতই হোক্।

তীর্থাদি-ভ্রমণের উদ্দেশ্য

একজন প্রশ্ন করিলেন,—তীর্থাদি-গমনের উদ্দেশ্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারের বিষয়-বিষ-জর্জ্জরিত কুটিল আবহাওয়াতে মানুষের সাধন-রুচি নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই সৎসঙ্গে সাধু সমাগমে মহৎস্মরণে সংসার-বিষের জারণ ক'রে নিয়ে তাকে অমৃতে পরিণত করার জন্যই তীর্থবাসের প্রয়োজন। মাঝে মাঝে কিছুকালের জন্যও যদি কেহ ভয়পূর্ণ ভোগের আলয়কে দূরে রেখে, অনিত্য বিত্ত-বেসাত, গৃহ-পরিজন পরিহার ক'রে আসক্তির ফাঁদ থেকে পরিত্রাণ নিয়ে সাধু-সমাগমে সাধু-মহাজনের তপস্যা-স্থানে নিশ্চিন্তে নির্ভরশীল মন নিয়ে বাস করে, তবে তাতে অন্তরের বহুকাল-সঞ্চিত ক্লেদরাশি দূর হ'য়ে গিয়ে চিত্ত নির্ম্মল, নিষ্কলুষ ও স্বচ্ছ হয়। এই জন্যই তীর্থাদি-গমন প্রয়োজন ব'লে অনুশাসন হয়েছে।

তীর্থ কাহাকে বলে

প্রশ্ন হইল,—তীর্থ কাকে বলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারের সহস্র পাপ থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য যেই পবিত্র স্থানে অবস্থান হিতকর, সেই স্থানই তীর্থ। তৃ ধাতু থক্ প্রত্যয় ক'রে তীর্থ শব্দের উৎপত্তি হ'য়েছে। বিষয়-বিরাগী ভগবৎ-প্রেমিক, নিষ্কাম, নিষ্কিঞ্চন, ভগবৎকৃপামাত্র-সম্বল, সর্ব্বজীবশুভকামী, অভয়-প্রাপ্ত ও অভয় দাতা মহাপুরুষদের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত প্রত্যেকটী স্থানই এই কারণে তীর্থস্থলাভিসিক্ত হ'য়ে থাকে। যে স্থানের অতীত ঐতিহ্য কারো স্মৃতিপথে জগরূক নেই, পরন্তু গমনমাত্র চিত্তে

সত্য, সরলতা, সন্তোষ, মনঃশুদ্ধি প্রভৃতি পবিত্র বৃত্তির সমুদয় হয়, বিস্মৃত অতীতে কোন না কোন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ নিজ তপস্যায় সিদ্ধি অর্জ্জন করেছেন জ্ঞান ক'রে সেই সকল স্থানকেও তীর্থের মর্য্যাদা প্রদান করা উচিত। সাধু ব্যক্তিদের অন্তরের পবিত্র চিন্তা, জ্ঞান, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য প্রভৃতি এবং তাঁদের অনুষ্ঠিত তপ, দান, পুণ্য প্রভৃতিকে জান্‌বে মানস-তীর্থ। এই সব তীর্থে মনে মনে গমন করা যায় এবং তাতে সংসারের সহস্র আসক্তির বন্ধন উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আর নির্ম্মলচিত্ত, মাৎসর্য্য-বজ্জিত, নির্লোভ-হৃদয়, পরহিতব্রত, সর্ব্বজীবের কুশলচিন্তক যতি, ভগবদ্‌ভক্ত বা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে জান্‌বে জঙ্গম তীর্থ। এই তীর্থ একস্থানে অচল নয়, পরন্তু এঁরা জীবের কুশলের জন্য জনপদ হ'তে জনপদে, পর্ব্বত হ'তে প্রান্তরে, বন হ'তে নগরে ভ্রমণ ক'রে সাধারণের অন্তরে, কামনা-বাসনার বন্ধন হ'তে, উচ্ছৃঙ্খলতার দাসত্ব হ'তে উত্তরণ করার আকাঙ্ক্ষার আগুন নিরন্তর জ্বালিয়ে দেন।

ভিন্ন সম্প্রদায়ের তীর্থ দর্শন উচিত কিনা

প্রশ্ন হইল,—এক এক তীর্থে এক এক দেবতার পূজার প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু সাধকমাত্রেই মাত্র একটী দেবতার পূজক বা সাধক। এমতাবস্থায় সকল তীর্থে কি সকলের ভ্রমণ লাভজনক?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অর্থাৎ তুমি জিজ্ঞাসা কচ্ছ যে, বৈষ্ণবের তীর্থে শাক্তরা এবং শাক্তদের তীর্থে বৈষ্ণবেরা ভ্রমণ কর্ব্বেন কি না? অথবা হিন্দুদের তীর্থে বৌদ্ধেরা, বৌদ্ধদের তীর্থে জৈনেরা ভ্রমণ কর্ব্বেন কি না? অথবা একজন হিন্দু মক্কা বা জেরুজালেমে তীর্থ-যাত্রার উদ্দেশ্যে যেতে পারেন কিনা? কেমন এইত?

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি যদি কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মাতাম, তাহ'লে তোমার সাধননিষ্ঠা টুট্‌বে এই ভয়ে নিশ্চয়ই আমার মুখের জবাব হ'ত,—"না"। কিন্তু স্বকীয় সাধনে নিষ্ঠাচ্যুতির ভয়ে একমাত্র নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম্মকে দেখবার ও বিচার করার সেই পুরাতন দিন চ'লে গেছে। ধর্ম্মকে জগতের কত ব্যক্তি, কত সম্প্রদায় কিভাবে এবং কতভাবে দেখেছেন, তা' বিচার করা সত্ত্বেও নিজের মতে ও নিজের পথে দৃঢ় নিষ্ঠা নিয়ে লেগে থাকার যুগ এসেছে। এই যুগে আমার জবাব হবে "হাঁ"। বৈষ্ণবেরা শাক্ত বা শৈবের তীর্থে যেতে পারেন, কোনো ক্ষতি নেই, কেন না, নিজ ইষ্টের চিন্তা বিস্মৃত হ'য়ে যাওয়া তাঁর অভিপ্রেত হবে না। তাঁর অভিপ্রেত হবে, শৈবেরা ও শাক্তেরা একদা কি ভাবে নিজেদের ইষ্টে একান্ত ভাবে লগ্ন হ'য়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ ক'রে ততোধিক বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিষ্ঠা নিয়ে নিজের ইষ্টে লগ্ন হবার দৃঢ় সঙ্কল্প অর্জ্জন করা। একদা একথা

তারস্বরে ঘোষণা করা হ'য়েছিল যে, হাতীতে তাড়া কর্‌লেও জৈন-মন্দিরে যাবে না, কিন্তু সে কথা এযুগে অচল। আমি বল্‌ব,—ভক্তিপ্রণত-শিরে জৈন-মন্দিরে যাও, আর চব্বিশজন তীর্থঙ্কর কি ভাবে কঠোর সাধনা ক'রে সত্যকে প্রত্যক্ষ ক'রে জগৎ-শ্লাঘ্য অমৃতরস আস্বাদন ক'রেছিলেন, সেই কথা স্মরণ ক'রে নিজে ততোধিক তপস্যার জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্প সঞ্চয় কর। একদা একথা শাস্ত্র-বচনের অঙ্গীভূত ক'রে বড় গলায় প্রচার করা হয়েছিল যে, গোলোক বৈকুণ্ঠে সবাই চলে গেলে যম রাজার আর চাকুরী থাকে না দেখে বিষ্ণু স্বয়ং ছলনাময় বুদ্ধশরীর গ্রহণ ক'রে জন-সাধারণকে অপধর্ম্মের শিক্ষা দিয়ে বিপথে চালিয়েছিলেন, সুতরাং বৌদ্ধ-বিহারের ছায়াস্পর্শও দোষের। কিন্তু আমি বল্‌ব,—যাও বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমমূলে যেখানে শ্রীবুদ্ধ সঙ্কল্প ক'রে বসেছিলেন,—'এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হোক্, অস্থি, মাংস, ত্বক্ প্রলয় প্রাপ্ত হোক, তবু বোধি অর্জ্জন না ক'রে আমি উঠ্‌ব না,'—যাও বেণুবনে, যাও জেতবনে, যাও মূলগন্ধ-কুটীতে, যেখানে ব'সে দীর্ঘায়ু বুদ্ধদেব বছরের পর বছর অন্য ধর্ম্মে দ্বেষহীন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও আত্মশোধনের সৎ শিক্ষা লক্ষ লক্ষ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে প্রদান ক'রে অমরত্বের পথ দেখিয়েছিলেন,—এবং শ্রীবুদ্ধের চেয়েও বৃহত্তর সঙ্কল্পের শক্তি, মহত্তর তপস্যার শক্তি, ব্যাপকতর জীবহিতের বুদ্ধি নিজ অন্তরে পরিপোষণের আকাশস্পর্দ্ধী আকাঙ্ক্ষা কর। মক্কায় গিয়ে দেখে এস, কি সেই শিক্ষা, যার

গুণে স্বদেশ-বিদেশ বিস্মৃত হ'য়ে ভিন্ন ভিন্ন বংশবাহী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণধারী, ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী, সামঞ্জস্যহীন সভ্যতাসমূহের সন্তানেরা একজন মাত্র হজরত মহম্মদের আজানের শব্দে আর কল্‌মার মহিমায় এক অবিচ্ছিন্ন এবং তুলনাহীন ধর্ম্মভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হ'য়ে যেতে পারলেন। সেই আজানের মর্ম্মকথাকে, সেই কল্‌মার প্রকৃত রহস্যকে নিজের সাধন ও নিজের ভজনের অপ্রতিকূল ভাবে বুঝে পুনরায় ঘরে ফিরে এস। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি কংস-কারাগার যদি হ'য়ে থাকে তোমার নিকটে শিক্ষার আকর, তা' হ'লে তোমার স্বকীয় সাধনের অপ্রতিকূল ভাবে যীশুর জন্মভূমি বিথেলহামের ঘোড়ার আস্তাবলকেও শিক্ষার আকর-রূপে তুমি গ্রহণ কত্তে সমর্থ হও।

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির তীর্থ-ভ্রমণ

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে তীর্থাদি ভ্রমণের প্রয়োজন কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনও স্থান ভূমির অদ্ভুত প্রভাবে, কোনও স্থান জলের আশ্চর্য্য তেজে, কোনও স্থান আবহাওয়ার বিশেষত্বে, কোনও স্থান ঐতিহাসিক কোনও সাত্ত্বিক ঘটনার সংশ্রবে, কোনও স্থান নদ-গিরি-কাননের এমন সমাবেশের ফলে, যাতে স্বতঃই ঐশ্বরিক ভাবের স্বাভাবিক প্রস্ফুরণ হয়, কোনও

স্থান বা ঋষি-মুনি-তপস্বীদের তপশ্চর্য্যার ক্ষেত্র ব'লে তীর্থের প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধারণ অসাত্ত্বিক লোক দেশ বেড়াতে যায়, ফিরে এসে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তার গাল-গল্প ক'রে আসর জমায়। কিন্তু নিত্যনিরঞ্জন পরমেশ্বরের অত্যদ্ভুত লীলাকেই যে অন্তরে অস্বাদন করা এসব দেখ্‌তে যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ও আদর্শ, এই কথাকে দৃষ্টান্তরূপে স্থাপনের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীধাম দর্শন, শ্রীগৌরাঙ্গের নীলাচল গমন প্রভৃতি প্রয়োজন! নতুবা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজেরাই ত' জগতে অতুলনীয় সচল তীর্থ স্বরূপ।

তীর্থের ধ্বংস নাই

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—রাজাদেশ, বিপ্লব বা দৈব-ঘটনায় যদি সব তীর্থ লুপ্ত করা হয়, তাহ'লে তার ফল কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের শান্তিলিপ্সু, সৎসঙ্গলিপ্সু মন পুনরায় নূতন নূতন মহাপুরুষ, নূতন নূতন জ্ঞানাবতার, নূতন নূতন যুগ প্রবর্ত্তককে অবলম্বন ক'রে নূতন নূতন তীর্থ, নূতন নূতন উৎসবদিবস, নূতন নূতন প্রেরণার উৎস সৃষ্টি ক'রে নেবে। যে যতই চেষ্টা করুক, তীর্থের ধ্বংস সম্ভব হবে না। কামানের গোলায় মানুষের বংশ উজাড় করা যায়, কিন্তু মানব-মনের ভজন-মুখিনী বৃত্তিকে নাশ করা যায় না। বিষ-বাষ্পে প্রাণীর চেতনা হরণ করা যায়, কিন্তু সিদ্ধ সাধকের চিন্তার শক্তিকে সম্মোহিত করা যায় না।

দেবে, দ্বিজে ও তীর্থে বিশ্বাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভজনশীল মানবের দেবে, দ্বিজে ও তীর্থে বিশ্বাস হচ্ছে সাধন-পথের পাথেয়-স্বরূপ। এই তিনটীতে বিশ্বাসের দরুণই সে বারংবার সাধন-পথে সংশয়-সন্দেহের সঙ্কট থেকে ত্রাণ পায়। কেউ হয়ত একটী দেবে বিশ্বাস করে, কেউ হয়ত শত শত দেবের অস্তিত্ব আছে ব'লে মনে করে। কেউ হয়ত সহস্র কোটী দেবতাকে একটী পরম দেবতারই বিকাশ বা বিভিন্ন মূর্ত্তি ব'লে জ্ঞান করে, কেউ হয়ত বিশ্বদেবের নিজস্বতাই তাঁর একমাত্র স্বরূপ বা মূর্ত্তি ব'লে নিষ্ঠা রাখে। পরমদৈবত সম্পর্কে যার ধারণা যেমনই হোক, কিন্তু তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস নিয়েই সকলের সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু সাধনের পন্থা জানা কঠিন, পন্থা খুঁজে নিজে নিজে বের করা কঠিন। তাই দেবদর্শী অর্থাৎ ভগবদ্দর্শী, সত্যদর্শী ঋষির জীবনের সাধনাকে খুঁজে বের করার প্রবৃত্তি জন্মে। এই থেকে আসে দ্বিজে বিশ্বাস। দ্বিজ বল্‌তে শুধু মিশ্র, পাণ্ডে, দোবে, আচারী আর গাঙ্গুলীর ছেলেকেই মনে ক'রো না, দ্বিজ বল্‌তে ব্রহ্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, সত্য-সাগরের পরপারদর্শী মহৎ ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝ্‌তে হবে। জন্ম দ্বারা যিনি গোড়ায় শূদ্র ছিলেন কিন্তু কর্ম্ম, সাধনা তপস্যা এবং চিত্তশুদ্ধির পরম সংস্কারের বলে যিনি দ্বিতীয়বার ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, দ্বিজ বল্‌তে তাঁকেই বুঝতে

হবে। তিনি ভারতে বা পেরুতে, তুরস্কে বা হনলুলুতে, মাল্টায় বা জ্যামেকায় জন্মগ্রহণ কত্তে পারেন। তিনি ঋষির বংশে বা মুচির বংশে, সতী-সাবিত্রীর গর্ভে বা গণিকার গর্ভে জন্ম নিতে পারেন। তিনি কৃষ্ণকায় বা শ্বেতাঙ্গ, পীতবর্ণ বা রক্তবপু হ'তে পারেন। তিনি আমিষাশী, বা মাংসভোজী, বাতাহারী বা ফলাহারী, অন্নাশন বা জলাশন হ'তে পারেন। তিনি নারী কিম্বা পুরুষ, বালক কিম্বা বৃদ্ধ, অন্ধ কিম্বা খঞ্জ, রাজা কিম্বা ভিক্ষুক হ'তে পারেন। কিন্তু নির্ম্মল ব্রহ্মজ্যোতি যাঁর অন্তর-প্রদেশ উদ্ভাসিত ক'রেছে, তিনিই দ্বিজ এবং এই দ্বিজে বিশ্বাসহেতু ভজনশীল ব্যক্তির পক্ষে সাধন-পন্থা লাভ সহজ হয়। কিন্তু দ্বিজ-মুনি-তাপসদের দ্বারা নিষেবিত স্থান নিজ মাহাত্ম্য-হেতু গৃহীত সাধন-পন্থার প্রতি বারংবার নিষ্ঠাশীল দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ভজনেচ্ছু মানবের ভজন-রতি বর্দ্ধিত করে। এইজন্য তীর্থে বিশ্বাস তার অবশ্যম্ভাবী। জগতে যতকাল ভজন থাক্‌বে, সাধন থাক্‌বে, ততকাল ভজনশীল সাধনশীল মানব কোনো না কোনো রূপান্তরে দেব, দ্বিজ ও তীর্থ এই তিন বস্তুতে নিজের বিশ্বাসকে ন্যস্ত কর্ব্বেই কর্ব্বে। এক দেবতার অর্চ্চনা অন্তর্হিত হবে ত' অপর দেবতার অর্চ্চনা প্রচারিত হবে, দেব-সম্বন্ধীয় এক ধারণার বিপর্য্যয় ঘট্‌বে ত' অপর ধারণার ভিতর দিয়ে মানবের দার্শনিক প্রবণতা পুনরায় দেব-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ক'রে নেবে। এক ঋষিকে, এক দ্রষ্টাকে সমগ্র পৃথিবী জোর ক'রে বয়কট ক'রে দেবে ত' সঙ্গে সঙ্গে

অপর ঋষি এসে লোকের হৃদয়াসন অধিকার ক'রে নেবেন। এক তীর্থকে অত্যাচারের শক্তিতে বা বিরুদ্ধ শিক্ষার প্রভাবে বন্ধ ক'রে দেবে, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে আর এক তীর্থের উদ্ভব হবে। কেননা, মানবের মনে শান্তির অমিয় সিঞ্চনের জন্য এই তিনটীর প্রয়োজন চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবে।

দেব, দ্বিজ, তীর্থ লইয়া অনাচার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি অবশ্য বলছি না যে, মানব-মনের সহজাত দেব-বোধকে নিয়ে পুরুতের দল নিজেদের চাল-কলার বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হ'য়ে প্রচুর চালাকি করে নি। আমি একথাও বল্‌তে পার্‌ব না যে, সত্যদর্শী ঋষির প্রতি ভজনমুখ জীবের যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধা, তা' নিয়ে দোকানদারী হয় নি। আমি একথাও বল্‌তে অশক্ত যে, তীর্থের নাম ক'রে একদল লোক হাজার হাজার বছর ধ'রে সরল-বিশ্বাসী অসংখ্য নর-নারীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে বংশানুক্রমিক গুণ্ডামির অনুশীলন করে নি। কিন্তু এত সব স্বীকার ক'রেও আমাকে বল্‌তে হচ্ছে যে, এই তিনটী বস্তু চিরকালই, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সমাজেই, কোনও না কোনও রূপ নিয়ে থাকবেই। এমন কি যে দেশে ঈশ্বরের কোনো স্বীকৃতিই নেই, তেমন দেশেও রাষ্ট্রনীতির দেবতা, রাষ্ট্রনীতির দ্বিজ, রাষ্ট্রনীতির তীর্থ পূজিত হবে।

গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখ, শিক্ষা ও কর্ত্তব্য

জনৈক বিবাহিত ও উন্নতি-লিপ্সু উচ্চাকাঙ্ক্ষ যুবক বলিলেন,—বিবাহিত জীবনটা সুখের ব'লে আমার আদৌ মনে হচ্ছে না। পদে পদে বাধা-বিঘ্নে আমি হতাশ হ'য়ে পড়েছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বাবা, এই যে পায়ে পায়ে বাধা পাচ্ছ, তা' থেকে জীবনের অনেক শিক্ষাও লাভ কচ্ছ। মনে ক'রো না তোমার মঙ্গল-অমঙ্গল দিয়েই তোমার জীবনের সব সার্থকতা লাভ হ'ল। তোমার জীবনের ভাল-মন্দগুলির ফল গিয়ে আরও শত শত মানব-মানবীকে কল্যাণবন্ত কর্ব্বে, তবে না সার্থক জীবন! যে দুঃখ পাচ্ছ, তাকে যদি তুমি বীরের মত গ্রহণ কত্তে পার, দুঃখ-বেদনাকে কুলিশ-কঠোর পাষাণ হৃদয় কোমল করার সহায়ক বা সুযোগ জ্ঞান ক'রে সকল আকুলতা নিয়ে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে ঢেলে দিতে পার, দেখতে পাবে, তোমার একার দুঃখ-ই কত জীবের চির-দুঃখ-মুক্তির কারণ-স্বরূপ হয়েছে। একাই যখন নিজের জন্য দুঃখ ভোগ কর, তখন সেই দুঃখ প্রকৃতই অসহনীয়। কিন্তু যখন তোমার একার দুঃখে অনেকের দুঃখ বিদূরণের উপায় হবে, তখন আত্মপ্রসাদ এসে বেদনার স্থানটা দখল ক'রে নেবে, তখন দুঃখ আর দুঃখ থাক্‌বে না। গৃহীদের যে দুঃখের অবধি নেই, সে কথা কেন বুঝব না?

বর্ত্তমান কালের বিবাহিত নরনারীদের মধ্যে শত-সহস্রে কয়জন সুখী? কতজন বিবাহের মধুতে তৃপ্ত? কয়জন সন্তুষ্ট? দেখ্‌লে মনে হয়, তাদের জীবনগুলি যেন শ্মশানের জ্বলন্ত এক একটা চুল্লী, তাদের প্রাণের কথা শুনলে বুঝা যায়, শুধু আর্ত্তনাদ, শুধু হাহাকার, শুধু বিড়ম্বনা, শুধু অশ্রুজলই বুঝি গৃহীর চরম অদৃষ্ট। বিবাহ করার পূর্ব্বে যে জীবনটাকে পরম লোভনীয় ব'লে জ্ঞান করেছিলে, আজ সেটা তোমার পক্ষে একটা মহাদুর্ঘটনা বা দৈব অভিসম্পাতের মতই হয়ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তোমাকে প্রতিকূল অবস্থাকে বুক পেতে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ কত্তে হবে, বীরের মত বল্‌তে হবে,—"হে দুঃখ, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার মনকে ভগবানের দিকে ঠেলে দিচ্ছ।" দুঃখ যখন ঘনিয়ে আস্‌বে, ব্যথায় অধীর চিত্তটাকে তুমি ভগবানের পায়ে সঁপে দিও। দেখ্‌বে বিরাট বিশাল অপরিমেয় দুঃখকে অবহেলে সইবার শক্তি আর অপরের পর্ব্বত-প্রমাণ পুঞ্জীভূত দুঃখকে অনায়াসে দূর কর্ব্বার শক্তি তুমি সঙ্গে সঙ্গে পাবে। আজ তুমি ভুলে যাও যে, তোমার নিজের সুখের জন্য তুমি গৃহী হ'য়েছিলে। গৃহী হোক্‌ আর সন্ন্যাসী হোক্‌, কোন অবস্থাতেই জীবনটা মানুষের নিজের নয়। সকল অবস্থাতেই প্রত্যেকের জীবন ভগবানের। সেই কথা ভুলে গিয়ে যদি নিজের সুখের লোভে তোমরা কেউ গৃহী হও বা নিজেরই জীবনটাকে গার্হস্থ্যের দুঃখ ও ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দেবার জন্য সন্ন্যাসী হও,—তবে সে স্বার্থপরতার

শাস্তি কোনো দিন পেতেই হবে। কিন্তু বাছা, যত ভুলই আগে ক'রে থাক না কেন, যে মুহূর্ত্তে তোমরা নিজেকে ভগবানের জন্য দিতে চেষ্টা কর্ব্বে, সেই মুহূর্ত্ত থেকে পূর্ব্বাপরাধের প্রায়শ্চিত্তটা পর্য্যন্ত তোমাদের কাছে মধুময় হ'য়ে যাবে।

যার কেহ নাই, আমি আছি তার

বেলা অনেক হইয়াছে। প্রায় সকলেই প্রস্থান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির চরণাশ্রিত পুরাতন ভক্ত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সরকার স্থানীয় কলেজে আই-এ ক্লাসে পড়েন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দুইটী নিরাশ্রয়া বিধবা মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবামণি দীক্ষাদান করিবেন কি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাদের কি বংশ-গুরুরা কেউ নেই?

রাসবিহারী বলিলেন,—কারো কুলগুরুরা হীনজীবিকা নিয়ে আছেন, কারো কুলগুরুরা অতিরিক্ত অর্থলিপ্সু। ফলে একজনের হয় না দীক্ষা নিতে সেখানে বিন্দুমাত্র ভক্তি, আর একজন আর্থিক অত্যাচার সহ্য কত্তে অক্ষম।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তবে নিয়ে এস। "যার কেহ নাই, আমি আছি তার"।

ইংরেজের পাঁচটা

অপরাহ্ণে টাউন-হলে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। নির্দ্ধারিত

সময়ের এক ঘণ্টা আগেই হল পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মিনিট দশেক আগে শ্রীশ্রীবাবামণি কৃষি-কর্ম্মচারি শ্রীযুক্ত যামিনী বাবু সহ টাউন-হলের দিকে পদব্রজে রওনা হইলেন। টাউন-হলের সম্মুখে আসিয়া রাস্তার উপরে ভিড় দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি যামিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, টাউন-হলে এখন অন্য কোনও অনুষ্ঠান চলিতেছে নাকি?

যামিনীবাবু হাসিয়া বলিলেন,—আজ্ঞে না, আজকের এই অনুষ্ঠান আপনাকে নিয়েই। কাল্‌কে এখানকার লোকে স্পষ্ট অনুভব করেছেন যে, বাঙ্গালীর পাঁচটা কাকে বলে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইংরেজের পাঁচটা ত' হ'ল চারটা বেজে তারপরে আরো ষাট মিনিট পরে। বাঙ্গালীর পাঁচটা কি তা' হ'লে পাঁচটা বাজার ত্রিশ মিনিট আগে?

যামিনী বাবু বলিলেন,—আজ্ঞে না। ত্রিশ মিনিট আগে নয়, একেবারে ষাট মিনিট আগে। আজ এখানে যে ভিড় হয়েছে, যাত্রা-থিয়েটারেও এরূপ ভিড় কদাচিৎ দেখা যায়।

ভিড় ঠেলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি মঞ্চে অগ্রসর হইলেন। ক্যাপ্টেন প্রফুল্ল গুপ্ত পথ করিয়া দিতে লাগিলেন। হবিগঞ্জে সাধু-ভক্ত গণের শীর্ষ-স্থানীয় "মহাভাগবত" শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার রায়, ভগবদ্-ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র কুমার চৌধুরী, প্রবীণ ধর্ম্মপ্রাণ উকিল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নাগ এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুমতিবালা নাগ, বৃন্দাবন

কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক সৈয়দ রমজান আলী সাহেব, উক্ত কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল, মহকুমার প্রথম মুন্সেফ, রামকৃষ্ণ আশ্রমের শ্রীমৎ গোপেশ্বরানন্দ স্বামী প্রভৃতিকে শ্রোতৃবর্গের প্রথম পংক্তিতে দেখা গেল। গতকল্য ছিল বালকের ও যুবকের সমাবেশ। আজ পক্ককেশ, শুভ্রশ্মশ্রু নগর-জ্যেষ্ঠেরা শ্রোতৃস্থান অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়াছেন। মনে হইল, যেন নৈমিষারণ্যের ধর্ম্ম-সম্মেলনে দেবর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষির দল সমবেত হইয়াছেন।

ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা

অগৌণে বক্তৃতারম্ভ হইল। তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া বাগ্মিতার যে মধুস্রোত বহিল, কে তাহার নোট রাখিয়াছে? মর্ম্ম মাত্র নিম্নে দিতেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা। ভারতবর্ষ তার জাতীয় প্রতিভার মধ্য দিয়েই নিজেকে পুনর্বিকশিত ক'রে তুলবে, ভারতের অভ্যুদয়ের বিশাল মন্দির ধর্ম্মের বনিয়াদের উপরেই নির্ম্মিত হবে। ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ কর্ব্বে না। ভারতবর্ষ ইউরোপ আমেরিকার উচ্ছিষ্ট সেবনকেই জীবনের চরম চরিতার্থতা ব'লে জ্ঞান কত্তে প্রস্তুত নয়। ভারতের নিজস্ব সত্তা আছে। কপিল, কণাদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, শাণ্ডিল্য, নারদ ও শুকদেব ভারতের মৃত্তিকায় তাঁদের হৃৎপিণ্ড থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত-মোক্ষণ ক'রে রেখে গিয়েছেন।

সেই তাজা রক্তের এক এক বিন্দু থেকে এক এক জন দিক্‌পাল পুরুষের—এক এক জন যুগন্ধর মানবের—এক এক জন ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব হবে এবং তাঁদের আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে ভারত আবার তার পরিপূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার
জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে
চিত্ত আমার নয় ভীত।
জানি আমি পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যে
লভিবে ভারত লুপ্ত মান,
লভিবে বজ্র-বীর্য্য শৌর্য্য,
কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে
জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ, মহৎ, সু-বৃহৎ।

শ্রীশ্রীবাবামণি সভাস্থলে মাত্র এইটুকুই আবৃত্তি করিলেন। কিন্তু তাঁহার রচিত সম্পূর্ণ কবিতাটী এখানে উদ্ধার না করিয়া পারিতেছি না।

গভীর পঙ্কে আবদ্ধ যার
ডুবিয়া সপ্ত শতাব্দী
ম্রিয়মাণ ছিল জীবন-চেতনা—
শুষ্ক, শীর্ণ প্রেমাব্ধি;
নিজের মাঝারে বিশ্ব-জগৎ,
বিশ্ব-জগতে আপনারে,
—চক্ষু থাকিতে অন্ধ,—তাই ত'
দেখিয়াও দেখা গেলনা রে;
কেবল আত্ম-বঞ্চনা-নীতি
নিজেরে বাঁধিল শৃঙ্খলে;
দাস, ক্রীতদাস বংশানুক্রমে
বাড়িল কেবল দলে দলে।
তাহারি মাঝারে লুকাইয়াছিল
ঋষির সাধনা সুজাগ্রৎ,
আবার ভারতে নূতন রীতিতে
দেখাতে মুক্ত শুদ্ধ পথ।

বর্ষ দ্বিশত প্রতীচীর যত
বিলাস মদিরা করিয়া পান
হইল বিফল সংযম-বল,
মত্ত চপল হইল প্রাণ,
লালসা-তাড়না জীবন-সাধনা,
স্বার্থ হইল জপ ও তপ,—

যে যেখানে আছ, সবে শুধু বাঁচ
করিতে স্বার্থ-মহোৎসব!
কঙ্কাল-সার, নিরন্ন আর
বিবস্ত্র নিঃসম্বলে
কর বঞ্চনা, শুধু প্রতারণা
ছলে বলে আর কৌশলে।
ইহাই বর্ত্তমানের চিত্র,
কিন্তু এ নহে শাশ্বত,
আবার ভারত লভিবে মূর্ত্তি
গৌরবময় অক্ষত।
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
অখিল বিশ্বে দেখাতে পথ,—
নির্ভর করে ভারতের 'পরে
নিখিল-বিশ্ব-ভবিষ্যৎ।

রণ-বাহিনীর বাজে জিঞ্জির
বিশ্বের প্রাণে সৃজিয়া ত্রাস,
বিশ্বের যারা শত্রু, তাহারা
চাহিছে বিশ্ব করিতে গ্রাস।
দিকে দিকে শুধু মিথ্যার মধু
মুক্ত হস্তে করিয়া দান
হিংসা-ঈর্ষ্যা-ঘৃণা-বিদ্বেষ
তরঙ্গ তুলি' খেলিছে বান

কে পারে কাহারে কত-কাল ধ'রে
পদানত করি' রাখিতে আজ,
শুধু তারি তরে রেষারেষি ক'রে
জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-সাজ;—
এর মাঝখানে ভারতের প্রাণে
জাগিবে সত্য বজ্রবৎ,
বান্‌চাল করি' মিথ্যার তরী,
দেখাতে নিত্য সত্য পথ।

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
ভয় নাই, ভয় নাই কোনো,
যে আছ যেখানে একান্ত প্রাণে
কাণ পেতে মোর কথা শোনো,—
সংযম-বলে হও বলীয়ান্,
সাধনার বলে হও মহীয়ান্,
নিজ নিজ হৃদি-ক্ষেত্রের মাঝে
ব্রহ্মনামের বীজ বোনো—
ক্ষুদ্র বটের বীজটীর মাঝে
মহা-মহীরুহ লুকাইয়া আছে;
সিঞ্চিবে বারি মহোৎসাহের,
ব্যর্থ হবে না একজনও।
বীর্য্যের বলে মহাকুতূহলে

আরোহণ করি' চিত্ত-রথ
করহ আপন ত্রিভূবন-জন
নেহারি' সবারে আত্মবৎ।
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,—
এ নহে মিথ্যা কল্পনা,
এ নহে রচিত অলীক কাহিনী,
বল্গা-বিহীন জল্পনা।
দিব্য নয়নে দেখেছি, ভারত
অতিক্রমিয়া মৃত্যু-পথ
ভৃঙ্গার ভরি' অমৃত বিতরি'
বিশ্বের হিতে নিত্য-সৎ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে
জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ মহৎ সু-বৃহৎ।

হবিগঞ্জ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৪১

গুরু-পরীক্ষা

সূর্য্যোদয়ের সামান্য পূর্ব্বে জন দশেক স্কুলের ছাত্র দীক্ষা গ্রহণের মানসে শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষা? এক বৎসর গুরু-পরীক্ষা কর। এক বৎসর আত্মপরীক্ষা কর। দীক্ষা হবে তার পরে।

যুবকেরা চলিয়া গেলেন।

হুজুগের দীক্ষা

ব্যাপারটী লক্ষ্য করিয়াছেন, এমন একজনে প্রশ্ন করিলেন,—যুবকদের ফিরাইয়া দিলেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হুজুগে দীক্ষা নিতে নেই।

কয়েকজন বড় বড় মহাপুরুষের নাম করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—কেন তাঁরা ত' নির্ব্বিচারে দলে দলে লোককে দীক্ষা দেন। একজনকেও ফিরিয়ে দিতে ত' শুনা যায় না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বড়লোকের অনুকরণ করা ভাল ব'লে কখনো কখনো আমিও সে রকম করি। কিন্তু আজকের ছেলেরা দীক্ষা নিতে আসে নি। যদিও আমি দীক্ষার বিষয়ে কখনো কিছু বলি না, তবু বক্তৃতা শুনে এদের মনে কৌতূহল হয়েছে যে, একবার দেখে আসি দীক্ষা জিনিষটা কি? যাই দেখা যাবে, দীক্ষাটা কি জিনিষ, অমনি তাদের সমগ্র উৎসাহ নিবে যাবে এবং সবাই পুনর্মূষিক হবে। অর্থাৎ এ দীক্ষায় দীক্ষা-দাতারই শক্তিক্ষয়, দীক্ষাপ্রাপ্তের কোনো লাভ নেই।

গুরু-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন হইল,—গুরু-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? গুরু যে সাধনের কথা বলে দেবেন, সেই মত চল্লেই ত' হল। গুরু ভাল না মন্দ, সাধক না অসাধক, সেই চিন্তা দিয়ে আমার দরকার কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেশ কথা। দীক্ষা নেবার পরে দীক্ষিতের মনে এই ভাবই থাকা দরকার। নইলে সাধনে দানা বাঁধে না, ভজনে জোর আসে না। কিন্তু আত্ম-পরীক্ষা ছাড়া ত' কারোই দীক্ষা নেওয়া উচিত নয়। গুরু-পরীক্ষার চেষ্টার ফলে আত্ম-পরীক্ষাই পাকা হয়। সোণা পরীক্ষা কত্তে গিয়ে নিকষ-পাষাণেরও নৈকষ্যের পরীক্ষা হয়। এইজন্যই গুরু-পরীক্ষা দরকার।

সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ

প্রশ্ন হইল,—সকল জাতিই কি আপনার নিকট দীক্ষা নিতে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার চক্ষে জাতি-বর্ণের ভেদ নেই। শাদা, কালো, লাল, নীল, সবুজ, হলদে, জরদ, পাটল সবই আমার চক্ষে একবর্ণ। "সর্ব্বে বর্ণা ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ।" সকল বর্ণ ব্রহ্ম থেকে জাত এবং সেই জন্য ব্রাহ্মণ।

মহিলাদের শৃঙ্খলা-জ্ঞান

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি টাউনহলে ধারাবাহিক সাত ঘণ্টা

কাল বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তার বলিবার উপযুক্ত বিষয় এবং শক্তি থাকিলে সাত ঘণ্টা কাল বিনা বিশ্রামে বলা হয়ত কঠিন নহে, কিন্তু শ্রোতারা এক বৈঠায় এত দীর্ঘকাল বক্তৃতা শুনিতে পারিবেন, এরূপ মানসিক ধৈর্য্য ও শারীরিক স্থৈর্য্য কম লোকেরই আছে। এইজন্য বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকা হইতে টাউন হলে একমাত্র মহিলাদের জন্য বক্তৃতা হইবে এবং সাতটা বাজিবামাত্র হল শূন্য করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের জন্য বক্তৃতা হইবে। মহিলাদের মধ্যে কেহ যদি পুরুষদের জন্য প্রদত্ত বক্তৃতাতে থাকিতে চাহেন, তবে এক পার্শ্বে তাঁহাদের জন্যও একটু পৃথক্ স্থান থাকিবে। হল যাহাতে সাতটা বাজিবামাত্র দুই তিন মিনিটের মধ্যে শূন্য করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের বসাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার ভার নিলেন সর্ব্বজনপ্রিয় এবং ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ক্যাপ্‌টেন প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত।

সকলেই বুঝিয়াছেন যে, জনতা সমাগত হউন আর না হউন, শ্রীশ্রীবাবামণি ঠিক ঘড়ি ধরিয়াই বক্তৃতা দিবেন। ক্যাপ্‌টেন গুপ্ত স্থানীয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের পরিচালিত বালিকা হাইস্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে ধরিলেন, বেলা তিনটায় স্কুল ছুটী দিতে হইবে। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অভারতীয় শ্বেতাঙ্গ মহিলা। তিনি বলিলেন,—"বাঙ্গালীর চারিটা ত'। বক্তা নিজেই হয়ত ছয়টায় সভাস্থলে আসিবেন।" ক্যাপ্‌টেন গুপ্ত বলিলেন,—"কোনো ইংরাজও স্বামীজীর মত সময়-নিষ্ঠ নন, একবার স্বয়ং

সভাস্থলে গেলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আপনারও নিমন্ত্রণ রহিল, জানিবেন।" প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বলিলেন,—"উত্তম, আমি অপরাপর শিক্ষয়িত্রীদের নিয়া নিশ্চয়ই যাইব, কিন্তু হবিগঞ্জের মহিলারা অনেকেই হয়ত সন্ধ্যা সাতটায় গিয়া সভাস্থলে উপনীতা হইবেন।" যাহা হউক, বালিকা-হাইস্কুল বেলা তিনটাতেই ছুটি হইল এবং বালিকা-বিদ্যালয়ের গাড়ীখানা ছাত্রীদিগকে সভাস্থলে পৌছাইয়া দিবার কাজে নিয়োজিত হইল।

এদিকে শ্বেতাঙ্গিনী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সভাস্থলে আসিয়া দেখেন,—বক্তা তাঁহার আগমনের তিন মিনিট পূর্ব্বেই ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বক্তৃতা সুরু করিয়াছেন, সমগ্র হল মহিলাদের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং গৃহে তিল ধারণের স্থান নাই বলিয়া প্রতীত হইতেছে। তাঁহাকে মন্তব্য করিতে হইল,—"নাঃ, বক্তা দেশ-পূজ্য ব্যক্তি, তিনি ত' সময়-নিষ্ঠ হইবেনই, কিন্তু সহরের মহিলারা যে এমন সময়-নিষ্ঠ, এটা তার চেয়েও আশ্চর্য্য ব্যাপার।"

মন্ত্রমুগ্ধা স্থাণুবৎ-অবস্থিতা মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি যে অপূর্ব্ব ভাষণ প্রদান করিলেন, তাহার কোনও নোট কেহ রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেইদিনই সভাভঙ্গের পরে রাত্রি বারোটায় বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার জনৈকা কুমারী ধর্ম্মকন্যার নিকটে যে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পাইতেছি,—"মহিলাদিগকে কি বলিলাম, তাহা সম্পূর্ণ লিখা এখন সম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ করিয়া কুমারীদিগকে আমি কয়েকটী কথা বলিয়াছি, যাহার

সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম তোমাকে শুনাইব। আমি বলিয়াছি, প্রত্যেক কুমারীর একথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, তাহাদের জীবনের একটা মূল্য আছে এবং সেই মূল্যটা নিতান্ত তুচ্ছ রকমের কিছু নহে। কোনও কুমারী যেন কখনও নিজেকে সস্তা বলিয়া মনে না করে এবং নিজের মর্য্যাদার হানিজনক কোনও কার্য্যকে কখনও সমর্থন না করে। আরও বলিয়াছি, কোনও কুমারীই যেন কাহারও নিকট হইতে গোপনে কোনও উপহার গ্রহণে সম্মতা না হয়, কোনও কুমারীই যেন গোপনে কাহারও আদর-সোহাগ কুড়াইতে চেষ্টা না করে। পুষ্প যেমন পাদস্পৃষ্ট হইলে আর দেবপূজায় লাগে না, কুমারী তেমন কাহারও নিকটে গোপনে আদর-সোহাগ পাইবার পরে কোনও মহৎ কার্য্যের যোগ্যা থাকে না। গোপনতার সুযোগ লইয়াই পবিত্রা কুমারীর জীবনে অপবিত্রতা স্বকীয় অধিকার স্থাপন করে, তার পুণ্যময় অন্তঃকরণে পাপের কৃতান্ত-দূত প্রবেশ করে। কুমারী-জীবনে গোপনতার স্থান নাই।"

অবিশ্রান্ত অনলস্রাবিণী বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি যখন তাঁহার ভ্রমণ-সঙ্গী ঘড়িটির পানে তাকাইলেন, তখন সাতটা বাজিতে মিনিট দুই আছে। বক্তৃতার শেষ বাক্যটী উচ্চারণ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি জননীগণের প্রতি নির্দ্দেশ দিলেন যেন তাঁহারা বিনা কোলাহলে তিন মিনিট সময়ের মধ্যে হল-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান পুরুষগণকে আসিয়া স্থান গ্রহণের সুযোগ দেন। মহিলারা প্রণামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন

করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি সকলকে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি নেপথ্য-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দারুণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উষ্ণতাহেতু ঘর্ম্মপ্রবাহে তাঁহার বহির্ব্বাস, কৌপীন প্রভৃতি ভিজাইয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতেছিল। তিনি ঘর্ম্মসিক্ত বস্ত্রগুলি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে ধাবিত হইতেছেন, এমন সময়ে স্থানীয় মিউনিসিপাল স্কুলের হেডমাষ্টার তাঁহার সম্মুখে এক গ্লাস সুশীতল পানীয় আনিয়া ধরিলেন। সকলেই জানিতেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণি চা পান করেন না। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এখন যদি কোনও পানীয় বস্তু গ্রহণ করি, তাহ'লে শ্রমরত কণ্ঠটী সঙ্গে সঙ্গে চাক্‌রীতে জবাব দেবে।

পুনরায় বক্তৃতারম্ভ হইল। এই তিন মিনিট সময়ের মধ্যে শিশু পুত্রকন্যাসহ হবিগঞ্জের এতগুলি মহিলা কি করিয়া নিঃশব্দে হল পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজপথে ও হলের বারান্দায় প্রতীক্ষমাণ শত শত পুরুষ-জনতা কি করিয়া বিনা কোলাহলে সমগ্র হলটীকে তিলধারণেরও অযোগ্য করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন, ইহা একটী যাদুমন্ত্রবলে সংঘটিত অনুষ্ঠানের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের ভার যাঁহারা নিয়াছিলেন, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের নেতা ক্যাপ্‌টেন গুপ্তের ইহাতে কৃতিত্ব স্বীকার্য্য, পুরুষ শ্রোতাদের কৃতিত্বও স্বীকার্য্য, কিন্তু মহিলাদের শৃঙ্খলা-জ্ঞান এবং কার্য্যকালে শৃঙ্খলার

পরিচয় দিবার শক্তি সর্ব্বোপরি স্বীকার্য্য। অবশ্য যাঁহার দৃষ্টান্তময় জীবনের প্রভাবসম্পন্ন উপস্থিতি এই সকল অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য হবিগঞ্জে প্রকটিত করিবার সহায়ক, তাঁহার সম্পর্কে এখানে আমরা নিজেদের মন্তব্য কিছুই দিতে চাহি না।

ক্যাপ্টেন পি. গুপ্ত

রাত্রি এগার ঘটিকায় বক্তৃতা সমাপ্ত হইল। ক্যাপ্‌টেন পি. গুপ্ত মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ-প্রসঙ্গে যাহা যাহা বলিলেন, তাহার অংশবিশেষ আমরা "সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে এখানে উদ্ধার করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

ক্যাপ্‌টেন গুপ্ত বলিলেন,—হবিগঞ্জ মহকুমা বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় বিপিন চন্দ্র পালের জন্মভূমি। বিপিন চন্দ্রের পরলোক গমনের পরে আর একজন সমকক্ষ বাগ্মীর আবির্ভাব হইল না বলিয়া অনেকে অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেন। আজ একথা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গজননীর সেই ব্যথা অপসারিত হইয়াছে। স্বামীজী রাজনীতি আলোচনা করেন না। রাজনীতি তাঁহার কর্ম্মপথের বাহিরে। তিনি যে মর্ম্মের ব্যথা লইয়া তপোবন ছাড়িয়া লোকালয়ে ছুটিয়া বাহির হইয়াছেন, তাহা বাংলা ও ভারতের যুবকবৃন্দকে মনুষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধকাম করিবে। জাতির সর্ব্ব-প্রকার দুঃখের দুঃখী, সকল দরদের দরদী এই মহাপুরুষ অনুভব করিয়াছেন যে,

দুঃখবিদূরণের মূল উৎস কোথায়। তাই তিনি অসংযম, দুর্নীতি, কদাচার, কদভ্যাস প্রভৃতিকে সমাজ-জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এমন কথা আমরা অনেকেই হয়ত আর শুনি নাই, এমন জোরালো ভাষা, এমন তেজস্বী উক্তি, এমন বজ্রগম্ভীর অথচ মধুর কণ্ঠ, এমন জড়তা-বর্জ্জিত সুস্পষ্ট উচ্চারণ, এমন প্রেমমাখা সম্বোধন, এমন অকাট্য যুক্তি-প্রণালী, এমন জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, আমাদের মধ্যে অনেকেরই কর্ণে ইহার পূর্ব্বে আর পৌছে নাই। অনেক জ্ঞানীর জ্ঞানবত্তার অহঙ্কার স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণের পরে চূর্ণ হইয়াছে, অনেক অনুতপ্ত ব্যক্তি আশান্বিত হইয়াছে, অনেক মন্দভাগ্য বিপথগামী সৎপথ আশ্রয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

ক্লান্তি মৃত্যুর পর

বক্তৃতান্তে যামিনী বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াও সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীবাবামণি বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পরন্তু জামাকাপড় ছাড়িয়াই এক খানা পত্র লিখিতে বসিলেন, যাহার কিয়দংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং যাহা "কুমারীর পবিত্রতা" নামক গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই পত্রেরই শেষাংশে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়াছিলেন,—"পরিশ্রমে অতিমাত্রায় পরিবেষ্টিত হইলেও আমি ক্লান্ত হই নাই এবং কুশলে আছি।"

এই সময়েই শ্রীযুক্ত ঈশ্বরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবামণি,—আপনার কি ক্লান্তি নাই?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ক্লান্তি দেহপাতের পরে, আগে নয়।

হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
২৬শে বৈশাখ, ১৩৪১

গুরু-পরীক্ষা ও আত্মপরীক্ষা

সূর্য্যোদয়ের সামান্য পূর্ব্বে জনা কয়েক স্কুল-কলেজের ছাত্র দীক্ষা গ্রহণের মানসে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাবা সকল, এক বৎসর গুরু-পরীক্ষা কর, এক বৎসর আত্মপরীক্ষা কর, তার পরে হবে দীক্ষা। কালও কয়েকজন এসেছিল, তাদেরও এই একই উপদেশ দিয়েছি।

একটী ছেলে বলিল,—গুরু-পরীক্ষার কি প্রয়োজন আছে, যাঁকে গুরু ব'লে মেনেছি, আজীবন তাঁর দেওয়া উপদেশ পালন ক'রে যাব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজীবন যাতে তা পারো, তার জন্যই গুরু-পরীক্ষা দরকার। আজ হঠাৎ এক আবেগে এসে যাঁকে গুরু করলে, দুদিন যাবার পরে যদি তোমারই পূর্ব্বসঞ্চিত অপরাধ-সমূহের জন্য তাঁর উপদেশ মতন চল্‌তে দ্বিধা আসে? আজ মনের অগাধ ভক্তি নিয়ে একজনকে গুরু করলে, তিনিও তোমাকে অন্তরের অকপট স্নেহ দিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপদেশ দান করলেন,

কিন্তু দুদিন যাবার পরেই যদি তোমার মনে হয় যে, পড়া-শুনা ভাল ক'রে ত' আমি করিনি, পরীক্ষায় ফেল ত' আমি হবই, কিন্তু হয়ত পাশ ক'রেও যেতে পাত্তাম, যদি এই গুরুর কাছ থেকে এই মন্ত্রটাই না নিতাম। দাও গুরু ছেড়ে। বা গুরুদেবের নিন্দা করাকে যারা জীবনের এক মহাকর্ত্তব্য ব'লে পরিগণিত করেছে, এমন লোককে এনে মহাসমাদরে জিজ্ঞাসা কর যে, এখন কি উপায় অবলম্বনীয়। অতীতে হিসাব ক'রে চল নাই, ব্যবসায় না শিখে তাতে টাকা দিয়েছ অকাতরে ঢেলে, অবিশ্বাস্য চরিত্রের লোককে বিশ্বাস ক'রে সম্পত্তির তদারক গছিয়ে দিয়ে এখন নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় ও দারুণ দারিদ্র্য-দশায় পড়ে চার দিকে মান সম্মান বজায় রেখে আর চল্‌তে পাচ্ছ না,—দাও গুরুদেবের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে, নিশ্চয়ই তাঁর দেওয়া মন্ত্র থেকেই এই অকথনীয় দারিদ্র্য এসেছে। এক বছর ধ'রে গুরুপরীক্ষা ক'রে দীক্ষা নিলে এই সব জটিল নীচতার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে শিষ্যকে পড়্‌তে হয় না। কেননা, গুরু-পরীক্ষা কত্তে কত্তেই আত্মপরীক্ষাও হ'য়ে যায়।

দীক্ষিতের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষা নেবার পরে অনেকের মনোভাব আবার এমনও হয় যে, এই অঞ্চলে গুরুদেবকে চিন্‌ত কে হে? আমি দীক্ষা নিয়ে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে

দিলাম, তাই না দলে দলে লোকেরা সবাই এসে তাঁর শিষ্য হল। কেউ ভাবেন,—আরে, আমার বাড়ীতে পর পর দশ দশটা মহোৎসব ক'রে আমরা গুরুদেবের মহিমা প্রচার করেছি বলেই ত', নইলে তিনি আমাদের চাইতে একটা অসাধারণ মানুষ কিসে হলেন? কেউ কেউ ভাবে,—বেয়াইন ঠাক্‌রুণ ধরলেন যে, এসো এখানে দীক্ষা নাও, তাই নিলাম। নইলে আমার দীক্ষা নেবার অমন দরকারটাই বা কি ছিল? আবার ছোট শ্যালীটাও কিছুতেই ছাড়বে না,—বল্‌তে লাগ্‌ল, জামাই বাবু, দীক্ষা আপনাকে নিতেই হবে, নইলে ছাড়ব না,—দশ জনের অনুরোধে প'ড়ে দীক্ষাটা নিয়েছি। তা, দীক্ষা নেবার ফলে দশ জনের উপরে যদি আমার কর্ত্তৃত্ব নেতৃত্ব চালাবার সুবিধা না হ'ল, তা' হ'লে আর এ দীক্ষায় লাভ কি হল? ছেড়ে দাও এসব সম্পর্ক; আগে যেমন ছিলাম, তেমনই ভাল। কেউ ভাববেন,—দীক্ষা যখন নিয়েছি, তখন গুরুদেব আমার ঘরের বাঁধা হ'য়েই রইলেন। অখাদ্য যদি রেঁধে দেই, তবু গুরুদেবকে বল্‌তে হবে, চমৎকার খেলাম। তিনি যদি স্বপাকভোজী হন বা তাঁর নির্দ্দিষ্ট লোক ছাড়া অন্যের হাতে খেতে অসুবিধা থাকে, তা হ'লেও জোরজবর ক'রে তাদের হেঁসেল থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই রান্না ক'রে খাওয়াব এবং অন্য গুরুভাই-ভগিনীরা এসে গুরুদেবকে রান্না ক'রে খাওয়াতে চাইলে তর্জ্জন ক'রে বল্‌ব,—আমাদের হাতে খান ব'লে কি তোমাদের হাতেও খাবেন? যাও যাও বেরিয়ে যাও

হেঁসেল থেকে। কলহসৃষ্টিতে অনিচ্ছুক গুরুদেব যদি এই সকল অত্যাচারের মধ্যে প'ড়ে নীরবে কেবল ক্ষুধায়ই কষ্ট পান, তাতেও শিষ্যের কিছু ক্ষতি নেই,—পাড়ার লোকের মধ্যে তার প্রাধান্যটা বজায় থাকলেই চল্‌বে। গুরুদেব আমাদের গ্রামে এসে কোন্ সাহসে অন্য শিষ্যের বাড়ীতে উঠ্‌বেন? অন্যরাই বা আমার জিনিষকে কোন্ সাহসে নিজেদের ঘরে তুলবেন? গুরুদেব যে আমাদের সম্পত্তি। আমরা কিন্তু গুরুদেবের নই। তাঁর যে আদেশ পালনে আমাদের নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়ে, মাত্র ততটুকুই প্রাণ দিয়ে পালনীয়, কিন্তু তাঁর কোনও আদেশে যদি অন্যের প্রতিপত্তি বে'ড়ে যায়, তা হ'লে সে আদেশ অপালনীয় অগ্রাহ্য। আমিত্বের বা অহমিকার এই পূজা নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সত্যিকারের গুরুরা ত' বিশ্বের সম্পদ। সমগ্র বিশ্বের প্রতি জনের রয়েছে তাঁদের উপরে অধিকার। একজন পদস্থ সম্মানিত ধনবান্ ব্যক্তির চাইতেও তাঁরা একজন ভক্তিমান্ ব্যক্তির প্রতি অধিকতর পক্ষপাতশীল। অপরিচিত নূতন স্থানে অনাদৃত অবস্থায় রেলের প্ল্যাটফরমে ব'সেও তাঁরা যেই মনটী নিয়ে জগতের হিত-চিন্তা কচ্ছেন, আবার লক্ষপতি কোটিপতির গৃহে ব'সে মহাসমারোহময় সম্বর্দ্ধনার মাঝেও ঠিক সেই মনটী নিয়েই জগতের কল্যাণ সাধনে তাঁরা ব্যস্ত। কোটিপতি যখন স্বর্ণ-ভৃঙ্গারে ক'রে জল এনে গুরুদেবের পদধৌত কচ্ছেন, তখনো তিনি সেই লোকটীর কথা ভুল্‌তে পারেন না, আগের রাত্রে একখানা ছিন্ন কন্থায় দিয়েছিল যে শু'তে, আর পানীয় জল

দিয়েছিল একটা ভাঙ্গা মাটির খোরাতে ক'রে। সংসারী মন নিয়ে শিষ্য হ'লে বা শিষ্য হবার পরেও সংসারী মনটীকে শ্রীগুরুদেবের সম্পর্কে মাথা তুল্‌তে দিলে এই সব অশান্তি হয়। তাই এক বৎসর গুরুপরীক্ষা ক'রে তারপরে দীক্ষা নেওয়া সংসারী লোকদের পক্ষে ভাল।

গুরুর শিষ্য-পরীক্ষা

একটী যুবক বলিল,—আপনি কি আমাদের যোগ্যতার অযোগ্যতার পরীক্ষা ক'রে দীক্ষা দিতে পারেন না? সকলকে একই সঙ্গে বিমুখ কচ্ছেন। যে যোগ্য, অন্ততঃ তাকে দীক্ষা দিন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার দৃষ্টিতে যোগ্য তোমরা সবাই। কিন্তু আমার মনে এখন দীক্ষা দেবার অভীপ্সা নেই। শিষ্য দেখ্‌লে আমি চিন্‌তে পারি, কে কি হবে। কিন্তু আমার যখন দীক্ষার অভীপ্সা থাকে, তখন যদি এমন লোকও আসে, শিষ্য হবার পরেই যে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এসে তাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে আমাকে হত্যা করবে, আমি জেনে-শুনেও তাকে দীক্ষা দেই। আমি হয়ত অপমৃত্যুই মরলাম, কিন্তু আমার দীক্ষাদানের অভীপ্সার কালে যে দীক্ষা নিয়েছে, সে আমাকে হত্যা করার পরেও আমার দেওয়া জিনিষের মহিমাতেই পরমকল্যাণকে এক সময়ে না এক সময়ে লাভ করবে। অতি দুর্বৃত্ত অনেক লোককে আমি অকাতরে দীক্ষা

দিয়েছি, তাতে কেউ অতিশয় সাধু পুরুষে পরিণত হয়েছে, আবার কেউ বা নিজ দুর্বৃত্ততা আমারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ ক'রে ক'রে তার কর্ম্মফলকে ক্ষয়িত কচ্ছে। কারণ, যখন আমারই বিরুদ্ধে তার দুর্বৃত্ততা, তখন সে আমাকে অতিশয় তীব্র ভাবে ধ্যান কত্তে বাধ্য হচ্ছে। এতে তার পরোক্ষভাবে কর্ম্মক্ষয় হচ্ছে। তবে স্থল-বিশেষে শিষ্য-পরীক্ষার জন্য আমিও এক বছর দু বছর তিন বছর অপেক্ষা করি এবং তাতে শিষ্যের কুশলই হয়। তোমাদের আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। তোমরা স্কুল-কলেজের ছাত্র, তোমাদের কাছে দেশের দশের কত আশা। জগৎকে কল্যাণ, আনন্দ, সমৃদ্ধি দানই হবে তোমাদের আদর্শ। সেই আদর্শের দিকে তাকিয়ে চল্‌তে থাক, সৎসঙ্গ কর, মহতের জীবনী আলোচনা কর, আলস্যমূলক সকল বিলাস ও ব্যসন পরিহার কর। তার পরে যেদিন যার দীক্ষার সময় হবে, তখন, আমিই যদি তোমাদের গুরু হ'য়ে থাকি, তবে আমার সাথে তোমাদের আশ্চর্য্যজনক ভাবে দেখাও হয়ে যাবে, দীক্ষাও হয়ে যাবে। এখন তাড়াতাড়ি ক'রে দীক্ষা নেবার দরকার নেই বাছারা।

যেই নাম বাস সব চেয়ে ভাল

ছেলেরা কেহ কেহ ধরিল যে, তাহাদের খাতায় একটি করিয়া অটোগ্রাফ দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এই জিনিষটা আমাদের দেশে সম্প্রতি আমদানী হয়েছে। জনে জনে একটা ক'রে খাতা

এনে হাজির করবে, আর খাতায় খাতায় একটা ক'রে বাণী লিখতে হবে। কিন্তু একি সাধারণ পরিশ্রমের ব্যাপার? আগেকার দিনে ছেলেমেয়েরা ভক্তিভরে মহৎ লোকের পায়ের ধুলিটুকু মাথায় নিত আর তাতেই সমস্ত তীর্থের পবিত্রতাটুকু, সমস্ত সাধকের মনের দিব্যভাবটুকু মনে সঞ্চারিত হ'য়ে যেত। বেশ ত', দাও খাতা।

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরম প্রভুর নামেতে নিষ্ঠা লইয়া চলরে পথ,
বিপথে যাবে না চোখ বুজে যদি চালাও তোমার রথ।
নাম নহে শুধু প্রেমমধুময়,
যত আছে ভয় সব পাবে লয়;
একাগ্র মনে জপিয়া জীবন হইবে পুণ্য সৎ।
যেই নাম বাস সব চেয়ে ভাল,
সেই নামে মহাবিক্রমে চল।
চল অবিরত, পূর্ণিবে যত মঙ্গল-মনোরথ।"

প্রাণ আছে কিরে?

অপর একজনের খাতায় শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়া দিলেন,—

টাকা নাই তার, তাই বসি' বসি'
কেবলি ভাবিয়া মরে,
"অর্থ বিহনে ঠাকুরের পূজা
করিব কেমন ক'রে?"

"প্রাণ আছে কিরে?"—কহিলেন ধীরে
প্রাণের দেবতা আসি'
"নিজেরে বিলাতে পারিবি কি তুই
নয়ন-সলিলে ভাসি?"

কেহ নাহি জানে

অপর এক জনের খাতায় শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়া দিলেন,—

"নীরব মন্দির-কোণে মুষ্টিমেয় কয় জনে
নিভৃতে বসিয়া ঐ করিছে সাধনা,
একমাত্র লক্ষ্য মনে কত দিনে বা কেমনে
বিলুপ্ত হইবে এই বিশ্বের বেদনা।
অন্তরে অনল-শিখা ললাটে জয়ের টিকা
জ্বালাইয়া রাখে তারা সুস্মিত সুস্থির
ব্যক্তিগত সুখশান্তি সুবিধা খোঁজার ভ্রান্তি
চেতনার পরিধির করিয়া বাহির।
কিন্তু এই সুনীরব সাধনা জিনিল সব
চতুর্দ্দিকে বিস্তারিল সিদ্ধ মনোভাব
কত অজানিত প্রাণে কি যে ব্যাকুলতা আনে
কেহ নাহি জানে কার মঙ্গল-প্রভাব।"

জিনিষপত্র বাঁধা হইয়া গিয়াছে। আজই শ্রীশ্রীবাবামণি হবিগঞ্জ হইতে চলিয়া যাইবেন, তাই পত্রের পর পত্র লিখিয়া সমাগত পত্রের বোঝা কমাইতেছেন। প্রতিখানা পত্রের উপরে

একখানা করিয়া পোষ্ট কার্ডে উত্তর-প্রাপকের নাম-ঠিকানা লিখিয়া শেষ রাত্রেই একটী স্তূপ সাজান হইয়াছিল। ইহাই শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যধিক সংখ্যায় পত্র জমিলে উত্তর দানের কৌশল। এখন এক এক খানা করিয়া কার্ড তোলা হইতেছে আর পত্রের জবাব লিখিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পত্রলেখকের প্রেরিত পত্র খানা ছিঁড়িয়া ফেলা হইতেছে। টেবিলের বাম পার্শ্বে ছিন্নপত্রগুলি ফেলিবার জন্য একটা ছোট ঝুড়ী রাখা হইয়াছে।

নামের সেবক তুমি সামান্য ত' নহ

একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যত দুঃখ যত ভয় করি' বিসর্জ্জন
নিশ্চিন্তে করিতে থাক নামের সাধন।
করিতে করিতে নাম পাবে আস্বাদন
দেহ-মনঃ-প্রাণ-আত্মা-বিশ্ব-উন্মাদন।
প্রতি রোমকূপে হবে মহাসমারোহ,
নামের সেবক তুমি, সামান্য ত' নহ।"

দুর্ব্বলের বল

অপর এক জনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শোক দুঃখ যাবে দূরে নামের সেবায়,
নামে রুচি আছে যদি, বিপত্তি কোথায়?

নামেরে জানিয়া লভ নামীর মূরতি,
সর্ব্বশক্তি দিয়া অর্প নামে পূর্ণপ্রীতি।
নাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্য সম্বল,
হতাশের আশারুণ, দুর্ব্বলের বল।"

অবিরাম অবিচ্ছেদ করহ সাধন

অপর এক জনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিষ্কাম সাধনে মগ্ন রহ অনিবার,
কি লাভ হইবে করি' ফলের বিচার?
ইহা দাও, উহা দাও, বলি' বারংবার
কিছু নাহি প্রয়োজন করিয়া চীৎকার।
নামে ডালি দিয়া তব সর্ব্ব প্রয়োজন
অবিরাম অবিচ্ছেদ করহ' সাধন।"

নিজেরে নিঃশেষ করি' নামে কর লয়

অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যতই করিবে নাম, তত সুখোদয়,—
কল্পনা নহেক ইহা, সত্য সুনিশ্চয়।
প্রথম প্রথম লাগে কটুস্বাদ বটে,

সাধিতে সাধিতে তার মিষ্টত্ব প্রকটে।
নামে প্রেম উপজিলে বিশ্ব মধুময়,
নিজেরে নিঃশেষ করি' নামে কর লয়।"

বিশ্বহিত তরে কর সর্ব্বস্ব প্রদান

অপর এক জনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজের লাগিয়া সারা জীবন কাঁদিলে,
নিজেও জ্বলিলে দুঃখে, সবে সন্তাপিলে।
তাঁহার লাগিয়া আজি কাঁদ এক বার,
সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু সৃজন যাঁহার।
তাঁর নাম ভালবাসি' পূর্ণ কর প্রাণ,
বিশ্বহিত তরে কর সর্ব্বস্ব-প্রদান।"

নামের প্রতাপে হবে অহঙ্কার নাশ

অপর একখানা পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কে কাহার বড়, আর কে কাহার ছোট,
সব ভুলি' এক বৃন্তে গুচ্ছ হয়ে ফোট।
ইনি, উনি, তুমি ও সে একের অর্চ্চনে
আত্মনিয়োজিয়া এক হও প্রাণে মনে।

নামের মহিমা কর জগতে প্রকাশ,
নামের প্রতাপে হবে অহঙ্কার নাশ।"

নামের সেবায় কর আত্মসমর্পণ

অপর এক জনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,

"নামের সেবায় কর আত্মসমর্পণ
চিরতরে অহমিকা দাও বিসর্জ্জন।
'আমি' 'আমি' করি যত ধাবন কুর্দ্দন
সৃষ্টি করে শুধু দুঃখ, বিপত্তি, ক্রন্দন।
নামেতে অর্পণ করি' দেহ মনঃ প্রাণ
পুঞ্জীভূত সমস্যার হবে সমাধান।"

দারিদ্র্য ঘুচাতে চাও

অপর এক জনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দারিদ্র্য ঘুচাতে চাও? নাম কর সার।
অমূল্য নামের নিধি, সর্ব্বরত্নাধার।
অন্য ধনে পরপীড়া-বুদ্ধি শুধু বাড়ে
নিত্য ধনে নির্ব্বিচারে সবারে নিস্তারে।
নাম পরামৃতখনি, শাশ্বত, সম্পদ,
নিত্যানন্দময় দিব্য প্রেমের আস্পদ।"

অমর হইবে

অপর এক জনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অমর হইবে যদি, নাম কর সার,—
দূর হবে দেহবুদ্ধি, মানস বিকার।
দূর হবে অনিত্যেরে নিত্য বলি' ভ্রম,
পরমার্থময় হবে সব পরিশ্রম।
ইহকালে পরকাল করিয়া মিলিত
অনন্ত হইবে তব জীবন সীমিত।"

স্বামী দয়ানন্দের জনক-জননী

দশটায় ট্রেণ। ষ্টেশনের পথে শ্রীশ্রীবাবামণি অরুণাচল মিশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ সাধক শ্রীশ্রীদয়ানন্দ স্বামীজীর জনক-জননীকে দর্শনের মানসে তাঁহাদের ভবনে অবতরণ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণির নিজের ভাষায় "যে দম্পতীর কুটির হইতে বহুজন-সুখদাতা বহু-নয়ন-জ্ঞান-বিধাতা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে," *সেই দম্পতীর সমীপে শ্রীশ্রীবাবামণি যখন উপনীত হইলেন, তখন কি যে এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা হইল, তাহার কোনও বর্ণনা সম্ভব নহে। এক গৃহত্যাগী জগদ্ধিতকামী

* কুমারীর পবিত্রতা ১ম খণ্ড।

মহাপুরুষের জনক-জননী বার্দ্ধক্য-দশায় অপর এক গৃহত্যাগী জগদ্ধিতকামী মহাপুরুষের দর্শন পাইয়া যেন নিজ পুত্রের পুনরাগমনের আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। উভয়ের নয়নে দুর্নিবার অশ্রুধারা, উভয়ের কণ্ঠে গদ্-গদ ভাষণ।

পুত্রই পিতামাতার কীর্ত্তিস্তম্ভ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনার পুত্র আজ জগদুদ্ধারকারী মহাত্মা, যোগিজন-বাঞ্ছিত পরমপদ তাঁর করামলকবৎ অধিগত, ব্রাহ্মী নিষ্ঠায় তিনি স্থিত, প্রেমময় স্বভাবে তিনি উপনীত, এর চেয়ে মহত্তর কীর্ত্তি, বৃহত্তর যশ, শ্লাঘ্যতর সৌভাগ্য আপনাদের আর কি হ'তে পারে? সুপুত্রই সৎ পিতামাতার অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ। আপনাদের আর অপর কীর্ত্তির কি আবশ্যকতা আছে?

কৃতকৃত্য পুত্রের পিতামাতার আনন্দ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনাদের দিব্যকীর্ত্তি পুত্রের ন্যায় এই মহকুমাতেই আরও এক দম্পতী আর এক দিব্যকীর্ত্তি পুত্রের জনক-জননী হবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিলেন। আমি ব্রজবিদেহী বাবা সন্তদাসের কথা বল্‌ছি। তাঁর এই অভ্যুন্নত সিদ্ধজীবনের বিমল জ্যোতি দূরদূরান্তর থেকে দর্শন ক'রে নয়নকে আনন্দিত করার সৌভাগ্য তাঁর জনক-জননীর হয়

নি। কিন্তু ভেবে দেখুন, দেশে দেশে যাঁর মহিমা প্রচারিত, সেই সন্তদাসজীর বৃদ্ধ পিতামাতা আজ যদি জীবিত থাকতেন, তবে কি আনন্দই না আজ তারা কত্তেন। তাঁদের আনন্দ ও সৌভাগ্যকে কল্পনার নেত্রে দর্শন ক'রে আপনারা আজ নিজেদের আনন্দ ও সৌভাগ্যের পরিমাপ করুন। আপনারা এক বিশাল আলোকস্তম্ভের জনয়িতা ও জনয়িত্রী। আপনারা ধন্য।

সন্তানার্থে পিতামাতার আত্ম-বিলোপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু অনেক পিতামাতা নিজ পুত্রের কৃতিত্বের আনন্দকে নিজেদের জীবনে আস্বাদন কত্তে অক্ষম হন। তার কারণ পুত্রের তপস্যার অভাব নয়, পরন্তু পিতামাতার আত্ম-বিলোপ-সক্ষম স্নেহের অভাব। যে স্নেহে পুত্রের জন্য পিতামাতার আত্ম-বিলোপ নেই, সেই স্নেহ পিতৃযোগ্য বা মাতৃযোগ্য নয়। স্নেহ ত' জগতের সকলেরই অল্পাধিক থাকে, কিন্তু তার জন্য কি তারা কারো পূজ্য হয়? পিতামাতা সন্তানের জন্য নিজেকে লুপ্ত ক'রে দিতে পারেন, এইরূপ অপরিসীম স্নেহ তাঁদের আছে ব'লেই তাঁরা পুত্রকন্যার নিকটে জগতের সকলের চেয়ে বেশী পূজ্য। মহান সন্তানের মহেশ্বর-মহেশ্বরী-তুল্য জনক-জননী আপনারা, আপনারা জগতে ধন্যাতিধন্য।

শিবপুর, কুমিল্লা
৩১শে বৈশাখ, ১৩৪১

তিন দিন হয় শ্রীশ্রীবাবামণি হবিগঞ্জ হইতে শিবপুর আসিয়াছেন।

অনাচরণীয়ত্বের উচ্ছেদ

অপরাহ্নে সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত জাতি সমূহের কথা প্রসঙ্গক্রমে উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমাজে যাদের অনাচরণীয় ক'রে রাখা হয়েছে, তাদের অনাচরণীয় ক'রে রাখার পক্ষে যুক্তি-সঙ্গত কারণ কি কি ছিল, অনেক ক্ষেত্রেই তৎসম্পর্কে কিছু জানা যায় না। কারো কারো পক্ষে যা জানা যায়, তা কতকটা জনশ্রুতির মত অস্পষ্ট ও সাধারণ বিচারে কতকটা বাড়াবাড়ি-ব্যবস্থা ব'লেও মনে হয়। আবার যাদের অনাচরণীয় হবার স্বপক্ষে উৎকৃষ্ট কারণ নির্দ্দিষ্ট করা আছে, তাদের সেই কারণটি আজকাল অনেক কুলীন ও সমাজ-শিরোমণির পরিবার-মধ্যে অহরহ দেখা যাচ্ছে, অথচ সমাজে এদের পাতিত্য বিধান করা হচ্ছে না। এই সমস্ত দেখেও তোমাদের মনে এই সঙ্কল্প হওয়া উচিত যে, এমন ব্যবস্থা করা চাই, যেন দেশে বা সমাজে অনাচরণীয় ব'লে কেউ না থাকে।

অচলকে সচল করিবার চেষ্টায় বিঘ্ন-বিপত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সেই চেষ্টায় বিঘ্নও আছে। প্রধান বিঘ্ন হচ্ছে এই যে, সমাজের অনাচরিত জাতি-সমূহকে আচরণীয় করার উদ্দেশ্যে যদি তুমি সদাচারী ও নিষ্ঠাবান হবার জন্য চাপ দাও, তা হ'লে সে প্রথমেই ব'লে বস্‌বে,—"কৈ মহাশয়, তোমাদের সর্ব্বোচ্চ-বর্ণ ব্রাহ্মণেরা ত' আজকাল আদৌ সদাচারী নন। তাঁদের আগে সদাচারী হ'তে না ব'লে আমাদের কেন ও-কথা বল্‌তে এসেছ?" অর্থাৎ দ্বিজ-চণ্ডাল কোলাকুলি হোক্, এটা সব অন্ত্যজেরাই চান, কিন্তু চণ্ডালের পক্ষে "চণ্ডালত্ব" ঘুচাবার চেষ্টায়ই কঠিন আপত্তি; যেহেতু আজকাল দ্বিজের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে কতটুকু? আবার বিপত্তিও যথেষ্ট আছে। সমাজের এই আবশ্যকীয় সংস্কারটুকু সম্পাদন কত্তে যদি সেই অনাচরিত জাতিরই একটী সন্তান অগ্রসর হন, তবে অপর সহস্র সদ্‌গুণের সাথে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে তথাকথিত উচ্চবর্ণ সমূহের প্রতি সকারণ ও অকারণ বিদ্বেষের নিদারুণ অনুশীলন ক'রে থাকেন। পরন্তু এই মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য যদি উচ্চতর বর্ণের কোনও সন্তান অগ্রসর হন, তবে তিনি নিম্নতম বর্ণগুলির আভ্যন্তরীণ শক্তি, প্রতিভা, উপযোগিতা, চরিত্র, সংস্কৃতি ও প্রবণতার চূড়ান্ত সংবাদ পান না ব'লে অনেক বিষয়ে অনধিকার-চর্চ্চা করেন, নতুবা তাঁর অপক্ষপাত উদার স্নেহভাবের ভিতরেও ব্যক্তিগত

প্রভুত্ব স্থাপনের অভিপ্রায় আছে ব'লে কুব্যাখ্যা করা হয়। অনাচরিতকে আচরণীয় করার পথে এসব বিঘ্ন-বিপদ অসংখ্য। কিন্তু তা দেখে ত' ভয় পেলে চল্‌বে না। কর্ত্তব্য যা, করে যাও নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে।

সমাজ-সংস্কারে বিচার ও বুদ্ধির প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু নির্ভয়ে করলেও নির্ব্বিচারে ক'রো না। নিঃসঙ্কোচে কর্ল্লেও নির্ব্বোধের মত ক'রো না। সমাজ-সুধারের কাজ হয়ত তোমার একটু আস্তে আস্তে হবে, কিন্তু পাকা ক'রে কর্ত্তে চেষ্টা ক'রো। কাদার গাঁথুনি দেওয়া দালানের চাইতে সিমেণ্টের গাঁথুনি দেওয়া দালানে সময়ও লাগে বেশী, শ্রমও বেশী, ব্যয়ও বেশী। এ জন্য এ কাজ করার আগে একটু বেশী হিসাবের দরকার হবে। সিমেণ্টের গাঁথুনি ভাঙ্গা কঠিন। কাদার গাঁথুনি ভাঙ্গা সহজ, একটা ভাল মত বর্ষার পরে শাবল ধরলে একদিনে হাজার ফুট গাঁথুনি ধ্বসিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং বিচার এবং বুদ্ধিকে প্রয়োগ ক'রে সমাজ-সংস্কারে অগ্রসর হবে। এক দিনের অন্যায় শুধু হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইলেই সংশোধিত হয়। কিন্তু অনেক দিনের অন্যায়ে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দরকার। কিন্তু ক্ষতির পূরণ কর্ত্তে হ'লেই ক্ষতিরও পরিমাণ খতাতে হয়, কি ভাবে পূরণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে সম্ভব, তারও বিচার কর্ত্তে হয়।

বৈশ্য হইবে, না ব্রাহ্মণ হইবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই গ্রামটিতে বহু কপালীর বাস ত'? এস, এদের কথাই ধরা যাক্। এরা শান্তিপ্রিয় চাষী শ্রেণীর লোক। প্রায় সকলেই জমি চষে, ফসল উৎপাদন করে, হাটে-বাজারে নিজ নিজ উৎপাদিত ফসল বেচে, গাভী পালে, হাঁস পোষে, সন্ধ্যাকালে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করে, প্রাতঃকালে দুর্গা দুর্গা ক'রে ঘরের বের হয়, আলাপে নম্র, ব্যবহারে ভদ্র, কিন্তু অবস্থায় দরিদ্র। এদের তোমরা জল খাও না, এদের ঘরে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দাও না। এদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত, তারা নিজ সমাজের লোকদের "অপর সমাজের লোকের" নিকটে অনাদৃত দেখে শাস্ত্র খুঁজে প্রমাণ বের করেছেন যে, এরা বৈশ্য, এরা শূদ্র নয়, এরা অনার্য্য নয়, এরা ম্লেচ্ছ নয়। তোমরা যদি এদের বৈশ্য ব'লেও মেনে নাও, তবুও কিন্তু এদের দুর্দ্দশা ঘুচবে না। কেন না, তোমরা ব্রাহ্মণ হ'য়ে কি বৈশ্যের অন্ন খাবে? দেশব্যাপী অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত না হ'লে কি ব্রাহ্মণ কখনো এক কথায় এই কপালী-বৈশ্যের হাতে নিজের কন্যা দেবে? বৈশ্য হয়েই বা বাছা তাদের লাভ হ'ল কি তা হ'লে? ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ত' বৈশ্যকে শাস্ত্রের নজিরেই অবজ্ঞা করতে চাইবে, নিজের চেয়ে ছোট ব'লে গণনার অধিকার দাবী কর্ব্বে। একটী খুব ভাল ছেলে সেদিন আমাকে বল্‌ছিল,—"আমরা কপালী-বৈশ্য-সমিতি ক'রেছি, আপনার

একটী আশীর্ব্বাদ চাই।" কয়েকদিন আগে আর একটী ছেলে আমাকে ডেকেছিল তাদের বৈশ্য-সাহা-সমিতির বার্ষিক সভাতে এসে সভাপতিত্ব কত্তে। আমি বলেছিলাম,—"সেই বৈশ্যই যদি রইলি বাছা, তবে আর অগ্রসর হলি কতটুকু? আমি ত' চাচ্ছি তোরা সবাই ব্রাহ্মণ হ। ব্রাহ্মণের ত্যাগ, ব্রাহ্মণের তপস্যা, ব্রাহ্মণের অধিকার, এ সব তোদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করুক। চারটে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণই যদি রইল, তা হ'লে Permutation & Combination হ'য়ে হ'য়ে, মিশ্রণ-বিমিশ্রণের মধ্য দিয়ে, ক্রমে ক্রমে সেই সাড়ে ছত্রিশ জাতিই ত' আবার আত্মপ্রকাশ কর্ব্বে। উন্নতিই যদি চাস্ বাছা ত' একেবারে বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই হ।" সকল জাতির সকল সমাজের লোক যদি একমাত্র ব্রাহ্মণ হওয়াকেই আদর্শ ব'লে গ্রহণ করে, তা হ'লেই বৈষম্য ঘোচ্বার পথ হয়। "সর্ব্বে বর্ণা ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ",—সকল বর্ণই ব্রহ্মা থেকে জন্মেছে এবং এই কারণে সকলে ব্রাহ্মণ। একদা সবাই ব্রহ্মা থেকেই জাত হয়েছিলেন। অধিকাংশ জাতিরই ত' বংশাবলী খুঁজ্তে গেলে ক্রমশঃ উপরে উঠ্তে উঠ্তে এমন জায়গায় এসে পৌছুবে, যেখানে আদি পুরুষের কোন হদিশই মিলে না। সুতরাং কে যে ব্রহ্মার মুখ থেকে হলেন, আর কে যে তাঁর চরণ থেকে হলেন, তা' কে নির্দ্ধারণ ক'রে দেবে? কে যে সত্যই ব্রাহ্মণের বংশে জন্মেছে, আর কে যে সত্যই শূদ্রের বংশে জন্মেছে, তার যথার্থ বিচার কে করবে? কি দেখে কর্ব্বে? কোন্ প্রমাণে নির্ভর ক'রে করবে? তুমি যে

ব্রাহ্মণের বংশে জন্মেছ, এটাও তোমার অনুমান। উনি যে বৈশ্যের বংশে জন্মেছেন, সেটাও তাঁর অনুমান। একজন অন্ত্যজের ছেলে যদি কখনো অবন্তী থেকে কোশলে গিয়ে নিজেকে গৌতম-গোত্রের ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিয়ে সেখানকার রাজপণ্ডিতের কন্যার পাণি-গ্রহণ ক'রে থাকে, তবে আজ কি তার প্রমাণ লুপ্ত হয়ে যায়নি? একজন পুত্রশোকাতুরা ব্রাহ্মণ-বিধবা যদি কাশীতে এসে একটী ব্যাধ-নন্দনকে নিজ পুত্রের সদৃশ দেখে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নিয়ে গিয়ে পুত্র-পরিচয় দিয়ে দু'হাজার বছর আগে কান্যকুব্জেরই কোনও ব্রাহ্মণতনয়ার সঙ্গে বিবাহ দিতে পেরে থাকেন, তবে এতদিন পরে কি তার প্রমাণ কেউ খুঁজে বের কত্তে পার্ব্বে? কালের কুটিল আবর্ত্তনে কত ব্রাহ্মণের বংশধর নিকৃষ্ট চণ্ডাল-বংশের পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছে, আবার কত ম্লেচ্ছ, শবর, পুলিন্দ, কিরাত প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের পরিচয় দিয়ে টিকি আর পৈতার আস্ফালন কচ্ছে, তার কি কোনও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এ দেশে কেউ রক্ষা করেছে। ছোট যখন বড়'র আসন দখল করেছে, তখন সে প্রাণপণে নিজের পূর্ব্ব-পরিচয়ের প্রমাণ বিনষ্ট করেছে একমাত্র প্রতিষ্ঠালোপেরই ভয়ে। বড় যখন ছোট হয়েছে, তখন সে নিজের অতীত বড়ত্ব গোপন ক'রে চলেছে নিছক লজ্জায়, সরমে, অপমান-বোধে। এ ভাবে কতবার এক এক জাতির জাত্যন্তর ঘ'টে ঘ'টে বর্ত্তমান জাতিসমূহের উদ্ভব, তা কে জানে? যাদের তোমরা নিকৃষ্ট, নিন্দিত, নীচ ব'লে জ্ঞান কর, হয়ত

তারা উৎকৃষ্ট, প্রশংসিত, উন্নত ব্রাহ্মণেরই বংশধর, কিন্তু আত্মবিস্মৃত ব'লে আজ বৈশ্য-পরিচয়ে আর্য্য-পংক্তিভুক্ত হ'তে পারাকেই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান কচ্ছে। এই জন্যই বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় সাজার চেষ্টা না ক'রে প্রত্যেকের ব্রাহ্মণ হবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ হওয়ার আপদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু তাতেও আপদ আছে। সাহা, কপালী, যোগী প্রভৃতি জাতের লোকেরা যদি ব্রাহ্মণ হন, তাহ'লে সাহার ব্রাহ্মণ, কপালীর ব্রাহ্মণ আর যোগীর ব্রাহ্মণ নামে তাঁদের যে পুরোহিত-সম্প্রদায় আছেন, তাঁদের গতি কি হবে? বারো মাসের তের পার্ব্বণে পূজার মন্ত্র প'ড়ে যে চাল-কলাটা পাওয়ার বরাদ্দ ছিল, তা ত' নিতান্তই মাঠে মারা যাবে। বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী-পূজা, মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা, শনিবারে শনৈশ্চরের পূজা প্রভৃতি ক'রে যে দু'-চার পয়সা মিল্‌ত, তা ত' বন্ধ হবে। আর ভিন্নতর জীবিকার আশ্রয়-হেতু কোনো ব্রাহ্মণের যদি সেই চাল-কলা ও দক্ষিণার পয়সার তোয়াক্কা না রাখ্‌তে হয়, তবুও সম্মানটা ত' যাবে! সাহাও ব্রাহ্মণ আর সাহার ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ, কপালীও ব্রাহ্মণ আর কপালীর ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ, যোগীও ব্রাহ্মণ আর যোগীর ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ, ধোপাও ব্রাহ্মণ আর ধোপার ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ, এ' ত' সহনাতীত! ফলে, ব্রাহ্মণ হ'তে কেউ যেন না চায়,

তারও জন্য আবার একটি পোক্ত ষড়যন্ত্র বা অকাট্য কৌশল চাই। তাই, এই ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকেই একদল বেরুবেন জাতি-বিশেষের বৈশ্যত্বের ঢেঁড়া পিটিয়ে বেড়াবার জন্য। তাদের পাকা ঘুটির চালটী হবে,—"বাছারে, সবাইত জানে তোরা নিতান্তই শূদ্র, অনার্য্য, ম্লেচ্ছ। সুতরাং অতি বাড় বেড়ে ব্রাহ্মণ হবার স্পর্দ্ধায় তোদের প্রয়োজন নেই। আমরা শাস্ত্র-বচন খুঁজে বের ক'রে তোদের হাতে দিচ্ছি, লক্ষ্মী ছেলেটির মত নির্ব্বিচারে তা গলাধঃকরণ ক'রে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন চিত্তে কোনো রকমে বৈশ্য হ'য়ে থাক্। এর বেশী আশা এই জন্মে করা ঠিক হবে না। বৈশ্যরূপে পরিচয় দেওয়াই কি একটা কম গর্ব্বের বিষয় হল নাকি রে? আর ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের সেবা ক'রে গেলে এই জন্মের শুভকর্ম্মের ফলে তোরা যে আগামী জন্মে ব্রাহ্মণ হ'য়েই জন্মাবি না, তাই বা কে বল্‌ছে?"

যার জন্য করি চুরি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুতরাং সমাজ-সংস্কারের কাজে এগিয়ে প্রথমেই দেখতে হবে যে, কার কোথায় Vested Interest বা কায়েমী স্বার্থ, কার কিসে আঁতে ঘা, কার কোথায় ক্ষতি ও দরদ। ভাল ক'রে না দেখে না বুঝে যদি কাজে লাগ, তবে যার জন্য চুরি কর্‌বে, সেই তোমাকে চোর অপবাদ দেবে। কারণ, নীচবুদ্ধি-ব্যক্তির অভাব এ জগতে নেই, নির্ব্বোধের সংখ্যাও বড় কম নয়। আমার পূজনীয়

পিতৃদেবের রচিত একটা গান আমরা খুবই গাইতাম,—

"দেখ্‌লাম খেটে সবার তরে,
দুঃখ বরং উঠ্‌ল বেড়ে;
যার জন্যে মা করি চুরি,
সেই যে আমায় ডাকে গো চোর।
এ নিশার কি হবে না ভোর?"

মিলনের বলে মহা-ইতিহাস

অদ্য কুমিল্লা জেলান্তর্গত শ্রীরামদীতে জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সকলের সর্ব্বশক্তি যখন একটা কাজে আসিয়া লাগে, তখন কে তোমরা স্বল্পশক্তি আর কে তোমরা স্বল্পমেধা, তাহা কোনও সমস্যার বিষয় হয় না। ছোট তখন সঙ্ঘের শৌর্য্যে বড় হয়, দুর্ব্বল তখন মিলনের মহিমায় সবল হয়, নীচাত্মা তখন সকলের সাহচর্য্যে পড়িয়া উন্নতাত্মা হয়। একার শক্তিতে একখানা মহাকাব্য রচিত হইতে পারে, একার সাধনায় এক বিরাট দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি হইতে পারে, যাহার প্রভাবে অবশ্যই সর্ব্বসাধারণের উপরে কিছু না কিছু পড়িতে বাধ্য। কিন্তু একার শক্তিতে কোনও ঐতিহাসিক বিরাট ঘটনার সৃষ্টি সম্ভব নহে। জনে জনেই মহাকাব্য রচনা বা মহাদর্শন গ্রন্থন করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু জনে জনেই তোমরা মিলনের বলে মহা-ইতিহাস রচিয়া যাইতে পার।"

সৎলোকের সংহতি চাই

উক্ত স্থানেই অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সকলকেই তোমার সহিত সহযোগ করিতে হয়ত দেখিবে না, কিন্তু মুষ্টিমেয় যেই কয়জন অকুণ্ঠিত চিত্তে সহযোগ প্রদান করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যকে যদি কোনও অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন হইতে না দাও, তাহা হইলে ইহারই মহিমায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তোমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইবে। সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা,—তবে তাহা সৎলোকের সংহতি হওয়া চাই।"

সত্য, সেবা ও অকপটতার জয়

অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মহৎ সঙ্কল্প লইয়া, উদার উদ্দেশ্য অন্তরে পুষিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তুমি কাজে নামিয়া গিয়াছ বলিয়াই প্রত্যাশা করিবে যে, অপরেরাও আসিয়া তোমার কাজে হাত লাগাইবে, তোমার লক্ষ্যকে আপন করিয়া ধরিবে, মুক্তকচ্ছ যুক্তকর হইয়া তোমার অভ্যুন্নত আদর্শের চরণে মাথা পাতিয়া দিবে, মুক্তহস্ত হইয়া শক্তি, সামর্থ্য, সহযোগ, সহানুভুতি ও সম্পদ দান করিবে,— ইহা মনে করিও না। একাই তুমি নামিয়াছ, একাই তোমাকে

কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। কিন্তু একা তোমারই কোনও শুভ-সাধনের জন্য তোমার সর্ব্বস্বোৎসর্গ-পণ নহে। তাই যাঁহাদের জন্য তোমার এই ত্যাগব্রত, তাঁহাদের অনেককে তোমার দক্ষিণে, বামে ও পৃষ্ঠদেশে সহায়করূপে পাওয়ার সম্ভাবনা তোমার রহিয়াছে। কিন্তু কখন তাঁহাদের পাইবে? যখন তাঁহারা বুঝিবেন যে, তোমার আত্মদান তাঁহাদেরই জন্য। আত্মদানের ফিকির ধরিয়া কতজন আত্মপূজার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? তুমি যাহা দেখিতে পাও, জনসাধারণও তাহা দেখিতে পান। তাঁহাদেরও চোখ আছে। কত অসামান্য ত্যাগধ্বজাধারীর কাছে স্বার্থ বিলাইয়া দিয়া ইঁহারা বারংবার ঠকিয়াছেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের ও বেদনার বিষয় এই যে, সেই ঠকার সংবাদ লোকলজ্জায় সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করিয়া ধরিয়া মনের পুঞ্জিত আক্রোশ মিটাইতে পারিতেছেন না। গেরুয়া যত স্থানে যত ভাবে সরলস্বভাব গৃহস্থকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে, তাহার বর্ণনায় গৃহস্থের আত্ম-মর্য্যাদায় বাধে। তাই, মনকে তাঁহারা কিছুতেই হালকা করিয়া লইতে পারিতেছেন না। শাস্ত্রবচনের উত্তাল সমুদ্রমন্থনের মধ্যে শ্রদ্ধার সহযোগ দিতে গিয়া লক্ষ্মী ইঁহারা পাইলেন না, পাইলেন কেবল পকেটমারের কাঁচির ঘা। তাই কাহারও টিকির অধিকার আস্ফালন দেখিলেই ইঁহারা সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন। ইঁহাদের এই অনবহিততাকে সর্ব্বক্ষেত্রেই ইঁহাদের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা বা দোষ মনে না করিয়া অনেক ক্ষেত্রে সেবাদানের অভিনয়কারীদের

কৃতকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলিয়াও ধরিয়া লইতে পার। কাহারও সদুদ্দেশ্যে কেহ বিশ্বাস করে না, সকলেই সকলকে চোর, বাটপাড়, ঠক, জুয়াচোর, মনে করিয়া মুখে মুখে কেবল ভদ্রতা রক্ষার অনুরোধে মিষ্টি কথার আশ্বাস বুনিয়া যায়, ইহা সত্য জানিয়া আত্মশক্তিতেই নির্ভর করিয়া পথ চল। ইঁহাদের অবজ্ঞা করিও না; কারণ, সময় আসিলে তাঁহারাই আসিয়া তোমার সকল কার্য্যের চূড়ান্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, আজ যাঁহারা তোমার হাতে হাত মিলাইতে অন্তরে কোনও প্রেরণাই অনুভব করিতেছেন না। সত্য, সেবা ও অকপটতা পরিণামে অবশ্যই জয়লাভ করিবে।"

গুরু-ভক্তির ফল

অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গুরুভক্তি অবশ্য সাধন-জীবনের উন্নতিলাভের এক অসাধারণ সহায়িকা। এক হিসাবে ইহাকে সাধন-জীবনের দৃঢ় ভিত্তিও বলিতে পার। এই ভিত্তি শিথিল হইলে সাধনে উন্নতি বড়ই কঠিন, বড়ই দুরূহ। গুরুবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস পথের অর্দ্ধেক বাধা-বিঘ্ন অনায়াসে হরণ করিয়া নেয়। গুরুভক্তির সহায়তায় অহমিকা নাশ পায়, দর্প-দম্ভ পলাইয়া যায়, চরিত্র নম্র, কোমল ও মধুর হয়। ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য সত্য। গুরু-ভক্তির ফলে গুরুর নিজের কিছু উপকার হউক আর না হউক, শিষ্য সত্য সত্যই লাভবান্ হন।"

নামের সেবায় আত্মনিয়োগের ফল

ঐ পত্রেরই শেষাংশে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি তোমাদের জন্য কোনও বিষয়ে আদেশ-বিধির নিগড় গড়িতে চাহি না। তোমরা একান্ত ভাবে নামের সেবায় আত্ম-নিয়োগ কর। তাহার মধ্য দিয়া শাশ্বত সত্যের সন্ধান পাইবে। যুগে যুগে মনুষ্য-সমাজের গঠনের পরিবর্ত্তন হয়, সামাজিক রীতি-নীতিরও পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন, পরিপ্রকর্ষ হয়, কিন্তু সকল যুগেই যিনি চিরস্থির, অটল, অচল, তিনি সব কিছু পরিবর্ত্তনের মূল। সেই মূলকে আশ্রয় করিয়া চল, যখন যেমন আবশ্যক হইবে, তেমন করিয়া বাহিরের সংসারে ও মনের পটভূমিতে পরিবর্ত্তনসমূহ হইতে থাকিবে। জগতে যে আপ্লব-বিপ্লব সত্য সত্যই আবশ্যক, তাহার জন্য তোমার বুদ্ধি শক্তি প্রয়োগের যত প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষাও তোমার দেহমনপ্রাণকে একমাত্র নিত্যসত্য ভগবানে লাগাইয়া রাখিবার প্রযত্নের প্রয়োজন অধিকতর। তাহারই ফলে আপনা আপনি নানা অবস্থাসমূহ সুযোগ-রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং তুমি তাহার মধ্যে নীরব নিরহঙ্কার ফলাভিসন্ধিহীন কর্ম্মযোগীর জীবন যাপন করিয়া অনেক ভগ্নতরীকে নিশ্চিত নিমজ্জন হইতে বাঁচাইয়া সহস্র সহস্র আরোহীর প্রাণরক্ষার কারণস্বরূপ হইবে। তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি-কৃতিত্ব নহে, তাঁহার অপার অহেতুক করুণাই তোমার দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিবে। তাঁহাতে একান্তভাবে

বিশ্বাসশীল হও, তাঁহাতে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ কর। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হও। সকল উদ্বেগ তাঁহারই চরণে সঁপিয়া নিজেকে কর পাশমুক্ত শিব, পাশবদ্ধ জীব হইয়া আর থাকিও না।"

তোমার জীবন তাঁহার সাম্রাজ্য হউক

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনকে কর ভগবানের লীলাভূমি। কোথায় আর বৃন্দাবন খুঁজিতে যাইবে, বৃন্দাবন যে তোমার অন্তরে। সেখানে রাজাধিরাজ-রূপে প্রেমের ঠাকুর-রূপে ভগবানকে কর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার মাধুর্য্য, তাঁহার করুণা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার কৃপা, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ সব এই হৃদয়খানাতেই হউক বিকশিত, বিম্বিত, প্রতিফলিত, প্রদীপ্ত। প্রাণের পরতে পরতে তাঁহার সুখ-সোহাগ, তাঁহার স্নেহ-পরশ তোমাকে করুক বিহ্বল, বিভোর, ব্যাকুলিত, তোমাকে করুক প্লাবিত, আহ্লাদিত, নন্দিত। তোমার জীবনের কৃতি তাঁহারই লীলার হউক প্রচারপত্রিকা, তোমার জীবনের স্মৃতি হউক তাঁহারই লীলার সুরভি। তোমার জীবন তাঁহার সাম্রাজ্য হউক, যেখানে স্বরাট্ হইয়া তিনি বসিবেন নিজ হৈম-সিংহাসনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমায়, আর তুমি তাঁহাতে-তোমাতে অভেদ জানিয়া নিজ কার্য্য, কর্ম্ম, চিন্তা, অনুভব, ভাব, মহাভাব সকল

কিছুতেই তাঁহার করিয়া যাইবে বিকাশ ও তাহারই দিয়া যাইবে ব্যঞ্জনা।"

জীবনের উন্নতি

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনে তোমার উন্নতি হউক। কিন্তু জীবনে উন্নতি বলিতে আমি কি বুঝি, তাহা কি জানো? চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সহস্র প্রলোভনের মধ্য দিয়াও বীরবিক্রমে চলিয়া যাইবার সামর্থ্য লাভ করিবার নাম জীবনে উন্নতি। ব্যাঙ্কে তোমার লক্ষ টাকা জমিয়াছে কিনা, তাহার সহিত প্রকৃত জীবনোন্নতির সম্পর্ক নাই। সদ্‌ভাবে থাকিয়া, অপরের অনিষ্ট না করিয়া বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরের ক্ষতি সাধন না করিয়া, সকলের হিতের মধ্য দিয়া নিজের জীবিকা-সংস্থানের দুর্জ্জয় সাহস ও শৌর্য্য যাহার লাভ হইয়াছে, আমার মতে জীবনের উন্নতি তাহার হইয়াছে। ভগবানের নামের সেবার মধ্য দিয়া নিত্য তাঁহাকে নূতন করিয়া আস্বাদন করার ও তাঁহারই অপার করুণার বিগলিত ধারার মধ্য দিয়া জীবনের কঠোর কঠিন সংগ্রাম অবিরাম পরিচালন করিয়া যাওয়ার যে ক্ষমতা, তাহাই জীবনের উন্নতি। সেই উন্নতি তোমার হউক, অবিরাম অবিশ্রাম আমি তোমার জন্য সেই আশীর্ব্বাদই প্রেরণ করিতেছি। যেই যুগে প্রায় প্রত্যেকটা মানুষ বিনা কারণে ইন্দুরের মত পরের ঘরের

বেড়া কাটিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, যেই যুগে বিনা প্রয়োজনে পরের পুত্রকন্যাগুলিকে ছারপোকার মত পিষিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলিয়া ব্যক্তিগত উন্নতির ষ্টীম-রোলার চালাইয়া যাওয়াই সভ্যতার লক্ষণ হইয়াছে, যেই যুগে আখমাড়া কলের মধ্যে সকল দরিদ্র ও দুর্ব্বলদিগকে চিপিয়া মারিয়া তাহাদের সকলের শরীর ও মন হইতে নিষ্কাশিত শোণিতধারা শুকাইয়া তাহা দিয়া ধনীর রম্য ভোজ্যায়োজনের শর্করা তৈরী হইতেছে, সেই যুগে আমি তোমার জীবনের উন্নতিকে তাহাদের সকলের পর্য্যায় হইতে আলাদা করিয়া দেখিতে চাহি। পশুরা যেই সময়ে স্বার্থের গর্জ্জনে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া বলিতেছে, 'জগদুদ্ধার করিতেছি', সেই সময়ে তুমি আত্মস্থ হও এবং তোমার সামান্য জীবনটীর অসামান্য আদর্শ দিয়া ইহাদের অন্তঃসারহীনতা প্রমাণিত কর।"

মা আমার চোখে মা

জনৈক পত্র-লেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার প্রথম দুইখানা পত্র পাইয়াও আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই মা। এই জন্য মনে কষ্ট নিও না। আমি মায়েদের নাম ও চেহারা কিছুই আলাদা আলাদা করিয়া মনে রাখিতে পারি না, ইহা আমার বাল্যকাল হইতেই আয়ত্ত এক অসাধারণ দুর্ব্বলতা। এই জন্যই তোমার পত্র পাইয়া প্রথম

তোমাকে চিনিতে আমার কষ্ট হইয়াছিল। কাহার রং কালো, কাহার রং গৌর, কাহার বয়স বিশ, কাহার বয়স পঞ্চাশ, কাহার দেহ স্থূল, কাহার তনু ক্ষীণ,—মায়েদের সম্পর্কে এই সকল পার্থক্যগুলি আমার একেবারেই মনে থাকে না। মা আমার চোখে মা, তাহার রূপ-গুণ, উচ্চতা-নীচতা, বয়স-বিদ্যা আদি আমার একেবারেই বিচারের বাহিরে থাকে। কেহ নিজে গরজ করিয়া নিজের দোষগুণের কথা না বলিলে আমি খোঁজ করিয়া কোনও মায়ের কোনও দোষগুণের বিষয় নিজে কখনও অনুসন্ধান করি না, তাহার জন্য মনে কোনও ঔৎসুক্য অনুভব করি না। একটী মা যদি আমার সহিত তিন শত মাইল পথও একত্র পথ পর্য্যটন করেন, তাহা হইলেও আমি যাচিয়া তাঁহার নাম, গোত্র, দেশ, জাতি আদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করি না। মা আমার কাছে মা, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট পরিচয়। আর এই কারণেই আমি একটী মাকে অন্যান্য মাদের হইতে আলাদা করিয়া মনে রাখিবার পক্ষে একান্তই অপটু। তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমাদের প্রতি আমার স্নেহশ্রদ্ধা নাই। তাহা গভীর বলিয়াই আমি একজনের মধ্যেই সকলকে দেখিয়া থাকি, তাই আলাদা আলাদা করিয়া তোমাদের সকলকে মনে রাখিতে সমর্থ হই না। ইহাকে অভিমানের দৃষ্টিতে কখনো দেখিও না এবং ইহা নিয়া মনঃকষ্ট পাইও না।

"আমি আমার জীবনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক সাধক দেখিলাম।

তাঁহাদের জীবনের ছোট বড় উত্থান-পতনের ইতিহাসও জানিলাম। দেখিয়াছি, যাঁহারা রমণী-বিশেষকে 'মা' 'মা' বলিয়া অধিকতর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, তাঁহারা পরিশেষে কোনও না কোনো দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে মায়ার জালে আটক পড়িয়া যান। তোমরা একদিকে যেমন মা, অপর দিকে তেমন মায়া। তোমরা প্রতিজনেই যে সাক্ষাৎ মহামায়া, তাহা মনে থাকে কয়জনের? তাই বিপদ ঘটে। আমি সকলকেই দেখিলে একই বিশ্বজননীকে তাঁহার মধ্যে নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করি, তাহার ফলে সকলের প্রতি আমার প্রাণের আবেগ সমভাবে বণ্টিত হইয়া যায়, কাহারও প্রতি অত্যধিক আবেগ এবং কাহারও প্রতি অত্যধিক বিরাগ প্রদর্শন করিবার কোনও হেতু সমুদিত হয় না। আবেগ বেশী কোথাও হইলেই কোথাও আবার অনাবশ্যক বিরাগও হইবেই, প্রকৃতির এই সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কে চলিতে পারে?

"আমি চাহি, তোমরা নিজেদের মধ্যেও জগতের সকলের প্রতি সমান ভাবে সন্তানভাবকে অনুশীলন করিয়া অন্তরের অনাবশ্যক আবেগ ও উচ্ছ্বাস বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা প্রেমকোমল নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক মধুর ভাব রক্ষা করিয়া চল। নিজেকে মা বলিয়া দাবি করা সহজ কথা নহে। মা হইবে সুন্দর, মা হইবে মধুর, মা হইবে পাপের পরপারে অবস্থিত প্রশান্ত জগতের অধীশ্বরী। মা সাজিয়া যাহারা কেবল মায়ার বিলাস বিস্তার করে, তাহারা মা নহে, মায়াবিনী রাক্ষসী। আমি চাহি না যে,

জগতের একটী রমণীও মা সাজিয়া সেই রাক্ষসীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক।

"তাই আমি প্রতিটী রমণীকে সমভাবে মায়ের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। শুনিয়াছি শৈশবে আমি সকলের কোলেই সমানে ঝাঁপাইয়া যাইতাম, একজনকেও আমার ভগবতী-সদৃশী গর্ভধারিণী জননীর চাইতে কম বা বেশী মনে করি নাই।"

আমি কারো প্রভু নই

অপর একজনের পত্রে উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি একটী কবিতা লিখিলেন,—

আমি ত' তোদের কহি নাই কভু,—
"আয় তোরা মোর কাছে,
আমার নিকটে অমৃত ছানিয়া
মহামঙ্গল আছে।"
তোরাই সকলে এলি দলে দলে
আমারে ঘিরিয়া সবে
আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
হরিনাম-কলরবে
পূর্ণ করিতে এই ধরণীরে
সাম্যের মধু-গানে
তোরাই আপনি লভিলি প্রেরণা
প্রতিজনে নিজ প্রাণে।

করি' বলাবলি কিবা জোরবলি
তোদের আনিনি আমি,
আমি ডাকি সদা শুধু একজনে
যিনি জগতের স্বামী।
তাঁর মাঝে আমি লভিয়াছি সব;—
তিনি ভাব, আমি বাণী;—
পরম রমণ করি অনুখন,
ভেদাভেদ নাহি জানি!
তোরা চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ালি
দেখিতে কি খেলা? তাই,
তোরা দর্শক, তোদের উপরে
আমার ত' দাবী নাই।
কিছু চাহি নারে, বলি বারে বারে
তবুও অবিশ্বাস?
কিছু চাহি নারে,—বল্ শুধু মোরে
কি আমার কাছে চাস?

তোরা কিরে চাস তোদের লাগিয়া
জীবন আমার দিব?
তোরা কিরে চাস তার বিনিময়ে—
প্রতিদান কিছু নিব?

আমি যে তোদের মাঝারে আমার
পরমদয়িতে দেখি,
তোদের সেবার মাঝারে আমার
প্রভুর মহিমা লেখি।
দিগ্‌দিগন্ত-বিস্তৃত মোর
বিরাট এ খাতা খানি,
পাতায় পাতায় তোদের মূরতি,
কত রংয়ে তুলি টানি।
সে কেবল কিরে এই ভাবি' মনে
তোরা হলি শুধু জীব?
তোদের ভিতরে আমার পূজার
আনন্দ-ঘন শিব
ঘন ঘন আজ ডমরু বাজায়
নাশিবে সবার পাপ
সৃজিতে নূতন শান্তির ধাম
নাশিতে সকল তাপ।
আমার দয়িতে তোদের মাঝারে
দেখিয়া অবাক্ হই,
ভাষাহীন প্রাণে মুগ্ধ নয়নে
কেবলি তাকিয়ে রই।
চির-সুন্দর সুন্দরতর
সুন্দরতম হয়ে

ভিতরে বাহিরে কতই খেলিছে
আমার আমারে লয়ে
হেথা অনাহত, হোথা সে রণিত,
হেথা লীলা, হোথা রূপ;
হেথা সঙ্গীতে কল-মুখরিত,
হোথা একবোরে চুপ্,
শব্দে, নীরবে, বিনয়ে, গরবে,
উল্লাসে, ক্রন্দনে,
ঊর্দ্ধগমনে, অধঃপতনে,
স্থিতিতে ও স্যন্দনে,
কত যে বিভূতি, কত যে বিলাস,
কত না বিবর্ত্তন,
কত যে ছন্দে, কত রাগিণীতে
অপরূপ নর্ত্তন।
সব শুধু যে রে একজনে ধ'রে;
শুধু একজনে প্রীতি
জাগায় জগতে কত রূপ, রস,
গন্ধ ও অনুভূতি।
তোদের জানিয়া তাঁহারি বিকাশ
তোদের পূজারি হই,
তোরাই আমার প্রভুর স্বরূপ,
আমি কারো প্রভু নই!

শিবপুর, ত্রিপুরা
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

নির্য্যাতক ও নির্য্যাতিত জাতি সমূহ

অদ্যও অপরাহ্ণ-ভ্রমণকালে নির্য্যাতিত জাতি-সমূহের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা যে সকল অবনত অবস্থাপন্ন জাতিকে নির্য্যাতিত জাতি ব'লে থাকি, তারা কেন কখন নির্য্যাতনের আস্পদ হ'ল, এই বিষয়ে প্রামাণ্য ইতিহাস সংগ্রহের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। কেননা, কারণ জানলে প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করা সহজ হয়। আঁধার ঘরে সাপ মারতে গিয়ে অনেক সময়ে ভ্রাতায় ভ্রাতায় লাঠালাঠি হ'য়ে থাকে, এরূপ দৃশ্য জগতে বিরল নয়। তবে, একটী মুস্কিল হচ্ছে এই যে, প্রামাণ্য ইতিহাস সংগ্রহ করাও কঠিন। যেসব গ্রন্থে প্রকৃত তথ্যের হয় ত' ছন্দাংশ ছিল, এমন গ্রন্থ কত হাজার বা কত লক্ষ যে এক সময়ে দগ্ধ হয়ে গেছে, তা' কেউ জানে না। আবার, ছাপাখানার যুগের ঠিক আগ পর্য্যন্ত যে সব গ্রন্থ অনুষ্টুপ্ ছন্দের জোরে শাস্ত্র ব'লে মর্য্যাদা আহরণ ক'রেছে, তাতে বিধৃত তথ্যের কতটা যে কৃত্রিম বা ভিত্তিহীন জনশ্রুতির ফল মাত্র, তাও নির্ণয় করা কঠিন কথা। যাদের আমরা নির্য্যাতিত ব'লে কৃপার চক্ষে দেখ্‌তে চাই, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত আদৌ নির্য্যাতিত নয়, হয়ত তাদের

মধ্যে কেউ কেউ অনার্য্য পরিবার থেকে স'রে এসে আর্য্যদের চক্ষের আড়ালে খিড়কির দরজা দিয়ে আর্য্যপরিবারে প্রবেশ করেছে এবং তাদের উপস্থিতিকে উপলক্ষ্য ক'রে আবার নানা প্রশ্ন, দাবী, বিচার, বিতর্ক ও আন্দোলন উপস্থিত না হয়, তার জন্য সহজেই চ'খে ঠেকে এমন স্তরে আসন দাবীই করে নি। ভারতভূমি আর্য্য, অনার্য্য, দ্রাবিড়ের এক আশ্চর্য্য মিলনভূমি। কি ভাবে এবং কেন যে কে কখন কার সঙ্গে কতটুকু মিশেছে, তার পরিচয় পাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এই আশ্চর্য্য মিলনকে আশ্চর্য্যতর ব'লে মানতুম, যদি এই মিলনের ফলে ছত্রিশ হাজার জাতির সৃষ্টি না হ'য়ে একমাত্র ব্রাহ্মণ-জাতিরই প্রসার হ'ত। কিন্তু যে যেভাবে বা যে কারণেই এসে এই জাতিভেদের জগাখিচুড়ীর ভিতরে প্রবেশ ক'রে থাকুক, বর্ত্তমান অবস্থায় একদল লোককে নির্য্যাতক এবং অপর দল লোককে নির্য্যাতিত ব'লে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আবার আমরা যাদের "নির্য্যাতিত" ব'লে আখ্যা দিচ্ছি, তাদের ভিতরে পরস্পরের মধ্যেও নানা ভাবে নির্য্যাতন চলেছে। একজন ব্রাহ্মণ একজন কপালীকে নিয়ে এক পংক্তিতে খেতে বসবে না, এ যেমন সত্য, কপালী জাতির নামের সাথে এক নিঃশ্বাসে তুমি যদি নমঃশূদ্র নামটী উচ্চারণ কর, তা'হলে তাতেও একজন শিক্ষিত কপালীর ছেলে রুষ্ট না হ'য়ে ছাড়্‌বে না, একথাও প্রায় তেমন সত্য। তথাকথিত 'নির্য্যাতক' জাতি 'নির্য্যাতিত' জাতির সঙ্গে ভোজনের পংক্তি বিচার করে, আর তথাকথিত এক

'নির্য্যাতিত' অপর 'নির্য্যাতিতে'র সঙ্গে একত্র নামোচ্চারণের কালে ভাষার পংক্তি বিচার করে। বাঁশের উচ্চ থেকে নীচ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটা পাবে ঘূণে ধরেছে, এই হচ্ছে তোমার সমাজের প্রকৃত অবস্থা। কি ভাবে কিসের প্রতীকার কর্‌বে বল?

ভগবানে নির্ভর ও সদুপায়ের সদ্ব্যবহার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু তথাপি প্রতীকার কত্তে হবে। মহম্মদের একজন অনুগামী সৈনিক তার উটের লাগাম খুলে দিয়ে বলেছিল,—"'দড়ি ত' দিচ্ছি খুলে, এখন ভরসা হচ্ছেন ভগবান"। তখন হজরত মহম্মদ বলেছিলেন,—"না, উষ্ট্রটীকে শক্ত ক'রে আগে বাঁধো এবং তার পরে তার ভরসা ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও।" অলিভার ক্রমওয়েল তাঁর বিখ্যাত 'আয়রণ্‌-সাইড' সৈন্যদের নিয়ে রাজপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার আগের দিন প্রদোষে নিজ সৈন্যদের সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন,—"Trust in Providence but keep your powder dry, ভগবানেই কর নির্ভর, কিন্তু বারুদ রাখ শুষ্ক, যেন কাজের সময়ে গুলি ছুড়তে দেরী না হয়।" কিন্তু তোমরাও ভগবানের উপরে নির্ভর রাখ এবং হাতের কাছে যতগুলি সদুপায় আছে, সবারই সদব্যবহার কর।

উপায়বন্তের সহিত হৃদয়বন্তের যোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেকেরই হাতে সুযোগ, সুবিধা, উপায় আছে কিন্তু সেগুলিকে মহৎ লক্ষ্যে প্রয়োগের রুচি নেই। অনেকের অন্তরে ব্যাপক পরিকল্পনা এবং উচ্চ লক্ষ্য রয়েছে, কিন্তু তাতে পৌছুবার উপায় হাতে নেই। উপায়বন্তের উপায়কে হৃদয়বন্তের হৃদয়ের সাথে মিলিয়ে দেবার চেষ্টাই তোমাদের পক্ষে এক মস্ত কাজ হবে। নিজে যদি নমঃশূদ্রের ঘরে জন্ম নিতে না পার, তাহ'লে হয়ত নমঃশূদ্রদিগকে তুমি ঠিক্ ঠিক্ বুঝ্‌বে না অথবা তোমার কথা তাদের বুঝাতেও পার্ব্বে না। তুমি যদি কপালীর ঘরে গিয়ে কপালী-পিতার ঔরসে আর কপালী-মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ কত্তে না পার, তাহ'লেও হয়ত ঠিক্ সেই অবস্থাই হবে। কিন্তু জন্মে গেছ ব্রাহ্মণের ঘরে, পতিত ব'লে অবজ্ঞাত বা হীন-যাজী ব'লে অনাদৃত ব্রাহ্মণের ঘরে নয়, একেবারে বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণের ঘরে। একবার কোনো প্রকারে না মর্‌তে পারলে ত' আর নমঃশূদ্রের বা কপালীর ঘরে জন্ম নিতে পার্ব্বে না। সুতরাং নির্য্যাতিত বা অবজ্ঞাত যে সমাজের উন্নতি-সাধনে যত্ন নিতে চাও, সেই সমাজে জন্মপ্রাপ্ত নরনারীর ভিতরে মহৎলক্ষ্য নির্দ্ধারণের যোগ্য পাত্রগুলিকে খুঁজে বের ক'রে তাদের চেষ্টা ও যত্নের সাথে উপায়বন্ত ব্যক্তিদের সহযোগ

স্থাপন ক'রে দাও। এইটী একটী অত্যুত্তম কর্ম্মপন্থা, জানবে।

কপালী বড়, না নমঃশূদ্র বড়

একজন প্রশ্ন করিলেন,—কপালী বড়, না নমঃশূদ্রেরা বড়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে বড়'র কাজ কর্ব্বে, সেই বড়। আজকাল যদি এদের কাজের খোঁজ নিতে যাও, তবে দেখ্‌বে কপালীও কৃষিজীবী, নমঃশূদ্রও কৃষিজীবী। সুতরাং জীবিকার হিসাবে দু'জনেই সমান। একটা আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের প্রয়োজন পড়্‌লে দেখ্‌তে পাবে যে, নমঃশূদ্রেরা কটাক্ষের ইঙ্গিতে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে যায়, কপালীদের বা হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনও ছোট বা বড় উপজাতির মধ্যে ঐক্যের এই আশ্চর্য্য শক্তি বল্‌তে গেলে কোথাও নেই। সুতরাং এই হিসাবে নমঃশূদ্রেরা বড়। তারা শুধু নিজেদের পল্লীরই শান্তি রক্ষা করে, তা নয়, প্রয়োজনের স্থলে পাঁচ দশ মাইল দূরে গিয়ে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য থেকে সুরু ক'রে ধোবা, নাপিত, মুচি, মেথর, সকলের বৌ-ঝির মান-প্রাণ রক্ষা ক'রে আসে। এই হিসাবে নমঃশূদ্রেরা ত' সমগ্র হিন্দু-সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু একজন কপালীকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে, কে বড়, উত্তর নিশ্চয়ই পাবে যে, কপালীরা নমঃশূদ্রের জল খেতে ঘৃণা বোধ করে, কারণ, কপালীরা বৈশ্য, পতিত-বৈশ্য নয়, একেবারে খাঁটি বৈশ্য। আবার একজন নমঃশূদ্রকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে, কে বড়, সে নিশ্চিতই উত্তর দিবে যে, তার

শরীরে অল্প হ'লেও ব্রাহ্মণের রক্ত র'য়ে গেছে, কপালীরা যত বড়ই হোক্ বৈশ্য ছাড়া ত' কিছুই নয়, সুতরাং নমঃশূদ্ররাই বড়।

কপালী কথার মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু কপালী শব্দের মানে কি? কপাল বল্‌তে বুঝায় মাথার খুলি। মাথার খুলি যিনি ধারণ করেন, তিনি হচ্ছেন কপালী। অর্থাৎ কপালী মানে শিব, ভারতের আদর্শ যোগী শাশ্বত-ভিখারী কপালী। সুতরাং সুরেন্দ্র কপালী যদি হয় কারো নাম, তবে বুঝ্‌তে হবে যে, এর মানে হচ্ছে, সুরেন্দ্র হচ্ছেন মহাদেব, সুরেন্দ্র হচ্ছেন সাক্ষাৎ যোগেশ্বর পার্ব্বতীপতি। যিনি হচ্ছেন স্বয়ং মহাদেব, তিনি কার চেয়ে বড় আর কার চেয়ে ছোট, সে প্রশ্নটাই ত' অবান্তর। জগতে কোন্ ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি মহাদেবকে পূজা কত্তে আপত্তি কর্ব্বেন? আজকাল কপালীদের দেখা যাচ্ছে, সরকার, চৌধুরী, রায় প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ ক'রে কপালী শব্দটাকে প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা কত্তে। এর ফল মাত্র এই হ'তে পারে যে, উপাধিটা শুনে প্রথম চোটে কেউ ধর্‌তে পারবে না যে, এটী কপালীর বংশে জাত, না অন্য বংশে জাত। এর বেশী আর কিছুই লাভ হবে না। কিন্তু প্রত্যেক কপালী-সন্তানের ভিতরে আর্য্যশ্রেষ্ঠের তপস্যা ঋষি-বরিষ্ঠের সাধনা প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠুক, বৈশ্য বলে গর্ব্ব না ক'রে বা বৈশ্যত্বের দাবী নিয়ে শাস্ত্র-বচনের লড়াই না চালিয়ে তাঁরা ব্রাহ্মণেরও বরণীয় রূপে

আত্মপ্রকাশ করুন,—এই ত' হবে সর্ব্বথা কাম্য। ব্রাহ্মণ হ'তে গেলেই কৃষি ছাড়্‌তে হবে, সাংসারিক কর্ত্তব্যে উপেক্ষা কত্তে হবে, এ কথার কোনো মানেই নেই। রাজর্ষি জনক কি ব্রাহ্মণের ছেলে, না, ক্ষত্রিয়ের ছেলে, এ নিয়ে কারো মনে কখনো বিন্দুমাত্র কৌতূহল পর্য্যন্ত জাগে না, সংসারের সহস্র কর্ম্ম ক'রেও তিনি তাঁর ঋষিত্বকে এমন বিকাশই প্রদান করেছিলেন। কপালীরা যদি প্রত্যেকে মহাদেবের মতন হ'তে চেষ্টা করেন, তা হ'লে "কপালী" নামটাই "রাজর্ষি জনকের" নামটার মত একটা অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণের দিব্য সৌরভ পাবে।

নমঃশূদ্র শব্দের মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নমঃশূদ্র শব্দেরই বা মানে কি? শূদ্রানাং নমস্য ইতি নমঃশূদ্র। শূদ্রের যিনি পূজনীয়, তিনি হচ্ছেন নমঃশূদ্র। অর্থাৎ ইনি শূদ্র কিছুতেই নন। শূদ্রই যদি নন, তা হ'লে ব্রাহ্মণ হবার চেষ্টাই তাঁর পক্ষে বৈধ। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া তৃতীয় কোনও বর্ণের কি কার্য্যতঃ কোনও অস্তিত্ব আছে? একদল লোক ব্রাহ্মণাচারী, অপর দল লোক শূদ্রাচারী। এ ছাড়া তৃতীয় কোনও আচারের লোক আজকাল ভারতবর্ষে দেখ্‌তে পাওয়া যায়? তাই যদি হয়, তাহ'লে ক্ষত্রিয়াদি পরিচয় দিয়ে নিজেদিগকে ব্রাহ্মণের দাসরূপে প্রতিষ্ঠিত করায় লাভ কোথায় এবং লাভ কি? সেদিন একজন প্রবীণ বক্তা কল্‌কাতার

এক বিখ্যাত সভাতে বল্‌ছিলেন যে, নমঃশূদ্রেরা হচ্ছেন হিন্দুজাতির ইজ্জতরক্ষক ক্ষত্রিয়। আমি বলি ব্রাহ্মণ পরশুরাম কি প্রয়োজন হ'লে ইজ্জতরক্ষা কত্তে পারেন না? সুতরাং নমঃশূদ্রদের ক্ষত্রিয় ব'লে আখ্যা দিয়ে ব্রাহ্মণের পাদোদকসেবী ক'রে রাখার কোনো সার্থকতা নেই। অবনতের ভিতরে যখন উন্নতি লাভের আগ্রহ সত্য সত্যই স্ফুরিত হচ্ছে, তখন প্রত্যেকের আদর্শ হোক্ ব্রাহ্মণত্ব, প্রত্যেকের লক্ষ্য হোক ব্রাহ্মণত্ব, প্রত্যেকের গতি হোক ব্রাহ্মণোচিত এবং গন্তব্য হোক ব্রাহ্মণত্বে। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মীমাংসা পরিণামে সন্তোষজনক হবে না। অবশ্য হিন্দু জাতির একটা মস্ত সভা ক'রে তাতে যদি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিই যে, হিন্দু মাত্রেই ব্রাহ্মণ, তা হ'লেই যে কাজ হ'য়ে গেল, একথা মনে করা অনুচিত হবে। সভা-সমিতিতে প্রস্তাব পাশের সঙ্গে জাতির প্রকৃত উন্নয়নের সম্পর্ক অতি অল্প। ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভাকে প্রত্যেক অনুন্নত সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার যে যুগ-যুগ-ব্যাপী তপস্যা, তাই আজ প্রয়োজনীয়। নমঃশূদ্রেরা শুধু "শূদ্রানাং নমস্যাঃ" না হ'য়ে "ব্রাহ্মণানাং নমস্যাঃ"ও যাতে হ'তে পারেন, সেই ব্যবস্থা গ্রহণের আশু প্রয়োজনীয়তার দিকে তোমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

যোগী শব্দের মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যোগী শব্দেরই বা মানে কি? যিনি যোগসাধক, ভগবানের সাথে নিজের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মে যোগ রক্ষা করেন, জীবাত্মাকে জ্ঞানবলে, ভক্তিবলে,

সাধনবলে নিয়ত পরমাত্মায় সমাহিত রাখেন বা রাখতে চেষ্টা করেন, তিনিই যোগী। যোগীদের মধ্যে যোগীশ্বর মহাদেবই শ্রেষ্ঠ, এইজন্য অনেক যোগি-জাতীয় লোককে "শিব" উপাধি ব্যবহার কত্তে দেখা যায়। যিনি যোগযুক্ত, তিনি নিজ ইন্দ্রিয়-নিচয়ের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন কত্তে সমর্থ হন, তিনি চিত্ত-ভাবসমূহের উপরে নিজ স্বামিত্ব বা নাথত্ব স্থাপন করেন এবং বিশ্বনাথের সঙ্গে তিনি নিজ অভেদত্ব উপলব্ধি ক'রে কৃতকৃত্য হন। এই জন্যই যোগি-জাতীয় অধিকাংশ লোককে "নাথ" উপাধি ব্যবহার কত্তে দেখা যায়। সুতরাং এই যোগি-জাতি যদি ব্যাপক ভাবে প্রত্যেকে ব্রাহ্মণত্বের সাধনা নিজ নিজ জীবনে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলার যত্নে যত্নবান্ হন, তাহ'লে এর চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে? ব্রাহ্মণত্ব-লাভই আজ জগতের সকলের আদর্শ হোক, এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কামনা করতে আমার মন চাইছে না।

অবনত সম্প্রদায়-সমূহের জাতিগত অন্ধ গোঁড়ামি

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—আপনি কপালী, নমঃশূদ্র, যোগী প্রভৃতি জাতির সম্পর্কে বড়ই উদার অভিমত প্রকাশ কচ্ছেন। এরূপ অভিমত প্রকাশ কত্তে আর কাউকে দেখি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—উদার বল্‌ছ ত'! কিন্তু আমি যে একই নিঃশ্বাসে এই তিনটা জাতির নাম উচ্চারণ

করেছি, এই অপরাধে হয় ত' ভবিষ্যতে দেখবে যে, জাতিবিশেষের মহাসম্মেলনে আমার এই অন্যায় কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে কঠোর প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং সেই জাতিভুক্ত ব্যক্তিরা বা তাঁদের পুরুত ঠাকুরেরা গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছেন। আমি নির্য্যাতিতের পক্ষ সমর্থন কর্ল্লে কি হবে বাছা, এক নির্য্যাতিত যে অপর নির্য্যাতিতের নাম শ্রবণেও অপমান বোধ করেন। এঁদের প্রায় প্রত্যেকের সাম্প্রদায়িকতাবোধ, স্ব-সামাজিকতাবোধ, জাতিগত অন্ধ-গোঁড়ামি এমন সপ্তমে বাঁধা, এদের মনোবৃত্তি এমনি Highly Strung (চড়া পর্দ্দায় অবস্থিত) যে, এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির নামোচ্চারণ কর্ল্লেও ইথার-তরঙ্গ অশুদ্ধ হ'য়ে যায়। তবু কি করবে হে বাছা, এমনই এক অধঃপতিত দেশে যখন জন্মেছ, তখন এই সব অপদার্থদের জন্যই খেটে মরতে হবে। কারণ উপস্থিত ক্ষেত্রে এ ছাড়া তোমার ত' আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্যও নেই।

আশীর্ব্বাদের জন্য যোগ্যতা-লাভ

জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পত্রের পর পত্রে কেবল আশীর্ব্বাদই প্রার্থনা করিতেছ। আমিও তোমাকে সত্য সত্যই প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদও করিতেছি। কিন্তু যাহাতে এই আশীর্ব্বাদের যোগ্য হইতে পার, তাহার জন্য তুমি কিছু করিতেছ কি? সূর্য্য হইতে অবিরাম

কিরণ বর্ষিত হইতেছে। পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনায়ই তাহা শীতে আর্ত্তত্রাণ করিতেছে, অপরিচ্ছন্ন স্থানে হয়ত কীটের কুশল হইতেছে কিন্তু তোমার লাভ আসিতেছে না। আশীর্ব্বাদ নাও এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপযুক্তও হইতে চেষ্টা কর।"

মতবাদ ও আচরণ

অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সকল লোকেরই নিজ নিজ মত প্রচারের অধিকার আছে। অতি অপদার্থ মতবাদও অনেকে দুঃসাহস করিয়া প্রচার করিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ নিজ মতবাদ প্রচারের জন্য অতি ঘৃণিত, নিন্দনীয় ও কুটিলতার কদর্য্য পথ ধরিয়াছে। ইহাদের দিকে তাকাইবারও তোমার প্রয়োজন নাই। ইহাদের সম্পর্কে নিন্দা-প্রশংসার ঊর্দ্ধে বিরাজ কর। তোমরা তোমাদের নিজস্ব আদর্শবাদকে কি ভাবে জীবনের আচরণে প্রতিষ্ঠিত ও পরিস্ফুট করিতেছ, কেবল এই একটী মাত্র দিকে লক্ষ্য দাও। আদর্শ-প্রচারকারীকে আদর্শনিষ্ঠ হইতে হইবে। বিশ্ববিস্ময় মহাবলের ইহাই উৎস। ভুবন-প্রতাপী মহাজয়ের ইহাই কৌশল।"

ভাব, ভাষা ও মন্ত্র

অপর এক জনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভাবটার জন্যই ভাষা, ভাষার জন্য ভাব নহে। কে কোন্ ভাষায় কথা কহিল, তাহা বড় কথা নহে, কে কি ভাবটাকে ব্যক্ত করিল, তাহাই বড় কথা। বড় বড় চিন্তা যখন ভাষার মাধ্যমে প্রকটিত হয়, তখন অতি নিকৃষ্ট ভাষাও উৎকৃষ্টের মর্য্যাদা লাভ করে। গ্রাম্য বাউল যখন তাহার অতি অসম্পূর্ণ ভাষায় অতীন্দ্রিয় জগতের কথা কহিয়া গান ধরে, তখন তাহা বেদশাস্ত্রের দেবগণনন্দিত সুপ্রাচীন সংস্কৃতের মর্য্যাদা লাভ করে। গুরু নানক শিখদের জন্য মন্ত্র রচনার কালে ভুল সংস্কৃত লিখিয়াছিলেন, এই জাতীয় অভিযোগের প্রকৃত ভিত্তি কোথায়? মন্ত্র কি তাহার ভাষার জন্য শ্রদ্ধিত, না ভাবের জন্য? ভাবকে লক্ষ্য করিতে শিক্ষা কর, ভাষার মারপ্যাঁচ নিয়া কলহ-কচায়ন থামিয়া যাইবে। ব্যাকরণের পণ্ডিতেরা সাধারণ লোকদের নির্ভুল ভাষাশিক্ষার সুনিশ্চিতই সহায়ক এবং এই জন্যই সম্মানার্হ ব্যক্তি, কিন্তু মানুষ অসাধারণ হইয়াছে চিরকাল তাহার ভাবের অসামান্য উচ্চতা ও অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা দিয়া। এই উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠতা যাঁহার ভাবের মধ্যে আছে, তিনি সাধারণ মানুষ নহেন, তাই তাঁহার অশুদ্ধ ভাষা বৈয়াকরণিকের শাস্ত্র-পরিধি লঙ্ঘন করিয়া আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া সম্মানিত হয়। ভাষা যেমন মতবাদ প্রচারের বাহন, তেমন উপলব্ধ সত্যেরও বাহন। প্রথমোক্ত স্থলে ভাষা বাহন মাত্র, তাহার অন্য মর্য্যাদা নাই, শেষোক্ত স্থলে ভাষা মন্ত্র এবং তাহা কেবল ভাবেরই বাহক নহে, তাহার উপরে মনন চালাইলে সে মনের ত্রাণদাতা গুরু।"

শিষ্যের দুর্বিনয় ও গুরুর ক্ষমা

শ্রীহট্ট-সাতগাঁও-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুর্বিনীত শিষ্যকে গুরুদেব যদি দৃষ্টান্ত শুনাইতে যান যে, কতকত শিষ্য গুরুর অসীম অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করার পরেও নম্র, বিনীত অদোষদর্শী মনে গুরুর আদর্শকে সেবা-দান করিয়া তাঁহার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইয়াছে, তাহা হইলে অহংপ্রমত্ত অজ্ঞান শিষ্য মনে করিবে যে, ইহা হইতেছে গুরুদেবের কথার চালবাজি, জোর করিয়া মানুষের উন্নত শিরকে তাঁর পদতলে নত করার ইহা কৌশল, একদল সুচতুর পরপিণ্ডোপজীবীর ব্যবসায় চালু রাখিবার ইহা ফন্দী। সুতরাং বিজ্ঞ ও বিবেচক গুরু তামসিক ভাবাচ্ছন্ন শিষ্যকে 'বিনয়ী হও, নম্র হও, সেবা পরায়ণ হও, ত্যাগ স্বীকারে সমর্থ হও, অহংবুদ্ধির অভ্রংলিহ চূড়াকে নামাইয়া সাগরের জলে ডুবাও',—ইহা বলার প্রয়োজন থাকিলেও কেবল কাল-প্রতীক্ষায় চুপ মারিয়া থাকেন। কিন্তু শিষ্যের বিনয় তাহার আধ্যাত্মিক সাধনকে প্রগাঢ় করে,—দুর্বিনীত শিষ্যের সাধন প্রগাঢ় হয় না। প্রকৃত গুরুর ক্ষমাশীল না হইয়া উপায় নাই। মুখে প্রয়োজন মত একটু রুক্ষ রুদ্রভাব কখনো প্রদর্শন করিলেও গুরু-হত্যার জন্য বদ্ধপরিকর পাপিষ্ঠ শিষ্যকেও তিনি ক্ষমা না করিলে কে করিবে? অন্যে কটুকথা বা অপমানজনক বাক্য সহিবে না। এমন কি মাতা-পিতার মত আত্মীয়তমেরাও নহে। কিন্তু গুরু যে সকল আত্মীয়ের চাইতে অধিক আত্মীয়! তাই তিনি সব সহিবেন। গুরুর গলা কাটিবার জন্য যে শিষ্য ছুরি শানাইতেছে, তিনি তাহাকেও অন্তরের অন্তরে ক্ষমা করিবেন, ক্ষমা-প্রার্থী হইল কি না হইল, তাহার বিচার গুরু করিবেন না। শত অপরাধ করিয়াও ক্ষমা না চাহিয়া এই একটী স্থানে চিরকাল ক্ষমা মিলিবে। লৌকিক প্রয়োজনে বাহ্য আচরণে যদি কঠোরতা প্রকাশও পায়, আত্মিক প্রয়োজনে অন্তরের অন্তরে তিনি চির-প্রেমময় পরম ক্ষমাশীল সদ্‌গুরু। অপরাধ করিয়া বা না-করিয়া তাঁহার নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী হইলে ত' হিমালয়ের তুষার-কিরীট নিমেষে গলিয়া করুণার গঙ্গাধারায় পরিণত হইয়া তরতর বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। ধরিত্রীকে বলা হয় সর্ব্বংসহা। গুরু কোটি ধরিত্রীর ক্ষমা একত্র নিজের ভিতরে ধারণ করিয়া আছেন। সুতরাং আশ্বস্ত হও।"

নিজের কাছে খাঁটি থাক

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাঁহাদের সেবার জন্য যত অধিক প্রয়াস প্রয়োগ করিবে, তাঁহারাই হয়ত তোমাকে তত অধিকতর অবহেলা-পরায়ণ বলিয়া প্রচার করিবেন। যাঁহাদের দোষ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য যত অধিক চেষ্টা করিবে, তাঁহারাই হয়ত তোমাকে তত

অধিক পরনিন্দক বলিয়া কলঙ্কিত করিয়া মানুষের সামনে ধরিবার প্রয়াস পাইবেন। যাঁহাদের প্রতি তোমার সেবাবুদ্ধি যত অকপট ও স্বার্থলেশহীন হইবে, তাঁহারাই হয়ত তত কপটতার ও স্বার্থপরতার অভিযোগ তোমার স্কন্ধে চাপাইবেন। কিন্তু কর্ত্তব্য সকল অবস্থাতেই কর্ত্তব্য, ইহা তোমাকে পালন করিয়াই যাইতে হইবে।

"উপকৃত হইয়া তাহা অস্বীকার করিব, সেবা পাইয়া তাহাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিব, প্রশংসনীয় কাজকে প্রশংসা করিতে মনে কুণ্ঠা বোধ করিব, অপরের সহৃদয়তার সদাশয়তার ফলে প্রাপ্ত সুবিধাকে নিজের প্রাপ্যমাত্র-লাভ বলিয়া ধারণা করিব,—এই সকল হইতেই সংসারের প্রতিটি অশান্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

"মানুষ যদি অকৃতজ্ঞ না হইত, তাহা হইলে অধিকাংশ সংসারে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবার অবকাশই পাইত না। কিন্তু অহংপ্রমত্ত মানবকে কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দেবে কে? বর্ত্তমান সভ্যতা ত' ইহার পরিপূর্ণ পরিপন্থী। এখানে শুধু বলেরই মহিমা। যার যত বল, তার তত অধিকার। সমস্ত জগৎ জুড়িয়া যখন আগুন ধরে, তখন তাহাকে নিবাইবে কে? একটী গৃহ, দুইটি সংসার আগুনে পুড়িতেছে দেখিলে বরং ছুটিয়া গিয়া তাহা নিবাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। তাই, বিশ্বব্যাপী এই বিরাট বিশাল অপার অতুল দাবানলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কেবল নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাও। নিজের

কাছে নিজে খাঁটি থাক যে, তুমি কাহাকেও তাঁহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত কর নাই, বনের উদ্ধত পশুরাজকেও না, তৃণকোণে আত্মগোপনকারী ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গকেও না। সমস্ত ধরিত্রী দহিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউক, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য-পালনের আত্মপ্রসাদ যেন তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে না পারে।

"প্রশংসা, সমর্থন, উৎসাহ, সহানুভূতি, সমবেদনা আদি কিছুই তোমার কাহারও কাছে প্রাপ্য নহে, তোমার প্রাপ্য তোমার নিজের কাজের দ্বারা বিমল আত্মপ্রসাদ। নির্ভয়ে অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য-পালন হইতেই ইহা লাভ হয়, ইহা লাভের অন্যতর কোনও পথ নাই।"

হও রে সাধনশীল

ত্রিপুরা-নন্দীপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হও রে সাধনশীল, হও রে ভজনশীল
হও রে মননশীল সত্যে,
নামে রুচি-পরায়ণ, ভগবান্-মুখি-মন,
বিরক্ত অখিল কুপথ্যে।

আবিল অহিত যত ভাবনায় সুবিরত
রহিয়া আহর শুধু শুদ্ধ

পবিত্র ভাব-রাশি যাহার প্রভায় হাসি'
অন্তর হবে প্রতিবুদ্ধ।

পঙ্কিল চিন্তায় যেন না সৃজন পায়
নিতি নব সর্পিল শঙ্কা,
নিষ্কাম আয়োজনে নিষ্পাপ দেহমনে
বাজাও রে বিজয়ের ডঙ্কা।

ডুবিরা গভীরতম নিষ্ঠায় প্রিয়তম
প্রাণের জনেরে জানি' পূর্ণ—
স্বরূপ আপন চিনি'—অভিন্ন তুমি তিনি—
ক্ষুদ্রতা কর রে বিচূর্ণ।"

উপলব্ধি

নোয়াখালি জেলান্তর্গত জায়াগ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার নিজের প্রাণের মাঝারে
জাগুক সে উপলব্ধি
পরশে যাহার সারা সংসারে
উথলিয়া ওঠে অব্ধি।

উদ্বেল তার তরঙ্গ-মালা
বহাক্ প্রেমের বন্যা,
ধুয়ে যাক্ যত মরমের জ্বালা,
ধরিত্রী হোক্ ধন্যা।

অভিমানহীন সেবক হইয়া
কর-যুগ যেন নিত্য
স্বানুভূত যত সত্য ঢালিয়া
ভরে বিশ্বের চিত্ত।

তোমার সত্য নহে ত' তোমার,
ওরে! অনন্ত সৃষ্টি,—
পাইতে ইহারে চাহে আপনার
বক্ষে-ব্যাকুল-দৃষ্টি।"

সবারে আপন করা

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত গৌরীপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সবারে আপন করা হবে যার সাধনা,
সবার আপন যিনি তাঁহারি আরাধনা
করিতে হইবে তার দিবসে কি নিশীথে,
নিদাঘে, বর্ষা-শীতে, সদলে ও নিভৃতে।

বিশ্রাম করিবার
নাহি তার অধিকার
যত দিন বুকে টানি' না পারিল আনিতে।
ছোট-বড়-দীন-ধনী-অজিত-পরাজিতে।
"না বুঝিয়া কে কোথায় দিতে এল বাধা রে,
তাই দেখি, ঘুরিবি কি সংশয়-আঁধারে?
কুপিত রুষ্ট অহি, হিংসক পশুকুল,
শত্রু কেহই নহে,—শুধু বুঝিবার ভুল;
তারে জানি' আপনার,
দ্বিধা কর পরিহার,
আড়ালে দাঁড়িয়ে শিব,—সুমুখে দেখ ত্রিশূল।
মরণের আতঙ্ক? সে তো অমৃতের মূল।

"বিশ্বের যিনি প্রাণ, ভালবাসি' তাঁহারে
প্রেমের দেউটী জ্বালো হৃদয়ের দুয়ারে।
এক প্রাণে কোটী প্রাণ আপন করিয়া লও।
এক প্রাণে কোটী প্রাণ চির আপনার হও।
কারে কর উপহাস
ঘৃণা ও অবিশ্বাস
অনাস্থা, অবিচার?—ভূষণ করিয়া লও
উহাদেরি তরে তুমি সব অনাদর সও।
"বিরোধে যাইব নারে, করিব না কলহ।

আপনারে পর ভাবা নিদারুণ অসহ!
করিব না মিছামিছি কুকথার' বিনিময়,—
সে তত অটুট থাকে, যে যত অধিক সয়!
মিথ্যার অপঘাত
নিন্দার অমা-রাত
ক্ষণিক অসত্য রে,—কভু শাশ্বত নয়।
সবল হৃদয় মম নিখিল বিশ্বময়
সবারে আপন জানি' মরণ করিবে জয়।"

সঙ্ঘ ও আদর্শ

শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সহযোগিতা চাই আপ্রাণ। ইহার ভিতরে এক কণা কৃপণতা থাকিবে না। প্রতিজনের সর্ব্বশক্তি দিয়া সকলের সম্মিলিত সামর্থ্যে কল্পনাতীত ঐশ্বর্য্যসম্ভারে ভরিয়া তুলিবে সঙ্ঘের প্রাণ-প্রাচুর্য্যকে, ইহাই থাকিবে একাগ্র লক্ষ্য। মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে লইয়া যাহার আরম্ভ, শত শত জনকে লইয়া হইবে তাহার গতি এবং কোটী কোটী জনকে তাহার অন্তরঙ্গ অনুগতরূপে পাইয়া সে তাহার পূর্ণ পরিণতির অনন্ত পথের করিবে যাত্রা-সূচনা,—ইহারই নাম সঙ্ঘ। চরিত্রের গুণে, নিষ্ঠার গুণে, দৃঢ়তার গুণে, একতার গুণে ক্ষুদ্র কয়েকজনের মিলন-স্থান বৃহৎ বৃহৎ লক্ষ লক্ষ জনের আবির্ভাব-তীর্থ রূপে পরিগণিত

হইবে,—ইহারই নাম সঙ্ঘ। চরিত্র বলই বল। ঐক্য বলই বল। নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের শক্তিতে, অপরাজেয় পৌরুষ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের মহিমায় প্রতি দুশ্চরিত্রকে সচ্চরিত্র করিয়া, প্রতি দুর্ব্বলকে সবল করিয়া, প্রতি আত্ম-অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসবান্ করিয়া সম্মুখের পর্ব্বত-প্রমাণ বাধাকে চূর্ণ করিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে হইবে। ইহারই জন্য চাই সঙ্ঘ। লক্ষ্য তোমাদের মহৎ কিন্তু চেষ্টা হইবে দৃঢ়। আদর্শ তোমাদের বিশাল, কিন্তু তাহাকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য সঙ্কল্পের অনমনীয়তা চাই অতুলন। কথায় কথায় আপোষের মনোবৃত্তি লইয়া কেহ কখনও মহৎ লক্ষ্যকে করায়ত্ত করিতে পারে না। ভুলকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিবার সৎসাহস না থাকিলে কেবল লোকের রুষ্টি-তুষ্টির পানে তাকাইয়া পথ চলিলে চলিবে না। মুষ্টিমেয় কয়েকটী প্রাণী মিলিত হইয়াছে। পূর্ণ সাফল্যের মধ্য দিয়া এই মিলনের সার্থকতা প্রমাণিত হউক। যাহারা সঙ্কল্প করে যে, লক্ষ্যে না পৌছিয়া কিছুতেই থামিবে না, এমন গুটি কয়েক লোক মিলিয়া জগতে কোন্ অসাধ্যকে সাধিতে অক্ষম? তাহাদের নিকটে কোন্ অসম্ভব দীর্ঘকাল শক্ত মাথায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিবে যে, সে নত হইবে না। নিজেদের দ্বারা স্বেচ্ছায় গৃহীত পবিত্র দায়িত্বের গুরুত্ব কখনও বিস্মৃত হইও না। নিজ চরিত্র গঠন কর আর তোমরা প্রতিজনে দাবানলের মতন করিয়া প্রাণে প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন ছড়াইয়া দাও। একটী প্রাণীও কোথাও থাকিবে না, যে তোমাদের জাগরণী

গীতি শোনে নাই। একটী ধূলীকণাও কোথাও থাকিবে না, যাহাকে সাদরে শিরে তুলিয়া লইয়া আপন বলিয়া স্বীকার না করিয়াছ। সকল পরকে আপন করা, সকল ছোটকে বড় করা, সকল আত্মবিস্মৃতের আত্মস্মৃতি জাগাইয়া তোলা, সকল ঘুমন্তকে মোহশয্যা হইতে টানিয়া তুলিয়া জীবনের প্রভাতারুণের দীপ্তসুন্দর ছবি দেখাইয়া দেওয়া,—ইহাই তোমাদের কাজ এবং ইহারই জন্য সঙ্ঘ। আত্মকলহ করিবার জন্য নয়, জনে জনে কর্ত্তৃত্ব লইয়া মারামারি, কাটাকাটি করিবার জন্য নয়, পরন্তু পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যে, পরস্পরের শাসনে ও পর্য্যবেক্ষণে নিজ নিজ ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া নিজেদের চরিত্রে সেবকত্বের পরিপূর্ণ বিকাশকে সম্ভব করিবার জন্যই সঙ্ঘ। সাধন-ভজন বর্জ্জিত, উন্নত অনুশীলন হইতে আত্মদোষে বঞ্চিত, সাধনোত্থ স্বাভাবিক দিব্যানুভূতিসমূহে বিরহিত কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা সঙ্ঘ চলে না। তোমাদের সেবার ক্ষেত্র জনসাধারণ, সেবার পরিধি নিখিল-জগৎ-জোড়া, তোমাদের সেবার প্রভাব অগণিত ভাবী মানব-গোষ্ঠী-সমূহের সকলের উপরে। তোমাদের বিশ্বাস যদি না হয় অটল, তোমাদের নিষ্ঠা যদি না হয় গভীর, তোমাদের আত্মোন্নতির প্রয়াস যদি না হয় অকৃত্রিম, তোমাদের কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি যদি সেবা-বুদ্ধির না করে পাদ-চুম্বন, তাহা হইলে কেমনে তোমরা এমন গুরুতর এবং এত বিরাট দায়িত্ব পালন করিবে? ভিতরের বা বাহিরের কাহারও সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া, কাহারও

দোষানুসন্ধানে সময়ের অপচয় না করিয়া, কাহারও প্রদত্ত বাধায় বিচলিত না হইয়া, কাহারও টিটকারীতে হতোদ্যম না হইয়া বিপুল উদ্যমে জয়যাত্রার পথে চল। তোমরা সকলে মিলিয়া সর্ব্বমানবের ভিতরে এমন জাগরণ আনয়ন করিতে চেষ্টিত হও, সমস্ত বন্দরে আগুন ধরিয়া গেলে যেমন ভীত, চকিত, বিহ্বল বন্দরবাসীরা কেহ আর ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে না যে, কে কোথায় আগুন লাগাইয়া গেল। তোমরা নিখিল-বিশ্বের প্রতিটি অন্ধকার-কোণে এই মহাদীপান্বিতার আলোক বহিয়া নিবে। একদা তোমরা হয়ত বিস্মৃত হইয়া যাইবে, কিন্তু এ আগুন যেন না নিভে।"

তোমরাই আমার প্রচার-পত্র

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত আল্‌গী-দুর্গাপুর নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

প্রচারপত্র নিশ্চয়ই নিজেদের মত ও পথের সম্পর্কে জনসাধারণের মনে জ্ঞান ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করিবার পক্ষে অতিশয় কার্য্যকর একটী সহায়ক, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ছাপাইবারও সামর্থ্য নাই, কাগজ কিনিবারও যোগ্যতা নাই। তাই তোমাদের হাতে কখনও প্রয়োজনানুযায়ী প্রচারপত্র প্রেরণ আমার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। কিন্তু ইহাতে আফশোষ করিবার কিছু নাই। অনেক ক্ষেত্রে প্রচারপত্র-সমূহ অজ্ঞ মূর্খ নিরক্ষরকে

বিপথ-পরিচালিত করিবারই জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাও ভুলিলে চলিবে না। আমি তোমাদের নিকটে যেই সকল ব্যক্তিগত পত্র লিখি, তাহাকেই তোমরা প্রচার-পত্রের সম্মান প্রদান করিতে পার, যদি তোমাদের ভাবের ভাবুক অন্তরঙ্গ লোকের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে পার। কিন্তু আমার সকলের চেয়ে শক্তিশালী প্রচারপত্র হইবে যে বাবা তোমরা। কাগজে লিখিয়া বা ছাপাইয়া যে প্রচারপত্র পাঠাইব, তাহা হইবে মেকী, তোমাদের প্রতিজনের মুখচ্ছবিতে লিখিত হইবে আমার যেই বাণী, তাহাই হইবে প্রকৃত প্রচার-পত্রিকা। আমার আসল প্রচার-পত্র তোমরা। তোমাদের দেখিয়া যদি মানুষ মনে করে যে, দেখিবার মতন একটা জিনিষ দেখিয়া আসিলাম, তবেই না আমার আদেশ বা বাণী তাহারা লুফিয়া লইবে! তোমাদের মুখকান্তির ভিতরে যদি আমার ধর্ম্ম, আমার সাধনা, আমার ত্যাগ, আমার তপস্যা, আমার নীতি, আমার আদর্শ ফুটিয়া উঠে, তবে না তাহারা, ইহার পরে যে-কোনও ছাপান কাগজ নিয়া ইহাদের হাতে তুলিয়া ধর, তাহাকেই বেদবাণী বলিয়া অবনত মস্তকে মানিয়া লইবে, বিনা দ্বিধায় তাহার উপযোগিতা স্বীকার করিয়া লইবে। কেবল ছাপার হরফের দ্বারা কতকগুলি কাগজ মসীলিপ্ত করিয়া পাঠাইলেই তাহার নাম প্রচারপত্র হয় না। সেই কাগজগুলি কি ভাব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর, তোমরা যাহারা তাহার

পরিবেশক, তাহাদের মুখচ্ছবিতে কি আদর্শের জাগ্রত জীবন্ত জ্যোতির্ধারা অনুপম তুলিকায় অঙ্কিত হইয়া আপনা আপনি মানুষের মনে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের রেখাপাত করিতেছে, তাহার উপরে প্রচারপত্রিকার সাফল্য নির্ভর করে। তোমাদের প্রতিজনের জীবনের মধ্য দিয়া কারারুদ্ধ দুর্ব্বল মানব নিজ মুক্তির কি উপকরণ খুঁজিয়া পাইতেছে, তোমাদের জীবনের স্বচ্ছ সুন্দর অনবদ্য আচরণের মধ্য দিয়া কি অমৃতের আবাহনী গীত সমুচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহারই উপরে ছাপান প্রচারপত্রিকার সমগ্র সাফল্য নির্ভর করিতেছে। ইহা জানিয়া, প্রচারপত্র পাও আর না পাও, যতগুলি মানুষের সহিত সংশ্রবে আসিতেছ, তাহাদের প্রতিজনেরই মধ্যে নিজ অন্তরের দিব্য ভাবকেই কেবল সংক্রামিত করিবার চেষ্টা করিতে থাক। তোমাদের জীবনের মধ্য দিয়া কি হইতেছে, কি চলিতেছে, কি পাইতেছে বিকাশ, কি পাইতেছে বিলয়, কি চাহিতেছে আত্মপ্রকাশ, তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ দেবত্বের বিশ্বতোবিকাশকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতে গিয়া কি যাইতেছ মরমে মরিয়া সরমে লুকাইয়া আত্মবিলোপ করিয়া, তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে যে তোমার হাতে প্রচারপত্র পৌছিলে তাহার কি হইবে ফলাফল। তোমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক যে দুই চারি জন মহদাদর্শকে জীবনে রূপ দিবার করিতেছ আপ্রাণ প্রয়াস, তাহাদেরই কাজকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য প্রয়োজন হইতে পারে প্রচারপত্রের। প্রচারপত্র তোমাদের কার্য্যের সহায়ক

হইতে পারে একমাত্র তখন, যখন তোমাদের জীবনই তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সকলের শুভবুদ্ধি-রক্ষিত শ্রদ্ধা-স্নেহকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ হইতেছে।”

প্রচার-পত্রিকার শক্তি

ময়মনসিংহ-নান্দাইল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“আদর্শ-প্রচার তোমরা বহু ভাবে করিতে পার। ছাপান প্রচার-পুস্তিকা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় অতি অল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অবিরাম বিতরিত হইতে থাকিলে তাহার ফলে তোমাদের আদর্শ জন-সাধারণের মধ্যে বিশেষ-ভাবে প্রচারিত হইতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে একক চেষ্টায় কাহারও দ্বারা এই কাজ সম্ভব নহে। এই কার্য্যের বিশালত্বই তোমাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির এবং সমবেত ত্যাগের সমন্বয় দাবী করিবে। পারিবে কি প্রতিজনে নিজ নিজ দৈনন্দিন আহারীয় অন্ন-গ্রাস হইতে এক মুষ্টি তুলিয়া রাখিয়া সকলের সম্মিলিত মুষ্টির পর্ব্বত প্রমাণ আয়তনের দ্বারা নিখিল পৃথিবী জুড়িয়া আদর্শ-প্রচারের বার্ত্তা কাগজের বুকে আঁকিয়া আঁকিয়া ছড়াইয়া দিতে? যদি পার, কাজের মতন কাজ করিলে। কিন্তু তোমাদের নিজ নিজ জীবনের মধ্যেও যেন সেই স্বর্গীয় ভাব ও অনবদ্য আদর্শ যতটা সম্ভব প্রস্ফুটিত হয়, যাহার প্রচার তোমাদের প্রচার-পুস্তিকা সকল করিয়া যাইবে। আজ তোমাদের সংখ্যার

মুষ্টিমেয়তা এবং বিত্তগত দারিদ্র্য এতজ্জাতীয় প্রচেষ্টার সম্মুখে যেন বিশাল দুর্গপ্রাকারের মতন দুর্ল্লঙ্ঘ্য বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু চিরকালই তোমরা মুষ্টিমেয় থাকিবে না এবং নিতান্ত দীন-দরিদ্রের শ্রদ্ধাপূত সম্মিলিত অন্নকণাগুলিই জগতের বিশালতম কর্ত্তব্য-সম্পাদনের পক্ষে উপযুক্ততম। কামানের গোলা বাহিরের প্রাচীর ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু অন্তর জয় করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। তোমরা কাগজে কালিতে আখরের সাহায্যে যে আদর্শ-বাহিকা রণ-বাহিনী নির্ম্মাণ করিবে, তাহা একদা জগতের সকল জীবের অন্তর-পুরুষকে জয় করিয়া তোমাদের আপন করিবে। সময় হোক, আমি প্রচার-পত্র প্রচার সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজে নামিতে বলিব। আজও সময় আসে নাই।" *

হিন্দুধর্ম্মের জয়

কলিকাতা-কালীঘাট-নিবাসী জনৈক ভক্তিমান্ যুবককে

* এই পত্রখানা নিত্যধামগত চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়কে লেখা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেড্ডা গ্রামে ব্যায়ামাভ্যাসে রত থাকা কালে এক অপরাহ্ণে ইনি শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শন পান। শ্রীশ্রীবাবামণি ব্যায়ামের কয়েকটী কৌশল দেখাইয়া দেন। শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ-স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার মনে দিব্য ভাবের স্ফুরণ হয়। ইনি নান্দাইলে চাকুরী নেন এবং সেই অবস্থায় কয়েকবারই আশ্রমবাসের জন্য রহিমপুরে শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে চলিয়া আসেন। ধর্ম্ম ও আদর্শকে প্রচারের জন্য ইঁহার ভিতরে একটা জাগ্রত ও জীবন্ত আগ্রহ সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইত।

শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিলেন,—

"তোমরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকদের হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিবার বিষয়ে গভীর ভাবে ভাবিতেছ বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু একজন খ্রীষ্টমার্গী বা মহম্মদমার্গী ব্যক্তিকে সকলের অজ্ঞাতসারে যে বেদমার্গী সাধন-দীক্ষা দিয়া তাহার আধ্যাত্মিক অনুশীলনের গতি ফিরাইয়া তাহার উপকার করিলে, তাহাকে কি ভাবে তাহার পরিজনবর্গের মধ্যেও বিস্তারিত করিয়া এই উপকারকে তাহার পক্ষে স্থায়ী ও বংশানুক্রমিক করিতে পার, তাহার বিষয় কি কিছু ভাবিয়াছ? বেলুড় মঠে আসিয়া অনেক শ্বেতাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়াছেন। এইরূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ আরও কতিপয় প্রতিষ্ঠান ভারতের প্রায় সকল প্রান্তেই দুই চারি দশজন করিয়া শ্বেতাঙ্গকে হিন্দুর সাধন-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন বা করিতেছেন। কিন্তু এই দীক্ষিতরা প্রধানতঃ দীক্ষাটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন, দীক্ষানুকূল সমাজ ত' পান নাই! হিন্দুমন্ত্রে দীক্ষিত ইহুদী বা খ্রীষ্টান নারী বা নর ইহুদী বা খ্রীষ্টান স্বামী বা স্ত্রী নিয়া ঘর করিতেছেন, পুত্রকন্যা সব ইহুদী বা খ্রীষ্টানই থাকিতেছে,—ইহা সমাজ-হিসাবে তোমাদের কতটুকু বলবর্দ্ধন করিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিও। পৃথিবীতে মুসলমানেরা যখন সংখ্যার গরবে অতীব স্ফীত হইতেছেন, খ্রীষ্টানেরা যখন সংখ্যার মহিমায় নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে জগজ্জয়ী করিয়া লইতেছেন, ভারত হইতে নির্ব্বাসিত বৌদ্ধধর্ম্ম যখন সিংহলে এক পা রাখিয়া অন্য

চরণ ভারতে প্রসারিত করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তখন তোমরা কি কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে হিন্দু-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া নিজ নিজ মঠের মহিমা প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হইবে? প্রকৃত ধর্ম্ম বিশ্বজনীন, তাহা সম্প্রদায়ের ধার ধারে না, কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে যখন এক এক প্রকারের সঙ্ঘানুবর্ত্তিতা স্বাভাবিক ভাবেই আবশ্যকীয় হইয়া রহিয়াছে, তখন কি তোমরা একটু সাহস করিয়া, একটু সহৃদয় হইয়া, একটু সবল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে পূর্ণরূপে তোমাদের সমাজের মধ্যে তুলিয়া লইবে না, যাহারা তোমার সমাজ ও পরিবেশ মনে মনে কামনা করে? কতিপয় অহিন্দুকে তোমরা হিন্দু করিয়া সন্ন্যাসী করিয়া দিয়াছ, ইহাতে কৃতিত্ব আছে। কিন্তু সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হইয়া জীবন-পাত যাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে অথচ যাহারা হিন্দু-সাধন-মার্গের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট, যাহারা হিন্দু সাধন-মার্গীদের মধ্যেই পরিজন পাইতে চাহে, স্বামী চাহে, পত্নী চাহে, শ্বশুরকুলের কুটুম্বগণকে চাহে, নিজ নিজ সাধনা ও তপস্যার ফলকে ঐহিক ভাবে সন্তান-সন্ততিরূপে জগতে রাখিয়া যাইতে চাহে, হিন্দু-সাধন-মার্গী পুত্র-কন্যাকে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়া বাৎসল্য রসের আস্বাদন করিয়া যাইতে চাহে, তাহাদের জন্য তোমরা কি করিয়াছ, কতটুকু করিয়াছ,— নিশ্চয়ই ইহা এক অতীব সঙ্গত জিজ্ঞাসা। বর্ত্তমানে শ্বেতাঙ্গ শিষ্যদের নিয়া মঠে মঠে যাহা চলিতেছে, তাহাকে 'শো-বট্‌ল' দেখান বলা যাইতে পারে। এই দেখ অমুক ফরাসী, অমুক

জার্ম্মাণ, অমুক আমেরিকান, অমুক সুইস্, অমুক স্কচ আমাদের মঠের শিষ্য,—সুতরাং তোমরা অন্যান্য মঠে দীক্ষা নেওয়া ছাড়িয়া দিয়া আমাদের মঠে আইস, আমাদের শিষ্য হও, আমাদের চাঁদা দাও, গুরুদক্ষিণা দাও, নিত্য নূতন মন্দির নির্ম্মাণের তহবিলে সম্পত্তি দান কর। ইহাই এ সকল গো-বেচারী শ্বেতাঙ্গ শিষ্যদের অবস্থা। তাহারা কেহ জানে না যে, তাহাদিগকে সযত্নে সমাদরে মঠে মঠে রক্ষা করিয়া মঠাধীশরা প্রধানতঃ এই কার্য্যটিই করিয়া যাইতেছেন। চতুর্দ্দিকে কেবল যশোগাথা গীত হইতেছে,—"অমুক মঠ কী জয়, হিন্দুধর্ম্ম কী জয়।" কিন্তু দুই চারি দশ জন বা দুই চারি পাঁচ কুড়ি শ্বেতাঙ্গের হিন্দু-সন্ন্যাসী হইয়া অন্তিমে হরিদ্বারের গাঙ্গ্য-প্রবাহে সলিল-সমাধি পাইবার ভিতরে হিন্দুধর্ম্মের জয় নিহিত নাই। হিন্দুধর্ম্মের জয় হইবে সেই দিন, যে দিন কেহ হিন্দু সাধন গ্রহণ করিতে আসিলে সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দু-সমাজের মূলে ও কাণ্ডে, শাখায় ও প্রশাখায়, পত্রে ও পুষ্পে, পরাগে ও কেশরে, ফলে ও বীজে শক্তি-সঞ্চার করিবার বৈধ এবং সর্ব্ব-সম্মত অধিকার সে পাইবে। কিসে হিন্দুধর্ম্মের সত্য সত্য বিজয়-প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মুষ্টিমেয় দুই চারি জন অহিন্দুকে হিন্দু-সাধন-ধর্ম্মে-দীক্ষিত করিবার ভিতরে প্রকৃত জয়িষ্ণুতা কোথায় রহিয়াছে, বা কতটুকু রহিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের বিচারের বিষয়ীভূত হওয়া প্রয়োজন। একটা অন্ধতাড়নায় বা অসংগত আত্মতৃপ্তিতে

বিভোর হইয়া পথ চলিবার দিন হিন্দুধর্ম্মের বিগত হইয়া গিয়াছে।"

শিবপুর, ত্রিপুরা
২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

এলি রে আমার কাছে

রাত্রি তখনো তিন ঘণ্টার উপরে রহিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন। শিয়রের কাছে টেবিলের উপরে স্তূপীকৃত পত্র-রাশির পানে তাকাইয়া মনে মনে গুণ গুণ করিয়া গান ধরিলেন,—

কি বারতা কয়ে কি বেদনা লয়ে
এলি রে আমার কাছে?
সত্যই মোর প্রেমমাখা ক্রোড়
তোর লাগি খালি আছে।

আবার চিঠির স্তূপের দিকে তাকাইলেন। একখানা চিঠি কি এক একটা মানুষের মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া তাঁহার নয়নের সুমুখে ভাসিতে লাগিল?

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিয়া চলিয়াছেন,—

কত আশা নিয়ে ব্যাকুলতা দিয়ে
মথিয়া হৃদয়খানি
কাগজের বুকে কত সুখে দুখে
গেলি রে তূলিকা টানি,

প্রতিটি আখর বৈশাখী ঝড়
তাণ্ডবে যেন নাচে,
তবু মোর বুকে আনন্দ-লোকে
তোর তরে ঠাঁই আছে।

গাহিতে গাহিতে শ্রীশ্রীবাবামণির চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। চক্ষু বুজিয়া তিনি সেই পদগুলিই আবার গাহিয়া যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ বিপুল আবেগে টেবিলের উপর হইতে চিঠির স্তূপগুলি একটা একটা করিয়া তুলিয়া বুকে ধরিতে লাগিলেন।

গান চলিতেই লাগিল। কত পদের পর কত পদ যোজনা হইল, তাহার আজ আর কিছুই পাওয়ার উপায় নাই। শ্যামগ্রামের সুকণ্ঠ সঙ্গীতকার ভ্রাতা মাখনলাল ভট্টাচার্য্যের রক্ষিত ব্যক্তিগত ডাইরি হইতে যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাই এইখানে লিপিবদ্ধ হইল।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায়ই শ্রীশ্রীবাবামণি বাহির হইলেন। সঙ্গীয় সেবক ব্রহ্মচারীটী পাশের শয্যায় পড়িয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন। মাখনলাল শ্রীশ্রীবাবামণির পদাঙ্কানুসরণ করিলেন।

একটু দূরেই ফকির আফতাবুদ্দিনের গৃহ। তাহার পাশ দিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি চলিলেন। সেই শেষ রাত্রেই উঠিয়া ফকীর তাঁহার সুর-সংগ্রহ যন্ত্রটি লইয়া উন্মত্তের মতন বাজাইতে সুরু করিয়াছেন। যেন কোথাও কাহারও সহিত যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। কাহাকে জানি নিধন না করিতে পারিলে এই শেষ

যামিনীতে ফকীর সাহেবের কোনও শান্তি নাই। টং টং করিয়া তারযন্ত্রের টঙ্কার চলিতেছে, আর কখনো উল্লাসে কখনো বিষাদে অধীর হইয়া ফকীর তাঁহার ভাঙ্গা গলায় নানাবিধ ধ্বনি উদ্‌গার করিতেছেন। অন্য সময় হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি থামিতেন, ফকীরের দরজায় আঘাত করিতেন, হয়ত বা বাজনা শুনিবার জন্য সেখানে প্রবেশও করিতেন। কিন্তু চিঠির স্তূপ যাঁহার অন্তরে জ্বালা ধরাইয়াছে, তাঁহার কি সুরের যন্ত্র-বাদন শুনিবার আগ্রহ থাকে?

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিয়া চলিয়াছেন,—

জীবনের যত কান্না ও হাসি
প্রতি আখরের কোণে কোণে আসি'
কহিছে কেবল—"আমি দুর্ব্বল,
কে আমারে দিবে ভরসা?
কে আমার প্রাণে পুণ্যের বানে
সৃজিবে শ্যামলী সরসা,
কে আমারে দিবে নিত্য অভয়,
কে রুধিবে মোর চিরপরাজয়,
কে কহিবে মোরে ডাকি প্রীতিভরে
বিশ্ববিধাতা রাজাধিরাজ
দিবসে নিশীথে গ্রীষ্মে ও শীতে
পরিয়া রয়েছে তোরই ত' সাজ!
তোর মাঝে থাকি' তোরে দিয়া ফাঁকি

সে যে তোরই প্রেম যাচে।"
কি বারতা কয়ে কি বেদনা লয়ে
এলিরে আমার কাছে? *

শ্রীশ্রীবাবামণি পাটক্ষেতের মধ্য দিয়া পথ বাহিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে দুই একটা সাপ পায়ের কাছ দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্রও নাই। কোথাও কোথাও অকাল-প্লাবনে ক্ষেতের আইল ঘন-কর্দ্দমাক্ত। চলিতে চলিতে তিনি বাঘাউড়া গ্রামের পাশে আসিয়া হঠাৎ গতি ফিরাইলেন। পদাঙ্ক অনুসরণকারী মাখনলাল দৃষ্টিপথগোচর হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাখন, তুই এখানে!

মাখন বলিলেন,—হাঁ বাবা, আমি শিবপুর হ'তেই আপনার পিছে পিছে আস্‌ছি। ভাব্‌লাম, এত রাত্রিতে যান্ কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বাঘাউড়া গ্রামটার প্রতি আমার একটা নিদারুণ মোহ আছে রে! তাই অনিচ্ছায় এখানে এসে পড়েছি। কত কলুষিত দুর্ব্বলচেতা বালকের সঙ্গ ক'রে এখানে আমি ভগবানের প্রত্যক্ষসেবার সুযোগ পেয়েছি। আজ হয়ত তারা কেউ আমার পাশে নেই, কিন্তু তাদের ভাল কত্তে গিয়ে আমি আমাকে চিনেছি, ভগবানকে পেয়েছি।

* গানটী ভ্রাতা মাখনলালের খাতায় যাহা ছিল, তাহাতে দুই চারি স্থলে ছন্দপতন ছিল। তাই তাহা সংশোধন করিয়া প্রকাশিত হইল।

বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি বহুকালপূর্ব্বরচিত একটি গান ধরিলেন,—

তোমারি কাজে হরি পেয়েছি যারে,
তোমারি অবতার ভাবিয়া পায়ে তার
প্রণতি করিয়াছি বারে বারে। *

সুকণ্ঠ মাখনলাল ভট্টাচার্য্যও সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিলেন। শিবপুর ফিরিয়া আসিতে আসিতে পূর্ব্ব আকাশে লালিমার প্রকাশ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি স্নান উপাসনাদি অন্তে পত্র-পুঞ্জ লইয়া উত্তর লিখিতে বসিলেন। অদ্যকার অপরিমেয় পত্রাবলির অধিকাংশেরই অনুলিপি মাখনলালের সংরক্ষণ হইতে উদ্ধার করিতেছি।

নিত্য ও অনিত্য

বগুড়া খঞ্জনপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

নিত্যেরে ডাকিয়া কহে অনিত্য চঞ্চল,
"ওরে নিত্য, তোর পূজা কে করিছে? বল্!"

* —এই গানটী শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায়ই গাহিতেন এবং অনেকেই শুনিয়াছেন। তাল তেওড়া। কিন্তু কি করিয়া যে ইহার পরবর্ত্তী পদগুলি একেবারে নিখোঁজ হইয়া গেল, ইহা আশ্চর্য্য। যদি সম্পূর্ণ গানটী কখনো পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী মুদ্রণের সময়ে দেওয়া যাইবে। সৌভাগ্যবশতঃ গানটি পাওয়া গিয়াছে এবং মন্দির সংগীত গ্রন্থের ১০৫ নং গানরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

নিত্য কহে,—"তোরে সবে করিছে বন্দনা,
ইহাতেই চিত্তে মোর অতুল সান্ত্বনা।
তোরে ভজি' পূজি' কেহ কিছু নাহি পায়,
তার পরে এক প্রাণে আমা পানে ধায়।"

আপনার কর বিশ্বে যত আছে পর

চট্টগ্রাম আমিলাইষ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

সংসার-সমুদ্রে পড়ি' হাবুডুবু খায়,
তথাপি উদ্ধার লাভ কেহ নাহি চায়।
"রক্ষা কর রক্ষা কর"—করে আর্ত্তনাদ,
তবু ভাল লাগে সেই লবণাম্বু-স্বাদ।
কেহ যদি আসে নিয়া উদ্ধার-তরণী
সহস্র সন্দেহ মনে জাগিবে অমনি।
কি জানি কোথায় নিয়া ফেলিবে আমারে,
তার চেয়ে ভাল আছি, ভাবে বারে বারে।
এই ভাবে মুগ্ধ জীব বদ্ধ হ'য়ে থাকে,
শুধু লোক-দেখাদেখি ভগবানে ডাকে।
চিত্ত নাই, প্রেম নাই, প্রাণ নাই তাহে,
ভক্ত বলি' লোকমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠা চাহে।
পরম করুণাময় আনন্দ-নিলয়
ভগবান্ তাহারেও উদ্ধারিয়া লয়।

পুত্র-পত্নী-বন্ধু আদি করিয়া হরণ
শোকরূপে তার হৃদে করেন রমণ।
দুঃখ-দাবানলে করি' অনন্ত দাহন
পরিণামে সমাদরে নিজ বক্ষে লন।

সবারে উদ্ধার তাঁর নিজ করণীয়,
তাই তিনি অজানিতে সকলের প্রিয়।
কেহ নাহি জানে তিনি অতি আপনার,
তথাপি সবার তিনি নিয়াছেন ভার।

তাঁহাতে রাখিয়া তব অটুট নির্ভর
আপনার কর বিশ্বে যত আছে পর।
যে করে বিশ্বাস তাঁরে যে বা অবিশ্বাসী,
সবাই আপন তব যত বিশ্ববাসী।
নাস্তিক, নির্ম্মম আর নিষ্ঠুর দানব,
তব আপনার জন জানো এরা সব।

তোর নয়নের দৃষ্টি-মাঝে

চট্টগ্রাম ফতেয়াবাদ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

তোর নয়নের দৃষ্টি-মাঝে সেই ভাষা কি ফুটল রে,
যেই ভাষাতে আমার প্রাণের গান

দিগ্‌বিদিকে রাগরাগিণীর গমক নিয়ে ছুটল রে;
তুল্‌ল কি এক মোহন দেশের তান?
যেই দেশেতে চোখের দেখা প্রাণের দেখার পথ দেখায়,
যেই দেশেতে মুখের ভাষা প্রাণের ভাবার মান শেখায়,
যেই দেশেতে দেহ-মনের তুচ্ছ ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে
অনন্ত কাল দীপ্ত থাকে প্রাণ?
যেই দেশেতে দুঃখ নাই, নাইরে কারো অত্যাচার,
যেই দেশেতে দ্বন্দ্ব নাই, দ্বিধা নাই, সব নির্ব্বিকার,
সব কিছুই যে আনন্দময় সত্যাসত্য নির্ব্বিচার,
বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই, চায় না কেহ ত্রাণ।
তোর নয়নে আমার নয়ন ফুটাল কি দৃষ্টি তার?
তোর বয়ানে আমার বয়ান হাসল কি সে স্নিগ্ধতার?
মোর পরাণে কি তোর পরাণ মিল্‌ল হ'য়ে বিশ্বাকার
হোমাগ্নিতে ক'রে আত্মদান?

কেহই যেখানে কাহারো অধীন নয়

ময়মনসিংহ শেরপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

কেহ যেখানে কাহারো অধীন নয়।
মানুষ বলিয়া সকলের পরিচয়,
মানুষের সাথে মানুষের হয় দেখা,

সবার ললাটে মানুষের নাম লেখা,
মানুষে মানুষে মানুষের মত মিল,
সবার হৃদয়-দুয়ারের খোলা খিল,
কেহ কারো কাছে কিছু না গোপন করে,
যাহা কিছু যার সকলি সবার তরে,
কেহ নাহি চাহে অপরের হোক্ ক্ষতি,
সকলের সুখে সকলের অনুরতি,
সবার লাগিয়া সবাই বাঁচে ও মরে,—
আমারে খুঁজিছ? পাবে মোরে তারি ঘরে।

আপন স্বার্থ ছোট করি' যেথা সবে
পরের লাগিয়া ছোটে মহাকলরবে
জীবনের মহা-আহব করিতে জয়,
সেই খানে মোর সহজ প্রকাশ হয়।
সেই খানে আমি স্বরূপ-মূরতি ধরি'
উৎসর্গীরে আপন বক্ষে বরি।
সেই খানে হয় মহামন্দির-ভিত্
রচিত, যাহার স্বভাব বিশ্বজিৎ।
ধরণীর প্রতি ধূলিকণাটীরে লয়ে'
মহোৎসবের সেখানেই আয়োজন,
প্রতি অণুটীর কাণে কাণে কথা কয়ে
আমার সেখানে প্রেমময় প্রকাশন।

সবার লাগিয়া সবাই, তাই ত' আমি
সবার ভিতরে সবার দুঃখ সই,—
সবার বেদনা বহিছে জগৎস্বামী,
বুঝিছ না দেখি অবাক্ হইয়া রই।

সবারে সবার আপন করিয়া নিয়া,
সবারে সবার মধুময় হৃদি দিয়া,
সবার সুখের সাধনে সিদ্ধি লভি'
সবাই হবিরে সবার দুখের কবি।

পরের বেদনা আপন করিয়া নিয়া,
নিজের বেদনা যাইবি ভুলিয়া তোরা,
আপনার সুখ সবারে বাঁটিয়া দিয়া,
প্রতি জনে তোরা হবিরে জগজ্জোড়া।

ধন্য আভরণ

ত্রিপুরা বাঙ্গরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

পাপী জন পুণ্য করে লাভের আশায়
পাপমুক্তি হবে ভাবি পরিতৃপ্তি পায়।
পুণ্যবান্ পুণ্য করে স্বভাবের বশে।
প্রতি বাক্য চিন্তা তার পূর্ণ প্রেম-রসে।

পাপী কিম্বা পুণ্যবান্ সবার লাগিয়া।
কর তুমি পুণ্য নিত্য প্রেমে বাঁধি' হিয়া।
সবার লাগিয়া তব পুণ্য আচরণ,—
তাই তুমি জগতের ধন্য আভরণ।

দুঃখীরূপে নিজে ভগবান্ তোমার চাহিছে সেবা

ঢাকা রূপগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

সমাজমঙ্গলকামী চিত্ত লয়ে করিবি অন্যায়,
জীবে জীবে অসন্তোষ। বল্ দেখি একি সহা যায়?
আত্মসুখী নরনারী আপনার সুখদুঃখ লয়ে
অপরের সুখদুঃখে অন্ধ সম সদা উপেক্ষয়ে।
তাহে দোষ আছে তবু তাহা বুঝি ক্ষমাযোগ্য হয়।
পরের লাগিয়া প্রাণ, তবু ঘৃণা?—সহনীয় নয়!
স্বর্গের সুষমা দিয়া ঘেরা যদি থাকিত ধরণী,
ন্যায় ধর্ম্ম নীতিজ্ঞান প্রতি হৃদে জাগিত অমনি।
তোদের সেবার মুখ চাহি থাকা হ'ত প্রয়োজন?
তোদের ছাড়াই ধরা হইত রে নন্দন কানন।
সেবক বিনম্র হও, ক্ষমা কর সর্ব্ব অপরাধ;
যাহারে সেবিবে, তার পরিহর যত অপবাদ।
নিজের নম্রতা দিয়া তাহার জাগিয়ে তোল প্রাণ,

অন্তরের ভক্তি নিয়া সেবাকার্য্যে হও আগুয়ান্।
পাপী অপরাধী আর দুর্বৃত্তের ছদ্মবেশ পরি'
তোমার সম্মুখে ঐ দাঁড়াইয়া আছেন শ্রীহরি।
ভুলি ইহা অহমিকা উচ্চ শির করি' যদি আসে,
সেব্য দূরে স'রে যাবে তব প্রতি ঘোর অবিশ্বাসে।
সেব্য না থাকিলে তব সেবাকার্য্য মিথ্যা আয়োজন,
সেবার করিয়া ভাণ নিজ হাতে নিজেরে নিধন!
সেবাকার্য্যে অন্তহীন নরনারী চলিছে ছুটিয়া
পথিমধ্যে অহমিকা সঙ্গে হায় যাইছে জুটিয়া!
লক্ষ্য ভুলি' উপলক্ষ্য প্রধান হইয়া কেন যায়?
পরদুঃখে-গলা প্রাণ নিজেরে করিছে পূজা হায়!
কর ধ্যান কর জ্ঞান, দুঃখীরূপে নিজে ভগবান্
তোমার চাহিছে সেবা, তোমারি ঘুচাতে অকল্যাণ!

আদর্শ সবার

ত্রিপুরা বোয়ালিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

শৌর্য্যবীর্য্যশালী এক মহাবীর-রূপে
নিজেরে প্রকাশ করা নহে সকলের
অনায়াসসাধ্য এক সাধারণ কাজ।
কিন্তু মানুষের মত বাঁচিবার তরে
মানুষের মত দেহ মন প্রাণ নিয়া

সবাই চলিতে পারে ইচ্ছা যদি থাকে।
মহাবীর ধুরন্ধর দিগ্বিজয়ী শূর
অনেকের পূজ্য হয় জগত-মাঝারে,
কিন্তু মানুষের মত মানুষ রহিয়া
অন্যায়ের কাছে নাহি করি' নত শির,
পরের দুঃখে ও শোকে নিজের স্বার্থেরে
সাধ্যমত করি' হেলা কে না পারে বল
জগতের প্রতি জনে দৃষ্টান্ত দেখাতে
মানুষ হইবে ঠিক কেমন মানুষ?
এই অতি সাধারণ সামান্য মানুষ
বিশ্ব জগতের পূজ্য, আদর্শ সবার।
মহাবীর, মহাকবি, যুগন্ধর নেতা
কেহ কেহ ভাগ্যগুণে পরিবেশে হয়।
কেহ কেহ পরিবেশ লভি' প্রতিকূল
যোগ্যতর হইয়াও রহে সাধারণ।
কি আছে লজ্জার ইথে? মনুষ্য-সমাজে
মানুষ প্রকৃত যেই; সেই পূজনীয়
সর্ব্বাধিক এমন কি বীরদের চেয়ে।
জন্মি' নীচকুলে কিম্বা যাপিয়া জীবন
নীচজনগণমধ্যে দরিদ্র-পল্লীতে,
হীন অন্ত্যজের ঘরে করি' অধিষ্ঠান
যে পারে রহিতে ঠিক যথার্থ মানুষ,

সে মানুষ সকলের ধ্যানের দেবতা।
সবাই যদি না ধ্যান করেও তাহারে,
আমি তারে পূজা ধ্যান করি বারে বারে।
সেই ত' মানব-কুলে ধন্য সুমহান্,
সেই ত' মানববংশে উজ্জ্বল ভাস্কর!
অন্ধ যারা তারা তার মূল্য নাহি জানে,
চক্ষু আছে যার, তার পূজা মনে প্রাণে।

যেইটুকু আছে, সেইটুকু দাও

চট্টগ্রাম শ্রীপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

যেইটুকু আছে সেইটুকু দাও সবারে,
দেখো তাই কত দুঃখ-বেদনা নিবারে!
ছোট আছ তুমি ছোটই হইবে তব দান,
কি দিলে তাহার চেয়েও বড় যে কেমন প্রাণ
ছিল এ ক্ষুদ্র অর্ঘ্যটুকুর পিছনে,
ছিল লুকাইয়া অজ্ঞাতসারে বিজনে,—
কেহ যেই প্রাণ অবগুণ্ঠন খুলিয়া
দেখে নাই কভু চপল নয়ন তুলিয়া।
ক্ষুদ্র তোমার অন্নথালিকা-কোণেতে
মুঠি তুলি' লও একটী অন্নগ্রাসেরে
পরমা শ্রদ্ধা আবেশিত করি' মনেতে

দাও তুলি ওই ক্ষুধিত ছিন্নবাসেরে,
তাহারে জানিয়া সাক্ষাৎ জগদধিপ
দাও তারে পূজা ধ্যানের ধূপতি জ্বালিয়া
দাও তারে পূজা জ্বালিয়া প্রাণের প্রদীপ,
দাও তারে পূজা হৃদিভরা প্রেম ঢালিয়া।

ওই যে মূর্খ অজ্ঞান জীব কাঁদিছে
স্বকীয় অজ্ঞানতার বেদনা বহিয়া,
বৃথা মায়া-জালে কেবলি নিজেরে বাঁধিছে
অসহন নব বন্ধন-ব্যথা সহিয়া,—
চাহিছে মুক্তি, চাহিয়া চাহিয়া কেবলি
মুক্তির পথ করিছে কাঁটায় পূর্ণ,
যতই বেদনা উঠিছে তাহার উথলি'
ক্ষতের উপরে ছড়ায় লবণ-চূর্ণ।

নিজের দুঃখে নিজেরে করিয়া পেষিত
কেবলি দুঃখ বাড়াইছে দিবা-যামিনী,
সকল ভরসা আশাবল নিঃশেষিত,—
অন্ধকারের রাজত্ব-মাঝে দামিনী
চমকে ঝমকে ঝলমল করি' জ্বালায়ে
দূর কর তার অন্তর-ভরা ভীতিরে,
আত্মবিনিশ্চয়-চেতনায় ঝালিয়ে
জাগাইয়া তোল তার স্বাভাবিক গীতিরে।

ক্ষুদ্র তোমার জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধি,
অহমিকা নাশি' তাহার করহ শুদ্ধি।
ক্ষুদ্র কেবল ক্ষুদ্রই নহে, তাহারো
মহত্ত্ব আছে,—সে নয় ছোট্ট কাহারো।
উপেক্ষণীয় তুচ্ছ নহে সে কদাপি,—
অহমিকাহীন হ'লে সে বিপুলপ্রতাপী,—
বিন্ধ্যগিরির অচল বিপুল বাধারে
চক্ষু বুজিয়া পার হয়ে যায় আঁধারে।
ক্ষুদ্র যে জন ক্ষুদ্রই দিবে বলিদান,
তাতেই তুষ্ট মহতেরা মহামহীয়ান্।

প্রাণে প্রাণে চালা অভিযান

যশোহর মাগুরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

কথা ত' কহিলি তুই সারাটী জীবন ভ'রে
কথার কি দিল কেহ দাম?
একটু দাঁড়ায়ে ঐ রাস্তার পরপারে
চলে গেল নিজ নিজ ধাম।
যত তুই চীৎকারে মথিলি পথের বালি
তত তারা দূরে দূরে যায়,
যত তুই আক্রোশে অসত্যে দিলি গালি
তত তারা ত্বরিত পলায়।

"মিথ্যার সাথে কেহ আপোষ করো না" ব'লে
যত তুই যুক্তির ঝুলি
উজাড় করিলি, তারা ততই ত' তলে তলে
আহরিয়া রাস্তার ধূলি
তোরি মুখে চোখে ঐ ছুড়িয়া মারিয়া যায়,
দেখিয়াও বুঝিলি না কিছু,
কথার বুনিয়া জাল কাব্য-কুহেলিকায়
ছোটা ভুল ইহাদের পিছু।
কোথা ইহাদের প্রাণ, খুঁজিয়া বাহির কর্,—
প্রাণে প্রাণে চালা অভিযান;
শত খোলসের নীচে লুকান মাণিক ধর্,
তবে হবি সফল বিধান।

ধর্ম্মের বিচার

ময়মনসিংহ ঝরিয়া-জাঞ্জাইল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

তোমার ধর্ম্ম গড়িল তোমারে কেমন বস্তু দিয়া,
তাহার বিচার করিব যে আমি তার ফলাফল নিয়া।
এক নিঃশ্বাসে ভাল বা মন্দ দোষগুণ ঘাঁটাঘাঁটি
করা বড় ভুল। তোমার ধর্ম্ম করেছে কি তোমা খাঁটি?
কষ্টি-পাথরে নকল আসল সোণার যে পরিচয়,
তোমার মাঝারে তব ধর্ম্মের তেমনি নিরিখ হয়।

তুমি কি তোমার ধর্ম্মের বলে আপন করেছ পর?
তুমি কি নিখিল ভুবনখানিরে করেছ তোমার ঘর?
তুমি কি সবারে আপন বলিয়া বুকে তুলে নিতে পার?
মানুষ দেখিলে ঘৃণায় কি তুমি নাকের সিক্‌নি ঝাড়ো?
তুমি কি আপন ধর্ম্মের লাগি' পরের ধর্ম্মমতে
কর অপমান, মন্দির ভাঙ্গি' ফেলি দাও রাজপথে?
তুমি কি পরের ধর্ম্মের কথা শুনিলে রাগিয়া গিয়া
ধর্ম্মগ্রন্থ কর হে দগ্ধ মশালে আগুন দিয়া?
তুমি কি নিজের ধর্ম্মের লাগি' পরের রমণী আনি'
বলাৎকারের মহিমায় তারে স্বধর্ম্মে লও টানি?
তুমি কি তোমার ধর্ম্ম প্রচারি নিরিহ মানবকুলে
কাচ দিয়া দিয়া কাঞ্চন-রাশি আহর সাগরকূলে?
তুমি কি তোমার ধর্ম্মকে রাখি বিভীষণ হেন চর
করিতে চাহিছ স্বাধীন মানবে তব চিরকিঙ্কর?
মানব-মনের সহজ বিকাশে বিঘ্ন প্রদান করি'
তোমার ধর্ম্ম ভ্রাতায় ভ্রাতায় সৃজে কি বিষম অরি?
এই সব দিয়া করিব বিচার, কেমন বস্তু নিয়া
ধর্ম্মের ধ্বজা উড়ায়ে চলেছ লোকচোখে ধূলি দিয়া।

কর্ত্তব্য পালন

হুগলী শ্রীরামপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজে স্বকীয় কর্ত্তব্য পালন কর এবং মানুষকে তাহার কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া যাও। অপরে কর্ত্তব্য পালন করিল না বলিয়া তাহাকে অনুযোগ বা অভিযোগের পাত্র করিও না। তোমার নিজ কর্ত্তব্য যদি নিজে পালন না করিয়া থাক, তবে সেই অভিযোগ সেই অনুযোগ হইতে নিজেকে নিজে রেহাই দিও না। আজ মানুষের বন্যা, কাল মানুষের গৃহদাহ, পরশু মানুষের ভূমিকম্প, তরশু মানুষের যুদ্ধকালীন আপদ, এই সকল অজুহাতে তাহাকে তাহার কর্ত্তব্যের কথাটা তুমি বলিতে সঙ্কোচ করিবে, আমি ইহাকে ভদ্রতা মনে করি না। ইহা বর্ব্বরতা। বিপদের সময়েই মানুষকে তাহার কর্ত্তব্য সম্পর্কে অধিকতর সজাগ করিয়া দিতে হয়। তাহারা আসন্ন বিপত্তিতে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া কথা শুনিবার অবকাশ নাই,—ইহাকে আমি কোনও কাজের যুক্তি বলিয়া মনে করি না। যাহারা বিপদের দিনে কর্ত্তব্যের কথায় কর্ণপাত করিবে না, তাহারা সম্পদের দিনেও করিবে না। বরং সম্পদের দিনে তাহাদের ব্যস্ততা আরও অধিক থাকিবে। কত আত্মীয়, কত কুটুম্ব, কত বন্ধু-বান্ধব, কত নব নব আপনার জন মধুপ্রত্যাশী মৌমাছির মতন তাহাদের ঘিরিয়া রহিবে, সেই দিন তাহারা কাহার কথায় কর্ণপাত করিবার অবকাশ পাইবে? বিপদের দিনে অর্দ্ধজলমগ্ন গৃহখানার টিনের চালার এক কোণে দাঁড়াইয়া যে হয়ত বা তোমার হিতকথায় একটুখানি কাণ দিলেও দিতে পারিত, সে যে সম্পদের দিনে

নিজেই তোমাকে কত হিতকথা শুনাইতে আসিবে। তাহার কথার দাপটে তোমার সকল বিদ্যার আক্কেল গুড়ুম হইয়া যাইবে। সুতরাং মানুষকে হিতকথা শুনাইয়া তাহার হিতসাধন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ অন্তরের বিশুদ্ধি বিধানের যে ব্রত লইয়াছ, তাহাকে ছেলেখেলা মনে না করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুবর্ত্তন কর। যদি ব্রতপালনই করিয়া যাইবে, ব্রতপথের বিঘ্নকে গণনায় আনিবে না।"

ভগবানের সৈনিক

ত্রিপুরা-রাজ্য বিলনিয়া-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বন্যা হইয়াছে, ভূকম্প হইয়াছে, যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এই সকল যুক্তিতে তোমরা তোমাদের আদর্শ প্রচারের কাজে ঢিলা দিবে, ইহা আমি তোমাদের অযোগ্য আচরণ বলিয়া মনে করি। আমি আমার জীবনে কখন কোন্ বিপদকে দেখিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য পরিহার করিয়া বিশ্রামের সুযোগ উপভোগ করিয়াছি, বল? আমার সন্তানে আমার চরিত্র প্রতিফলিত হইবে না? সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণ যখন চারিদিকে কেবল গৃহে গৃহে আগুন লাগাইয়া চলিয়াছে, তখনও তোমাদিগকে তোমাদের কাজ অমিত সাহসে অসীম ধৈর্য্যে করিয়া যাইতে হইবে। বিশ্রাম বা অবসরের কল্পনা মাত্র একটী দিনের জন্য রাখিয়া দিও, যেই দিন

তোমার দেহ প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বলিবে যে, তাহার আর কোনও মূল্য নাই, সে গলিত শব মাত্র। যতক্ষণ অসি দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে গড়াগড়ি না দিতেছে, ততক্ষণ তুমি তাহাকে বিশ্রাম দিও না। তুমি ভগবানের বিশ্বস্ত সৈনিক, তোমাতে আত্মবঞ্চনা সাজে না।"

সঙ্ঘ, আত্মাভিমান ও সহকর্ম্মীর অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা

ত্রিপুরা নারায়ণপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সঙ্ঘবোধের শত্রু হইতেছে আত্মাভিমান। তোমার আত্মাভিমানকে যদি কমাইতে না পার, তাহা হইলে সঙ্ঘের প্রতি মমত্ব, আনুগত্য, সমানুভূতি, সহানুভূতি তোমার জাগিবে না, কেবলি মনে হইবে যে, তুমি ইহার অভিভাবক, সঙ্ঘ তোমার শাসনের যোগ্য একটী ছোট ছেলে মাত্র। সঙ্ঘের বিস্তারের শত্রু হইতেছে, আত্মকলহ। আর আত্মকলহের প্রসূতি হইতেছে, পরস্পরের প্রতি পরস্পর দোষারোপ করিয়া অসাক্ষাতে অন্য লোকের নিকটে নিন্দা। এই অপকার্য্যটী যদি বন্ধ না করিতে পার, তাহা হইলে দলাদলিও যাইবে না, সঙ্ঘও বাড়িবে না। যতক্ষণ প্রতিটি সঙ্ঘী পরস্পরের প্রতি অক্ষুণ্ণ প্রেমের আস্পদ, ততক্ষণ তাহার বিনাশ নাই, লয় নাই, ক্ষয় নাই, ততক্ষণ শত ঝড়ঝাপটাতেও তাহার বিলোপ-সাধন

কেহ করিতে পারে না, ততক্ষণ তাহার বিপদের সুযোগ নিয়া তাহার কর্ম্মক্ষেত্র তাহার হাত হইতে কেহ কাড়িয়া লইয়া যাইতে পারে না। ভবিষ্যতে তোমাদের অবস্থা কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বর্ত্তমানে যে তোমরা পরস্পরের দোষত্রুটী সংশোধনের জন্য পারস্পরিক আলোচনা অপেক্ষা পরোক্ষে সহকর্ম্মীর নিন্দাকেই প্রশস্ততর পথ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহার প্রমাণ আমার হাতে রহিয়াছে। যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে না চাও, তাহা হইলে এখনই সাবধান হও।"

গণ্ডীর বাহিরে আত্মপ্রসারের আবশ্যকতা

শ্রীহট্ট জালালপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দীর্ঘকাল ধরিয়াই ত' ভুলের পরে তোমরা ভুলের অনুশীলন চালাইয়াছ। তোমরা প্রতিবেশীদের করিয়াছ অবজ্ঞা, বিদেশীদের করিয়াছ অবহেলা, নিজেদের ভাব, নিজেদের সাধনা ইহাদের মধ্যে বিস্তারের কোনও প্রয়াসই পাও নাই। তোমাদের এক একটা সাংস্কৃতিক অভ্যুদয় আসিয়াছে, সাম্প্রদায়িক ইতিহাসে তাহাকে যত পারিয়াছ কেবল বর্ণাঢ্য করিয়া অঙ্কন করিয়াছ, কিন্তু তোমাদের গোটা কয়জন স্বভাবতঃ আপনার-জনদের বাইরে তোমরা প্রবেশ করিতে পার নাই। মুখে বড় বড় কথা বলিয়াছ, কিন্তু আচার-বিচারের নাম করিয়া নিজেদের

কেবলই সঙ্কুচিত করিয়াছ। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদের বৈদিক-মার্গাবলম্বী করিয়াছিলেন, ইহা যেমন করিয়া সত্য, একমাত্র গুরু-নানক ছাড়া অন্য কোনও বিরাট বিশাল ধর্ম্মের অভ্যুত্থান-দানকারী মহাপুরুষ স্বভাবতঃ আপনার-জনের গণ্ডীর বাহিরে তেমন করিয়া নিজের সাধনাকে প্রসারিত করিয়া হিন্দু-সমাজের অচল অনড় আড়ষ্ট বাতব্যাধির নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া ইতিহাস কি বলিতেছে? মঠ-মন্দির-আখড়ায় বসিয়া ধর্ম্মের আদি গুরুর বন্দনা ত' তোমাদের ব্যক্তিগত বা নিতান্তই সামাজিক ব্যাপার মাত্র হইয়া রহিয়াছে! ইহার মধ্যে বিশ্বমানবের মানবীয়তার দাবীতে প্রবেশের অধিকারই বা কোথায়, প্রবেশ করিবার জন্য আকর্ষণের হেতুই বা কি রহিয়াছে? জোয়ারের জল দেখিলে যেমন করিয়া চিংড়ী-পুঁটি হইতে আরম্ভ করিয়া শৌল-বোয়াল আদি সকল মাছ নিজেদের মধ্যেকার খাদ্য-খাদকতার অহি-নকুল সম্পর্ক ভুলিয়া গিয়াও ছুটিয়া আসে, তেমন করিয়া কি বাহিরের সমাজের বাহিরের দেশের, বাহিরের সম্প্রদায়গুলির লোক তোমাদের এক একটা প্লাবনের মুখে আপন-পর ভুলিয়া আসিয়া তোমাদের সাথে মিশিয়াছে? তোমাদের হাতে হাত, তোমাদের কাঁধে কাঁধ, তোমাদের বুকে বুক, তোমাদের প্রাণে প্রাণ, মিলাইয়া দিয়া বলিতে চাহিয়াছে যে, "আজ আমরা সকলে মিলিয়া এক হইলাম, আজ আমরা বিশ্বের সহস্র বৈচিত্র্যের মাঝেও নিজেদের একত্বের সত্তাকে ফিরিয়া পাইলাম, আজ আমরা সকল খণ্ডবোধের সমাধি

করিয়া অনন্ত অসীম হইলাম?" বড় বড় মহাপুরুষ আসিয়াছেন, ভারত-জননী তাহার জন্য ধন্যা, ইঁহাদের প্রত্যেককে আমরা পূজার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বন্দনা করিব। কিন্তু তাঁহাদের আগমনে বিশ্বের মানুষ এক হইয়াছে কি? হইয়া থাকিলে, কতটা হইয়াছে? না হইয়া থাকিলে, কেন হয় নাই? বিশ্বের মানুষকে এক করিবার জন্য কি কাজ আমাদের করিতে হইবে? এই সকল প্রশ্নও ইঁহাদের পূজা করিতে বসিবার কালেই আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। এই সকল প্রশ্নের জবাব আজ আমাদের নিজ নিজ অন্তরের শুদ্ধ চেতনার কাছ হইতে আদায় করিতে হইবে। কেবল প্রথার অনুসরণ করিয়া, কেবল দশের দেখাদেখি ধর্ম্ম করিয়া আর পুণ্য করিয়া, দৈবক্রমে যে যেই সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যটীর বাহক হইয়া নিজ নিজ মঠ-মন্দির-আখড়ার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিজের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা মহামানবকেই বিশ্বের চরম শ্রেষ্ঠতার অভিব্যক্তি বলিয়া বারংবার আওড়াইতেছি এবং নিজের সেই জন্মজাত বা পরিবেশপ্রাপ্ত সংস্কারকেই জগতের একমাত্র সত্য বলিয়া চালাইয়া দিবার জন্য চারিদিকে তুমুল বিক্রমে একই কথাকে একই যুক্তিকে বারংবার শুনাইয়া শুনাইয়া মানুষের স্বাধীন ভাবে বিচার করিয়া সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে দাবাইয়া রাখিতেছি, কেবল তাহাই করিয়া ইহার সদুত্তর পাওয়া যাইবে না। ইহার সদুত্তর পাইতে হইলে বক্ষে অমিত সাহস, হৃদয়ে অসীম বল সঞ্চয় করিতে হইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতার বিকাশের

আগে হিন্দু বিশ্বকে আপন বলিয়া চিনিয়াছিল, কিন্তু আজ যখন কত কত প্রাচীন সভ্যতা মরিয়া ভূত হইয়া গেল, কত কত অর্বাচীন সভ্যতা দুনিয়াজোড়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিল, তখনো হিন্দু নিজের গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া কাহাকেও আপন করিয়া লইবার সাহস রাখে না, ইহা কি এক নিদারুণ প্রহসন নহে?"

প্রেমের বলে আপন করার গৌরব

ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সর্ব্বশক্তি একটী নিমিষে চারিদিকে সমভাবে ছড়াইয়া দিয়া সকল দিকের সকল সম্পদ যুগপৎ আহরণ করা এবং সকল দিকে ছড়াইয়া দেওয়া সকল সম্পদকে একটী নিমিষের মধ্যে একত্র একটী কেন্দ্রে আহরণ করিয়া যে-কোনও কাজে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা, এই দুইটী বিরুদ্ধ রীতিকে যদি, তোমার ব্যক্তিগত জীবনে বা তোমাদের সমাজগত সংগঠনে বা রাষ্ট্রীয় পরিশাসনে একত্র করিতে পার, মাত্র তাহা হইলেই তুমি জগজ্জয়ী।

"তোমার সকল শক্তিকে অবহেলা, অব্যবহার ও অপব্যবহার হইতে রক্ষা করিয়া প্রত্যেককে কাজে আনা এবং তোমার মধ্যে যেই সকল শক্তির কোনও উপস্থিতি লক্ষ্য মাত্রও করা যায় না, তাহাকে নিয়ত অনুশীলনের দ্বারা জাগাইয়া

তোলা, এই দুইটী বিপরীত রীতির সমাবেশ যখন তোমার জীবনে হইয়াছে, তখন তুমি দুর্জ্জয়।

"যাহারা তোমার শত্রু হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের প্রাণপণ যত্নে মিত্র করা এবং যাহারা নিয়ত তোমার শক্তির অপচয়ই ঘটাইত, তাহাদের সামর্থ্যকে তোমারই সম্পদ-বৃদ্ধিতে নিয়োজিত করা,—আবার যাহারা তোমার মিত্র সাজিয়া সতত তোমারই হিত-সাধনে রত হইয়া রহিয়াছে, কোনও কারণেই যেন তাহাদের মধ্যে শত্রু-ভাবের সৃষ্টি না হইতে পারে, তাহার দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া চলা, এই দুইটী বিপরীত রীতির যেখানে সমন্বয়, সেখানে তোমার জয়যাত্রার গতি রুদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে ত্রিজগতে কে?

"যেখানে যাহাকে দেখিতেছ শত্রু বা মিত্র, টানিয়া লও তোমার স্নেহভরা বুকে, তোমার অপার প্রেমের মধুর পরশ পাইয়া তাহার সকল শত্রুতা, সকল অসম্পূর্ণতা, সকল পরানিষ্টকরণের সামর্থ্য লোপ পাইয়া যাউক। যুদ্ধ করিয়া জগজ্জয়ী হওয়া গৌরবজনক, কিন্তু যুদ্ধ না করিয়া প্রেমের বলে সকলকে আপন করা তাহা অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী গৌরবের আশয়।"

মানুষের শ্রেণীগত ভেদ ও ধন

ত্রিপুরা গৌতমপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে ইহুদী, কে খ্রীষ্টান" এই সংবাদ আমাকে দিয়া কোনও লাভ নাই। আমার চক্ষু মানুষকে তাহার মনুষ্যত্বের পরিমাণ দিয়া দেখিতে অভ্যস্থ হইয়াছে। জীবনে মরণে সকল অবস্থায় কাহার ভিতরে মনুষ্যত্বের বিমল বিকাশ অত্যধিক, তাহা দিয়া তাঁহার বিচার আমি করিব। জগতে শত শত সম্প্রদায় যখন হইয়াছে এবং আমিও যখন একটী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ঘরেই জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অনুশীলিত সদাচার ও জীবনের মূল্যমান সম্পর্কিত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছি, তখন সম্প্রদায়কে আমি এক কথায় উড়াইয়া দিতে পারি না, কিন্তু সম্প্রদায়ই আমার সহিত অপর মানবের যোগসূত্রের নিয়ামক হইবে না। সমগ্র মানবজাতিকে মাত্র দুইটী ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়ার বিষয়ে আমার সম্মতি। একটী অমানুষের দল, অপরটী মানুষের দল। অমানুষেরা সকল জাতির সকল বর্ণের সকল সম্প্রদায়ের অঙ্গে কেবল বিভেদ-বিচ্ছেদের মারাত্মক ব্যাধির বীজাণু বহন করিয়া বেড়াইতেছে। আর মানুষেরা অমানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। শ্রেণী জগতে দুইটী, শত শত নহে। তাই আমাদের সকলের সহিত বা অধিকাংশের সহিত মিলিত হইবার বাধা অত্যল্প।

"কেহ কেহ মানুষে মানুষে শ্রেণীগত ভেদ-বিচার করিয়াছেন ধন ও দারিদ্র্য দিয়া। একদল ধনী, একদল গরীব। কিন্তু ইহা মানুষের শ্রেণী-বিচারের বিভ্রান্ত পন্থা। ধন কাহারও থাকিলেই

সে অমানুষ হইয়া যায় না, ধন কাহারও না থাকিলেই সে পশু হয় না। মানুষের মনুষ্যত্ব ধনদৌলত-নিরপেক্ষ। সেই মনুষ্যত্বের ওজন দিয়াই মানুষের ওজন হইবে। ধনকেও যেমন কাহারও মহত্ত্বের কারণ বলিয়া আমরা বিবেচনা করিব না, দারিদ্র্যকেও তেমন কাহারও গুরুত্বের যোগ্যতা বলিয়া আমরা স্বীকার করিব না। ধন হয়ত একদা সকলের মধ্যে বণ্টিত হইবে, তবুও হয়ত মানুষের সংখ্যা বাড়িবে না। ধন হয়ত জগৎ হইতে লোপ পাইবে, তবুও মানুষের সংখ্যা হয়ত বাড়িবে না। মানুষের মনুষ্যত্ব বর্দ্ধনের সহায়তা ধন যথেষ্টই করিতে পারে, কিন্তু ধনই অধিকাংশ সময়ে তাহার মনুষ্যত্ব হইতে চ্যুতিরও প্রধান কারণ। মনুষ্যত্বের প্রতি লক্ষ্যহীন ধনবান্ ও ধনহীন সমভাবে অমানুষই থাকিয়া যায়—এই সত্য ধনি-নির্ধন-নির্বিশেষে সকলকে কি শিক্ষা দিতে পার? পারিলে, জগতে মহৎ কৃতিত্ব রাখিয়া গেলে।"

প্রকৃত সেবক

ত্রিপুরা খাড্ডা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আত্মাভিমান যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন সেবকের সেবাবুদ্ধিতে মরিচা ধরা আরম্ভ করে। তখন সে নিজের প্রাধান্য কোথায় কিসে খর্ব্ব হইয়া গেল, কেবল সেই চিন্তাতেই দিবারাত্রি অধীর অস্থির থাকে, তাই অনেক স্থলে

তাহার সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানেও শিথিলতা আসিতে দেখা যায়। প্রধান সেনাপতির আদেশ একজন সাধারণ লেফটেন্যাণ্টের কাছে বরাবর না আসিলে সে যদি কাজ করিতে রাজি না হয়, মেজর জেনারেলের মধ্যবর্ত্তিতায় হুকুম আসিলে তাহা "আমি তামিল করিব না" বলিয়া যদি সে হুঙ্কার করে, তবে তাহাকে সৈন্য-বিভাগের দায়িত্ব হইতে অবসর দেওয়া হয়। তাহাকে বন্দী করিয়া কোর্ট-মার্শাল করিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। অর্থাৎ এমন সুদক্ষ সৈনিক সেনা-বিভাগের কলঙ্ক-স্বরূপ। তোমাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও তাহাই যেন রোগ হইয়াছে দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। দশ জনে মিলিয়া না করিলে যেই কাজ হইতে পারে না, দশ জনে মিলিয়াই সেই কাজের বিভাগ ও বণ্টন করিয়া দিবেন। ইহার ফলে কাহারও উপরে তত্ত্বাবধানের, কাহারও উপর কর্ম্মসম্পাদনের দায়িত্ব পড়িতে পারে। যাঁহাকে দশজনের সম্মতিতে যেই দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, তিনি তাহা পালন করিবার প্রয়োজনে কাহাকেও কিছু করিতে বলিলে তখন যদি কেহ বাহানা ধরে যে "সর্ব্বাধিনায়কের কাছ হইতে আমার কাছে সোজা আদেশ আসিবে, তবে আমি পালন করিব", তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আসলে তাহার কাজ করিবারই কোনও ইচ্ছা নাই। নিজের সেবকত্বের ঠাটটুকুই মাত্র সে বজায় রাখিতে চাহে, কিন্তু সে কাজ কিছুই করিতে চাহে না। এই ক্ষেত্রে একটু অগ্রসর হইয়া পরীক্ষা করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, স্বয়ং

সর্ব্বাধিনায়কের কাছ হইতে কোন আদেশ আসিয়া গেলেও কোনও না কোনও ছুতা বা ছল বাহির করিয়া সেবকের সম্মানলোভী এই অসেবকটী কাজকে এড়াইয়া চলিবে। দশের কাজে যেখানে একত্রিত হইয়াছ, সেখানে কে ধনী, কে দরিদ্র, বিচারের আবশ্যকতা নাই, যে যতটুকু দিয়া সহযোগ করিল, তাহাই তাহার প্রকৃত মূল্যাবধারণ করিয়া দিবে। আমি ধনী নহি বলিয়া একাকী সব কাজটুকু সমাধা করিয়া দিতে সমর্থ নহি, সুতরাং অন্যেরা আসিয়া সহযোগ দিলে আমার অসম্মান হইবে, এই জাতীয় মনের বৃত্তি লইয়া যাহারা চলে, তাহাদিগকে সেবকের ব্যাজ ধারণ করিয়া চলিতে থাকার কালেই শুধু সুন্দর দেখা যায়, নতুবা তাহাদের কদর্য্য মূরতি ঢাকিয়া রাখিবার উপায় নাই। প্রকৃত সেবক, নিরভিমান হও।"

সমবেত উপাসনার গুরুত্ব

কুমিল্লা-শ্রীরামদী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এই একটা কথাকে তোমরা স্থায়ী সত্য রূপে বিশ্বাস করিও যে, যেখানে সমবেত উপাসনা রহিয়াছে, সেইখানেই আমি বিরাজ করিতেছি। আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ প্রত্যক্ষ ভাবে সেখানে থাকুক বা না থাকুক, আমি আমার সর্ব্বস্বরূপ লইয়া সেইখানে অবস্থান করিতেছি। তোমরা আমার সন্তান, আমার বাক্যকে বিশ্বাস করিও। তোমরা আমার সন্তান, আমার

বাক্যকে প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিও। যেখানে সমবেত উপাসনা নাই, আমিও সেখানে নাই। আমাকে ভালবাসিয়াছ বলিয়া যদি মনে ধারণা করিয়া থাক, তাহা হইলে সকল যুক্তি সকল তর্ককে সিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়া অন্ধের মতন আমার এই নির্দ্দেশ পালন করিও যে, যেখানে অসম্ভব নহে, সেইখানেই তোমাদের সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া আমার সহিত সপ্তাহে একটী দিন মিলিত হইতেই হইবে। আমি আমার সন্তানদের ছাড়িয়া কি সুখে ও আনন্দে বাস করিতে পারিব? আমার সন্তানেরা সমবেত উপাসনার দিনে সকলে মিলিয়া একসঙ্গে আমার স্নেহের ক্রোড় আসিয়া অধিকার করিয়া বসুক, ইহা যে আমার নিত্যকামনা।

অলসতা ও ভীরুতা

যশোহর কেশবপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অলসতা ও ভীরুতা এই দুই সখী মিলিয়া তোমার জীবনের সকল সাফল্যের সম্ভাবনাকে নখে কুটিয়া নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। তুমি ইহাদের আগে বধ কর। ফুল না ফুটিতে মুকুলে যাহারা তাহাকে ছিঁড়ে, তাহারা ক্ষমার অযোগ্য শত্রু।"

ব্যাধি ও ব্রহ্মচর্য্য

ফরিদপুর খান্-খানানপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ঋণ, অগ্নি ও রোগ,—এই তিনটীর পারতপক্ষে শেষ রাখিতে নাই। একেবারে নিঃশেষে ইহাদের চুকাইয়া, নিবাইয়া, নিরাময় করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। ঋণ-পরিশোধে অপব্যয় কমাইয়া সঞ্চয়ে ব্রতী হইতে হয়, অগ্নি-নির্ব্বাপণে জলের অপব্যবহার কমাইয়া ঠিক প্রয়োজনীয় স্থানে তাহা ঢালিতে হয়, আর রোগ-নিরাময়ে ঔষধাদি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ব্রহ্মচর্য্য ও মানসিক পবিত্রতার অনুশীলন করিতে হয়। তাহা হইলেই আশা করা সঙ্গত যে, রোগ সমূলে নির্মূল হইবে। সেই দিকে খেয়াল রাখিয়া চলিও, কেবল হা-হুতাশ এবং ঔষধের ফর্দ্দ মুখস্থ করিয়া তাহা হইবে না।"

নাটঘর কিম্বা খড়িয়ালা হইতে সাধু-ফকীর শ্রেণীর সাধন-পরায়ণ এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন।

ভগবদ্দর্শন কাহাকে বলে

সাধুজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, আমি মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। কখনো দেখ্ছি যেন গুরুদেব এসে দেখা দিচ্ছেন, কখনো বা আমার ইষ্টমূর্ত্তি এসে দেখা দিচ্ছেন, কখনো গুরুমূর্ত্তি দেখ্তে না দেখ্তে ইষ্টমূর্ত্তিতে পরিণত হ'য়ে গেলেন, কখনো ইষ্টমূর্ত্তি দেখ্তে না দেখতে গুরুমূর্ত্তিতে পরিণত হ'য়ে গেলেন, কত রকমের কথা শুনি, কত রকমের উপদেশ

পাই, এই রকম কত কি স্বপ্নে দেখি। আচ্ছা বাবা, একেই কি বলে ভগবানের দর্শন লাভ করা?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না বাবা, একেই ভগবদ্দর্শন বলে না। ভগবদ্দর্শন কি রকম জানো? তাতে দর্শন থাকে কিন্তু দ্রষ্টার আর নিজের কথা মনে থাকে না; দর্শন কবে সুরু হ'ল, কখন শেষ হবে, তার কোনো অনুভূতি থাকে না; সে দর্শন নিত্য দর্শন, চিরন্তন দর্শন, অবিরাম, অবিশ্রাম, অসীম, ও চিরস্থায়ী দর্শন; লয় নেই, ক্ষয় নেই, সীমা নেই, শেষ নেই, অনুভূতির তারতম্য নেই, আর কোন্ ইন্দ্রিয়ের শক্তি দ্বারা এই দর্শন চলেছে, তার কোন নিশানা পর্য্যন্ত নেই।

সাধুজী বলিলেন,—আর একটু পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিন বাবা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনে কর, তোমার রসনার অগ্রভাগে একখণ্ড মিশ্রি ছুঁইয়ে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তুমি তার মিষ্টি আস্বাদন অনুভব কত্তে লাগ্‌লে। এটাও একপ্রকারের দর্শন,—চ'খ দিয়ে নয়, জিভ দিয়ে,—তবে শান্ত দর্শন, অনিত্য দর্শন। কিন্তু জিভে মিশ্রির স্পর্শমাত্র শুধু জিহ্বাটীতেই মিষ্টি আস্বাদন না হ'য়ে যদি তোমার সমগ্র শরীরের প্রতি রোমকূপে, প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে, প্রতি অণুতে, প্রতি পরমাণুতে সেই সুখাস্বাদন অনুভূত হ'তে থাকে, তবে বল্‌ব যে, তোমার দর্শন ব্যাপকতর হচ্ছে, বৃহত্তর হচ্ছে, অনিত্যতার অপবাদ কাট্‌বার পথে সে চলেছে। সেইখানেই থাম্‌ল না। সাম্‌নে মিশ্রির শুভ্র মূর্ত্তি ফুটে

উঠ্‌ল, প্রত্যেক দানায় দানায় যেন সূর্য্যরশ্মির সম্পাত হ'তে লাগ্‌ল, আর লাল, নীল, সবুজ, হলদে, জরদ, পাটল প্রভৃতি কত বর্ণের রামধনুর খেলা সুরু হ'য়ে গেল। অনন্ত আকাশ জু'ড়ে যে মহাসঙ্গীত অবিরাম ভেসে বেড়াচ্ছে, ঐ মিশ্রিখণ্ডের এক একটা ভিন্ন ভিন্ন Crystal এর (দানার) এক একটা Curvature এ (বক্রাংশে) তার কি যেন অপূর্ব্ব ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, অনুধ্বনি, ঝঙ্কার ও অনুরণন উঠ্‌তে লাগ্‌ল, মনে হ'তে লাগ্‌ল একসাথে যেন লক্ষকোটি সঙ্গীত-বিশারদ কোটির অধিক রেডিয়োর মারফতে অনাদি যুগ থেকে মন্দ্রিত তাঁদের সঙ্গীত-লহরীর মূর্চ্ছনা প্রেরণ ক'রে দিচ্ছেন, অথচ একটী গানের ছন্দে বা সুরে অপর একটী গানের ছন্দের বা সুরের যতি ভঙ্গ হচ্ছে না। এই ভাবে একটুখানি দর্শনের বা উপলব্ধির ভিতর দিয়ে, যখন অনন্ত অফুরন্ত অসীম দর্শনের বা নিত্য উপলব্ধির দুয়ার খুলে যায়, তখন বুঝ্‌বে যে, ভগবদ্দর্শন হয়েছে।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কথা

সাধুজী শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে ঐ একই কথা বারংবার শুনিতে চাহিলেন এবং শ্রীশ্রীবাবামণিও নানাভাবে ঐ এক কথাই প্রসন্ন অন্তঃকরণে বারংবার শুনাইতে লাগিলেন।

সাধুজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি ত' বাবা বিরক্ত হচ্ছেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিরক্ত? এর চাইতে প্রিয়তর কথা আমার জীবনে আর কি আছে যে, এ কথা কইতে বিরক্ত হ'ব?

নিত্যদর্শনের নমুনা

সাধুজী একান্ত অভিনিবেশ সহকারে একই কথা বারংবার শ্রবণ করিলেন, কিয়ৎকাল ধীরভাবে কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিয়া নিজের উপলব্ধির সহিত মিলাইলেন এবং তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

আচ্ছা বাবা, আমি যে সকল দৃশ্য স্বপ্নে দেখি, সেগুলি তবে কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেইগুলি হচ্ছে নিত্যস্বরূপ-দর্শনের নমুনার প্যাকেট মাত্র। লিপটন টি কোম্পানী চা বিক্রী করে ত'? যাতে লোক নিত্য চা পান করে, সেই উদ্দেশ্যে তারা দুয়ারে দুয়ারে এসে বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ ক'রে যায়। সেই নমুনার চায়ের সুঘ্রাণ দেখে লোকে শেষে চায়ের যাবজ্জীবন নেশা করে। তোমাকেও তেমনি নিত্যদর্শনের সুখাস্বাদনের দু-একটা নমুনা এভাবে উপহার দেওয়া হচ্ছে। এতে উৎসাহিত হ'য়ে তুমি তোমার সাধন-ভজনের উদ্যম বাড়াবে। ফলে নিত্য-স্বরূপ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ হবেন।

সাধুজী পরিতৃপ্ত চিত্ত লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

হরিওঁ-কীর্ত্তনে সর্ব্বজনীন অধিকার

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওঁ-শব্দ অব্রাহ্মণ কারো উচ্চারণ কর্ব্বার অধিকার নেই। এমতাবস্থায় হরিওঁ-কীর্ত্তন কি সকলেই কত্তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সবাই কত্তে পারে কি না, তাই আগে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখো না। ডাকো চামার, চণ্ডাল, ডোমকে; ডাকো দুলে, বাগদী, হাড়িকে; ডাকো মুচি, মেথর, শুঁড়িকে; ডাকো দাসীপুত্র, গণিকা-পুত্র, জারজকে; ডাকো হীন, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যকে; ডাকো দুনিয়ার যত অনাচরণীয়কে, যত অপাংক্তেয়কে। সবাইকে একবার মধুর হরিওঁ-কীর্ত্তন গেয়ে শোনাও, আর তারপরে বল যে, চেষ্টা ক'রে তারা দেখুক যে, তারাও হরিওঁ-কীর্ত্তন কত্তে পারে কি না, নাকি কীর্ত্তন-কালে তাদের কণ্ঠ আটক প'ড়ে যায়। আমাকে প্রশ্নের প্রয়োজন কি হে? একবার পরীক্ষা ক'রেই দেখ না কেন?

ওঙ্কারের আশ্চর্য্য মহিমা

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—না, আমি জান্‌তে চাই যে, শাস্ত্র-বচন সর্ব্ব-জাতির পক্ষে ওঙ্কার উচ্চারণ ও হরি-ওঁ কীর্ত্তন সমর্থন করে কি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার সে কথা আমি বুঝেছি। কিন্তু শাস্ত্র অপার জলধি। তাতে একস্থানে যার সমর্থন পাবে,

আর এক স্থানে তারই প্রতিবাদ পাবে। এক শাস্ত্রে যার বিধি, অপর শাস্ত্রে তারই নিষেধ। এক শাস্ত্রে যার প্রশংসা, অপর শাস্ত্রে তারই নিন্দা। কিন্তু শাস্ত্র-বচনে যদি সমর্থন শুনতে চাও, তবে বিখ্যাত স্থানগুলির শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে যাও, পাঁচ সিকে প্রণামী দিলে যে কথা তুমি সমর্থন কত্তে বল্‌বে, তারই সমর্থক বচন তাঁরা ঐ মহাসমুদ্রের তলদেশে ডুবে ঠিক্ ঠিক্ আহরণ ক'রে দেবেন। শাস্ত্র সমর্থন করেন কি না, এটা কি একটা প্রশ্ন হয় বাছা? হিন্দু-শাস্ত্রের মূলই হচ্ছেন ওঙ্কার, এই ওঙ্কার থেকে সব মন্ত্রের, সব তন্ত্রের, সব পন্থার জন্ম। এই ওঙ্কারের শক্তিতে আর্য্য সভ্যতা দ্রাবিড়দের উদরস্থ ক'রে তাদের দিয়ে বৈদিক উপাসনা করিয়ে নিল। এই ওঙ্কারের অমোঘ প্রতাপে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কত অনার্য্য সভ্যতা অবহেলে আর্য্যদের জঠরে জীর্ণ হ'য়ে গেল। এই ওঙ্কারের আশ্চর্য্য শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঐতিহ্য এসে একত্র মিশে এক হ'ল। যে ওঙ্কার এমন সব অসাধ্য সাধন করেছেন, ভবিষ্যতে তিনি আরও অসাধ্য-সাধন কর্ব্বেন। সুতরাং কোন্ শাস্ত্র স্বপক্ষে বলেছেন, কোন্ শাস্ত্র বিপক্ষে বলেছেন, এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে জীবনের যে দুটী দিনের পরমায়ু এখনো হাতের গণায় রয়েছে, সেই দুটী দিন প্রাণ ভ'রে মন ভ'রে হৃদয় ভ'রে হরি-ওঁ-কীর্ত্তন ক'রে জীবন সার্থক কর।

হরি-ওঁ কথার মানে

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হরি-ওঁ কথার মানে কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হরি-ওঁ শব্দের এই মানে যে, পবিত্র ওঙ্কার আমার সর্ব্ব পাপ হরণ করেন। ওঁ হচ্ছেন এখানে বিশেষ্য আর হরি হচ্ছে তার বিশেষণ। যিনি আমার সর্ব্বপাপ, সর্ব্বতাপ, সর্ব্ব আধি, সর্ব্ব ব্যাধি, সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব ক্লেশ হরণ ক'রে আমাকে শান্তি, তৃপ্তি, অভয় ও আনন্দ দান করেন। কিন্তু সব হরণ ক'রে যিনি আমাকে দেন শান্তি আর তৃপ্তি, অভয় আর আনন্দ, তিনি কি আর আমার পর থাক্‌তে পারেন? তিনি যে আমার আপনার আপন, জীবনের জীবন, হৃদয়ের হৃদয়, পরাণের পরাণ, আত্মার আত্মা, অস্তিত্বের অস্তিত্ব। তখন তিনি আমাকেও আহরণ ক'রে তাঁর নিজের স্নেহের ক্রোড়ে সোহাগের বুকে তুলে নেন। তখন হয়, "হরি-ওঁ" শব্দের মানে "আমাকে সর্ব্বতোভাবে নিজের ভিতরে গ্রহণকারী পরমাশ্রয় ওঙ্কার।" কিন্তু তিনি শুধু আমাকে আহরণ ক'রেই কি নিজের লীলা নিজের ভিতরে সংবৃত ক'রে নেন? না, তা' নয়। তিনি আমার মত কোটি কোটি জীবকে এভাবে নিজের ভিতরে আহরণ ক'রে নিচ্ছেন,—বাইরের সহস্র সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ভিতরেও একমাত্র তিনিই যে সকলের সমন্বয়ের সূত্র, তিনিই যে বহুপ্রসারী মহাবৃক্ষের সহস্র সহস্র বিভিন্ন আয়তনের পত্রাবলীর একমাত্র রস-সঞ্চারক, তাঁর দরুণই ফু'টে সব ফুল যে তাঁরই পায়ে

অঞ্জলি-রূপে পড়ে, একথা প্রকৃষ্ট-রূপে অনুভূতিগম্য করিয়ে দিয়ে তিনি যে কোটি চন্দ্র, কোটি সূর্য্য, কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের ভিতরে আকর্ষণ ক'রে নিচ্ছেন এবং সকলকে আহরণ ক'রে নিয়ে সকলের সমাহারের ভিতরেও নিজেকে এক অত্যাশ্চর্য্য মহিমায় পৃথক্ ক'রে ধ'রে রেখে জ্ঞানের সাথে প্রেমের খেলা খেলছেন! তখন "হরি-ওঁ" মানে "সর্ব্বাহারক ওঙ্কার।" নিখিল বেদ, জগতের যাবতীয় শাস্ত্র, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত, অনুভূত ও অননুভূত সকল জ্ঞান তাঁরই কাছ থেকে ছুটে এসে চতুর্দ্দিকে একটা সৃষ্টির তরঙ্গ খেলে নিয়ে পুনরায় তাঁর মধ্যেই সমাহৃত হচ্ছে। এই হচ্ছে হরি-ওঁ কথার মানে। তুমি কি সাকার ব্রহ্মের পূজা কর, না, নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান কর? তুমি কি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর, না, নির্গুণ ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত কর? সকলই ঐ একমাত্র ওঙ্কারের ভিতরে আহৃত। এই হচ্ছে হরি-ওঁ কথার মানে। "কোনো পূজা, কোনো পূজক, কোনো নৈবেদ্য, কোনো অঞ্জলি, কোনো নিবেদন, কোনো আরাধন, কোনো ত্যাগ, কোনো তপস্যা এই ওঙ্কারের বাইরে নেই",—এই হ'ল "হরি-ওঁ" কথার মানে।

হরি-ওঁ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হরি-ওঁ কীর্ত্তন কর, সর্ব্ব-জাতি সর্ব্ববর্ণের ভেদবিচ্ছেদ-বিসম্বাদ বিদূরণের জন্য। হরি-ওঁ কীর্ত্তন কর, অধঃপতিতের প্রাণে আশার প্রদীপ জ্বেলে ধ'রে তাকে

উপরে উঠবার উৎসাহ-প্রেরণা জোগাবার জন্য। হরি-ওঁ কীর্ত্তন কর, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ বিদূরণের জন্য। হরি-ওঁ কীর্ত্তন কর, একদা যাঁরা ছিলেন পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতম প্রদেশের উন্নততম কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠানুভূতির সর্ব্বাধিকারী পরন্তু অসাধনে অভজনে অতপস্যায় অনাচারে আজ নেমে এসেছেন পর্ব্বতের তলদেশস্থ গভীর গুহার গহন-তিমিরাবৃত আপৎসঙ্কুল অন্ধতায়, তাঁদের পুনরুত্থানকে সম্ভব করার জন্য। দ্বিজ-চণ্ডালে কোলাকুলি হোক আজ হরি-ওঁ কীর্ত্তনের অপার মহিমাতে, কিন্তু দ্বিজ যেন চণ্ডাল না হয়, চণ্ডালই যেন ব্রাহ্মণত্বের বিমল বিভায় দিগ্দেশ উদ্ভাসিত করে।

হরি-ওঁ কীর্ত্তনের সুর, লয়, মান প্রভৃতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমবেত উপাসনার কালে হরি-ওঁ কীর্ত্তন সর্ব্বত্র একটীমাত্র সুনির্দ্ধারিত সুরে কর্ব্বে, কখনো এর ব্যতিক্রম ক'রো না। অন্য সময়ে কীর্ত্তন কত্তে গিয়ে যখন যেখানে যে সুরটীর সংযোগের দ্বারা নাম-কীর্ত্তনকারীদের কীর্ত্তন সহজে জমাট হবে, তখন তারই সংযোগ কর্ব্বে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য নামে মনের অভিনিবেশকে বর্দ্ধিত করা, গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে নিদ্রিত শিশুকে বিভীষিকা-গ্রস্ত করা নয়। সুর হবে ধ্যানাবেশের অনুকূল, লয় হবে অন্তরের প্রেমভাবের প্রবর্দ্ধক, তান হবে অনুচ্চ অনিম্ন কিন্তু কর্ণের শ্রবণেচ্ছা-বর্দ্ধক,

শরীরের আন্দোলনাদি হবে সংযত, সুবিন্যস্ত, অকৃত্রিম ও আত্যন্তিকতা-বর্জ্জিত, বাদ্যযন্ত্রাদি হবে মূলের অনুগত ও অনুদ্ধত। সমবেত উপাসনার কালে তাল বা সুরের কোনও যন্ত্র বাজবে না। অন্য সময়ের কীর্ত্তনে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করবে।

শিবপুর (কুমিল্লা)
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

গৃহী শিষ্যের পক্ষে সন্ন্যাসী গুরু

একজন প্রশ্ন করিলেন,—গৃহীদের পক্ষে সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা নেওয়া নাকি অবিধি? সন্ন্যাসী গুরুর পক্ষেও নাকি গৃহীকে দীক্ষা দেওয়া দোষ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'আশ্রমী' গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার কথা আছে। 'আশ্রমী' বল্‌তে কেউ কেউ বুঝেছেন, গৃহস্থাশ্রমী। তাঁদের যুক্তি এই যে, সর্ব্বাশ্রম-পরিত্যাগীই হচ্ছেন সন্ন্যাসী, সুতরাং সন্ন্যাসীকে আশ্রমী বলা চলে না। কিন্তু কেউ কেউ 'আশ্রমী' বল্‌তে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রম চতুষ্টয়ের ভিতরে যে-কোনও আশ্রমের মর্য্যাদা-রক্ষাকারীকে বুঝেছেন। এঁদের মতে ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ বা বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী এঁরা যে-কেউ উপযুক্ত হ'লে শিষ্যত্বে দীক্ষা দিতে পারেন। সেই শিষ্যও গৃহীই হবেন বা ত্যাগীই হবেন, এর কোনো কথাই নেই। সেবা, পরিপ্রশ্ন ও প্রণিপাত নিয়ে যে-কেহ নিজেকে গুরুর শাসনাধীন করার জন্য কাতর

মিনতি ক'রে প্রপন্ন হবে, তাকেই গুরু দীক্ষা দিতে পারেন। গুরুর প্রয়োজন গুরুত্ব, শিষ্যের প্রয়োজন প্রপন্ন হওয়া। এই দুইটী হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। কে গৃহী আর কে সন্ন্যাসী, সে প্রশ্ন তার পরে। শুকদেব ত্যাগী, কিন্তু গৃহী জনক তাঁর উপদেষ্টা। আর রাষ্ট্রপতি শিবাজী গৃহী, আর সন্ন্যাসী রামদাস স্বামী তাঁর গুরু। তবে সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য গৃহী মণ্ডন মিশ্রকে শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে আর গৃহী থাক্‌তে দেন নি, সন্ন্যাসী ক'রে নিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর শিষ্য শ্রীগৌরাঙ্গ সংসার ত্যাগ করেছিলেন। এই সকল দেখে গৃহীদের পক্ষে সন্ন্যাসীর শিষ্য হওয়াতে ভয় আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসের প্রতি অপরিসীম পক্ষপাত থাকা সত্ত্বেও গৃহী শিষ্য থাকা অসম্ভব হয় নি, সন্ন্যাসী ভোলা-গিরি হাজার হাজার গৃহীকে দীক্ষা দিয়ে ধর্ম্মাশ্রয়ী করেছেন, সুতরাং গৃহীদের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু অনেকের দৃষ্টিতে গুরুদেব হচ্ছেন, হল্‌দির গুঁড়ো। হরিদ্রার চূর্ণ যেমন সব তরকারীতে লাগে, গুরুদেবটীকেও তেমন সব কাজে পাওয়া চাই। পাঁজি দেখে গৃহপ্রবেশের, ধান্যরোপণের, শষ্যকর্ত্তনের, দ্বিরাগমনের, সাধভক্ষণের, বিদেশগমনের দিন-ক্ষণ-লগ্ন তিনি ব'লে দেবেন, আবার বৎসরান্তে সালতামামির হিসাব-পত্র তিনিই খতিয়ে দেখবেন যে, শিষ্যের কোন্ প্রজা এখনো খাজনা পৌঁছে দেয় নি, কোন্ খাতক এখনো সুদ চুকিয়ে দেয় নি, শিষ্যের কন্যার বর খোঁজা, শিশু-পুত্রের জন্য প্রাইভেট টিউটার জোগাড় করা,

শিষ্যের গোয়ালের জন্য একটী দুগ্ধবতী ভাল গাভী এনে দেওয়া, এ সবও তাঁরই কাজ। অনেক হতভাগা যেমন বিয়ে ক'রে শ্বশুর-বাড়ীতে ঘর-জামাই থাকে, এসব গুরুরা তেমন মন্ত্র দিয়ে তারপরে শিষ্যের বাড়ীর পোষ্য হ'য়ে থাকে। গুরুদেব সম্বন্ধে যাদের ধারণা এইরূপ বিকৃত, তাদের পক্ষে গৃহস্থ গুরু ছাড়া অন্য গুরুর ছায়া থেকেও এক যোজন দূরে থাকা ভাল।

অন্ধ-খঞ্জের অভিক্ষা

অতঃপর অভিক্ষা সম্পর্কে কথা উঠিল। একজন বলিলেন,—যারা অন্ধ, খঞ্জ বা অঙ্গহীন, তারা ভিক্ষা না করলে তাদের পেট চল্‌বে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতের চল্লিশ কোটি লোক সবাই ত' আর অন্ধ, খঞ্জ, অঙ্গহীন নয়! শতকরা দু-এক জনই হয়ত অঙ্গহীন, তাই উপার্জ্জনে অক্ষম। যারা অঙ্গহীন নয়, আমি তাদেরই অভিক্ষু কত্তে চাচ্ছি। কিন্তু জীবিকার হিসাবে ভিক্ষা করার চাইতে ভগবানের করুণায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে নির্ভর করা অন্ধ, খঞ্জ, অঙ্গহীনের পক্ষেও অধিকতর লাভজনক। যে ভিক্ষা কচ্ছে, সে যা পায়, যে নির্ভর ক'রে পড়ে আছে, সে তার চেয়ে অনেক বেশী পায়।

সাধন-জীবনের অহমিকা ও ভিক্ষান্ন

প্রশ্ন হইল,—সাধন-জীবনে যে অহমিকা আসে, তা খর্ব্ব

করার জন্য প্রত্যেক সাধকেরই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না বাছা, তা' নয়। অহঙ্কার এমনি একটা ভয়ঙ্কর জিনিষ যে, ভিক্ষার রন্ধ্র-পথেও সে অনায়াসে প্রবেশ কত্তে পারে। একজন সম্মান-সম্ভ্রম-সম্পন্ন প্রখ্যাত ব্যক্তি ভিক্ষা কত্তে বে'র হ'য়ে এ কথা মনে মনে ভাবতে পারেন,—"দেখ ত' তোমরা, আমি কেমন বিনয়ী, লাখপতির ছেলে হ'য়েও ঘৃণ্য গরীব লোকদের দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ কচ্ছি না!" বিনয়ের দীন আচ্ছাদনে অনেক সময়ে অভ্রচ্ছেদী গর্ব্ব লুকিয়ে থাকে হে, যা তোমরা বাইরে থেকে ঠাওরই পাবে না। এই গেল এক দিক। অপর দিক হচ্ছে এই যে, নগণ্য সমাজ-সম্ভ্রম-হীন অপরিচিত লোকেরা যখন ভিক্ষা কত্তে বেরোয়, তখন তাদের নগণ্যতাই তাদের মহদুদ্দেশ্যকে পণ্ড করে। নগন্য লোকের আবার মান-সম্মান কি যে, তা আবার ভিক্ষা দ্বারা খর্ব্ব হবে? মোটা কথা,—"এস হে, আমরা ভিক্ষা ক'রে খাই, তাতে আমাদের অহমিকা ক'মে যাবে,"—এই জাতীয় কথা ব'লে তোমরা যথেষ্ট আত্মবঞ্চনা করেছ। ভিক্ষা কত্তে সবাই শিখেছ কিন্তু ভিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ বিস্মরণ ঘটেছে। 'তুই কায়স্থ-বৈষ্ণব হ'য়ে কি না এসে আমার উপরে চালাকী কচ্ছিস। জানিস, আমি বামুন-বৈষ্ণব?"—এক ভিক্ষুক যখন অপর ভিক্ষুককে এই কথা বল্‌তে প্রলুব্ধ হয়, তখনই বুঝ্‌তে হবে যে, ভিক্ষার দ্বারা অহমিকা বিন্দুমাত্রও খর্ব্বতা লাভ করেনি, যার যার

আত্মাভিমান পুরা মাত্রাতেই বিদ্যমান রয়েছে,—ভিক্ষান্নগ্রহণ একটা ছলনা মাত্র। সাধন-জীবনে যে অহমিকা আসে, তা' খর্ব্ব করার জন্য প্রত্যেকের প্রয়োজন এক দৃষ্টিতে নিরন্তর আত্মপরীক্ষণ, অপর দৃষ্টিতে অনুক্ষণ ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ। ভিক্ষা করা এবং ভিক্ষান্ন উদরস্থ করা, এ দুটা অতীব স্থূল কাজ। আত্মাভিমান নাশ করার উপায় এত স্থূল নয়।

ভিক্ষান্ন পবিত্র কেন

প্রশ্নকর্ত্তা।—তবে ভিক্ষান্নকে এত পবিত্র বলা হয় কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিরন্তর যিনি ভগবচ্চিন্তন করেন, তাঁর পক্ষে নিজের জীবিকা নিজে অর্জ্জন করা ভজন-বিঘ্নকর। যতটা সময় তুমি অন্নার্জ্জনে দেবে, ততটা সময় তোমার ইষ্টচিন্তা, ইষ্টধ্যান থেকে বাদ প'ড়ে যাবে। সুতরাং তুমি এমন স্থানে যেও, যেখানে অল্প সময়ে অন্ন মিলে। তাতে নিরাপদে সাধন-ভজন করার জন্য সময় বেশী পাওয়া যাবে। ভগবানকে ডাকাই যখন তোমার জীবনের পরম পুরুষার্থ, তখন অল্প সময়ে সুভিক্ষ দেশে যা' দুমুঠা মিলে, তাই দিয়ে নির্লোভ চিত্তে দেহ-পোষণ কর। এই হচ্ছে ভিক্ষা-গ্রহণের প্রকৃত তাৎপর্য্য। লোভহীন অন্ন মাত্রেই পবিত্র। এজন্যই তোমার ভিক্ষান্ন পবিত্র। আর, নির্লোভ ব্যক্তিকে লোকে দানও করে পরম শ্রদ্ধায়। এজন্য ভিক্ষান্ন পবিত্র।

সাধকদের ভিক্ষা-গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কি ভাবে ভিক্ষাটন কত্তেন জানো? প্রাতঃকাল থেকে বেলা দশটা অবধি বিহারে ব'সে ধ্যানাদি কার্য্য হ'ল। তারপরে ভিক্ষু চল্লেন দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে জনপদের দিকে। কারো গৃহে গিয়ে বল্লেন না যে, খেতে দিতেই হবে। রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছেন যোগী, যতি, মহাত্মা। যার প্রাণে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা এল, সেই গৃহস্থই ডেকে নিয়ে এল তাঁকে নিজের ঘরে। পৃথক্ কোনও আয়োজন নেই, অতিরিক্ত কোনো আড়ম্বর নেই, যার গৃহে যে দিন যে খাদ্য রন্ধন করা হ'য়েছে, নিঃসঙ্কোচে সেই খাদ্যই ভিক্ষুর সামনে পরিবেশিত হ'ল। ভিক্ষু পবিত্র চিত্তে আহার কর্লেন, তারপরে গৃহস্থের গৃহ ত্যাগের আগে প্রভু বুদ্ধের কিছু উপদেশ তাকে শ্রবণ করিয়ে নিজের বিহারে ফিরে এলেন। অর্থাৎ ধ্যান-জপই তাঁর জীবনের প্রধান কাজ, নিতান্তই পেটটাকে ঠাণ্ডা না রাখ্‌লে সে কাজ নির্ব্বিবাদে চলে না, তাই একবার বিহারের বাইরে গিয়ে পেটটার তাগাদা মিটিয়ে আসা। সাধক-জীবনে যদি ভিক্ষার একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহ'লে ভিক্ষার উদ্দেশ্য হবে একমাত্র এইটী। "মান-অভিমানের বোধকে খাটো কচ্ছি,"—এ কথা ব'লে ভিক্ষা করা আর লোকের চোখে এক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করা, এক কথা। মান-অভিমান খাটো

করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে ঐ ঘৃণ্য মুচিকে ভগবানের সৃষ্ট জীব জেনে দৈনিক তার চরণযুগল গঙ্গাজলে ধৌত ক'রে বিনয় অনুশীলন কত্তে পার, কিম্বা বিষ্ঠাভোজী কুকুরটার ভিতরেও তোমার চেয়ে অনেক বেশী প্রভুভক্তি আছে স্মরণ ক'রে তাকে ত্রিসন্ধ্যায় প্রণাম ক'রে আত্মাভিমান খর্ব্ব কত্তে পার। কিন্তু তা' তোমরা করবে না, কর্‌লে জাত যাবে। যে কাজটি কর্ল্লে সদ্য সদ্য পেটটী বিনা কষ্টে পূর্ণ হয়, তাই কর্ব্বে, আর বড়াই ক'রে বল্‌বে,—"আত্মাভিমান কমাচ্ছি।"

দাস রঘুনাথ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দাস রঘুনাথের জীবন দেখ। গেলেন নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শন কত্তে, মহাপ্রভু সাদরে নিজ প্রসাদ দিলেন। রঘুনাথ ভাবলেন, এই পরমোৎকৃষ্ট প্রসাদ প্রত্যহ পেলে শেষে জিহ্বার লালসা বেড়ে যাবে। "জিহ্বার লালচে জীব ইতিউতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।" সুতরাং তিনি জগন্নাথদেবের মন্দির-দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষা ক'রে জীবন ধারণ কত্তে লাগ্‌লেন। কিন্তু দুদিন পরেই আত্ম-পরীক্ষা এল। মনঃসমীক্ষা ক'রে তিনি দেখলেন—ভিক্ষুকের মনোভাব আর গণিকার মনোভাব তুল্যরূপ। ঐ যে মানুষটী আসছে, তার কাছে বুঝি কিছু মিল্‌বে, রোজই ত' দেয়, না আজ ত' কিছুই দিল না; ঐ যে মানুষটী আস্‌ছে, সে ত' কোনো দিনই কিছু দেয় না, তবে আর আজ কিছু দেবে না,

তার কাছে আশা ক'রে কি হবে, কিন্তু বাঃ, আজ ত' দরাজ হাতে দান কর্ল্লে রে,—ইত্যাদি। সাধকবীর দাস রঘুনাথ দেখ্‌লেন যে, যে পবিত্র ভিক্ষান্নের এত প্রশংসা-কীর্ত্তন হয়েছে, সেই ভিক্ষান্ন নিতে গেলে লক্ষপতির একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী রঘুনাথের মনে অপমান বোধ হয় না, কিন্তু আশা-প্রত্যাশার হীন নীচ অবাঞ্ছিত চিন্তা এসে তরঙ্গ খেলে। তাই তিনি ভিক্ষান্নও পরিহার কর্ল্লেন এবং নর্দ্দমায় নিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত পচা ভাত কুড়িয়ে এনে তাই জলে ধৌত ক'রে মহাপ্রসাদ জ্ঞান ক'রে গ্রহণ ক'রে সাধন-জীবন ধারণ কত্তে লাগলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প'ড়ে দেখো যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই অন্নকে কত সমাদর দিয়েছেন। রঘুনাথ কি খান, এই খোঁজ নিতে এসে শ্রীচৈতন্য এই দৃশ্য দেখে রঘুনাথের অন্নথালিকা থেকে নিজ হাতে কেড়ে নিয়ে এই অপূর্ব্ব প্রসাদ স্বয়ং আস্বাদন ক'রে তৃপ্ত, পরিতৃপ্ত, পরমতৃপ্ত হয়েছিলেন।

ভিক্ষান্ন কখন পবিত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভিক্ষান্ন পবিত্র বল্‌ছ ত? কিন্তু ভিক্ষান্ন পবিত্র কখন? যখন ভিক্ষান্ন দ্বারা সাধকের সাধনবৃদ্ধিতে, যোগীর যোগবৃদ্ধিতে, তপস্বীর তপোবৃদ্ধিতে, মহাপুরুষের মহত্ত্ববৃদ্ধিতে, কর্ম্মীর কর্ম্মবৃদ্ধিতে, জ্ঞানীর জ্ঞানবৃদ্ধিতে সহায়তা জন্মে, ভিক্ষান্ন তখনই পবিত্র। আর যখন ভিক্ষান্নের দ্বারা অলসের হয় আলস্যবৃদ্ধি, তমসাচ্ছন্নের হয় তমোবৃদ্ধি,

জড়বুদ্ধির হয় জড়তাবৃদ্ধি, পরাধীনের হয় পরমুখাপেক্ষিতাবৃদ্ধি, মূর্খের হয় মূর্খতাবৃদ্ধি, ক্লীবের হয় ক্লৈব্যবৃদ্ধি, দুর্বৃত্তের হয় দুর্বৃত্ততাবৃদ্ধি, তখন ভিক্ষান্ন পরম অপবিত্র, পরম অশ্লাঘ্য, পরম ক্ষতিকর। মুখে বল্‌ছি,—"ভিক্ষান্ন পবিত্র," কিন্তু অধিকাংশেরই ত' অন্তরের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, বিনা পরিশ্রমে দিন গুজরাণ করা! আমরা যে বাছা চূড়ান্ত আত্ম-প্রতারক!

ভিক্ষুকের অভাবে দাতার অবস্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ কেউ একথাও ব'লে থাকেন যে, ভিক্ষুক না থাক্‌লে দাতার দান করার ক্ষমতা আস্তে আস্তে লোপ পাবে। শুনেছি নাকি জার্ম্মাণীতে কোন বিখ্যাত চিকিৎসক বলেছিলেন যে, বসন্ত-রোগ সে দেশে কিছু কিছু লোকেরও যদি না হয়, তা'হলে চিকিৎসকেরা এই রোগের চিকিৎসা একেবারে ভুলে যাবেন। কিন্তু একথা তিনি বলেছেন কখন? না, জার্ম্মাণীতে একটী লোকেরও যখন বসন্ত রোগ হয় না, তখন। কিন্তু বাবা, তোমাদের দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা কত আর দাতার সংখ্যা কত, তার কোনো ধারণা রাখ? এমন যদি অবস্থা এদেশে কখনো আসে যে, ভিক্ষুক আদৌ মিলে না, তখন অবশ্য বলা চল্‌বে যে, তাইত, গ্রহীতাই যখন নেই, তখন দাতার দান করার পাত্র কই? পাত্রের অভাবেই যে লোকের দানপ্রবৃত্তি নাশ পাবে! কিন্তু এধারণা একদিকে যেমন সম্পূর্ণই অমূলক, অপর দিকে তেমনই অজ্ঞতাপ্রসূত।

চক্ষুলজ্জার দান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের অনেকেরই একটা অতি নিদারুণ ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, দুনিয়ার দাতারা দান করেন শুধু ভিক্ষুকের চীৎকার শুনে। এর চেয়ে উৎকট ভ্রান্তি আর কিছু হ'তে পারে না। ভিক্ষুকের চীৎকার শুনে যারা দেয়, তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদিগকে উৎপীড়িত জ্ঞান ক'রে অনিচ্ছায় দান করে। রাস্তার মাঝখানে এসে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষুক দাঁড়ালে প্রীত চিত্তে সন্তুষ্ট মনে আধ পয়সাটা দিতেও ক'জনকে দেখেছ? প্রায় সবাই দেয় অসন্তুষ্ট মনে, দায়ে প'ড়ে চক্ষুলজ্জায় কিংবা ভিখারীটা বিরক্তিজনক চীৎকার বন্ধ ক'রে দ্রুত রেহাই দিক, এই কামনা নিয়ে। চাঁদার খাতা নিয়ে যখন মঠ, মিশন, আশ্রম, পিঞ্জরাপোল, স্কুল, হাসপাতাল, টোল বা দাওয়াইখানার কর্ম্মীরা যান গৃহস্থের ঘরে, তখন এই প্রার্থী ভদ্রলোকদের সম্মান ক'রে চেয়ার ছেড়ে কটা লোক উঠে দাঁড়ায়, আদর ক'রে বস্‌তে বলে কটা লোকে? মাথা না চুল্‌কিয়ে, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত না ক'রে সহাস্য আননে প্রেমসহকারে সই দিতে তোমরা ক'জনকে দেখেছ? ক'জনে প্রতিশ্রুত অর্থ বিনা তাগাদায় দেয় এবং তাগাদা কত্তে গেলে ক'জন লোক সন্তুষ্ট হয় এই ভেবে যে, "ভুলে না যাই, তারই জন্য উনি এসেছেন, ভুলে গেলে আমাকে মিথ্যার পাপে ডুবতে হ'ত, ইনি আমাকে পাপ থেকে রক্ষা কচ্ছেন"? এসব চক্ষুলজ্জার দানে কারো কোনো নৈতিক উন্নতি বা আধ্যাত্মিক মঙ্গল হয় না।

প্রকৃত দান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দান বলে তাকে, যাতে গ্রহীতার অভাব গ্রহীতা নিজে না বল্লেও তার আগে থেকে দাতা নিজে চিন্তা ক'রে অনুভব করেন। দ্রব্য, অর্থ বা সম্পত্তি একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে যে-কোনো একটা কৌশলে চলে গেলেই তার নাম দান নয়। দান একটী মহৎ পুণ্য। আর পুণ্য বলে তাকে, যার দ্বারা মানুষ পবিত্র হয়। যে দান ভিক্ষুকের চীৎকার শুনে দায়ে ঠেকে লোকে করে, তাতে চিত্ত পবিত্র হয় না, সুতরাং সে দান দানই নয়। সে দানই প্রকৃত দান-সংজ্ঞার যোগ্য, যে দানে দাতার দাতৃত্বের অহমিকা নেই, যে দান-কার্য্যে লোকলজ্জার দায় কিম্বা বাইরের চাপ অথবা কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই, যে দানের প্রবৃত্তি একমাত্র চিত্তশুদ্ধির সাত্ত্বিকী প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত। যতকাল লোকের চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন থাক্‌বে, ততকাল স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সৎকার্য্যে আর্থিক ও কায়িক ত্যাগস্বীকার মানব-জাতি কর্ব্বেই কর্ব্বে, এখন তোমার ভিক্ষুক-গোষ্ঠী জগতে থাকুক কি নির্ব্বংশ হয়েই যাক্। প্রকৃত দাতার দান তাঁর নিজের চিত্তের পানে তাকিয়ে হয়, চাঁদার খাতার পানে তাকিয়ে নয়। পল্লীর কোণে কত অভাবী প'ড়ে থাকে, যারা নিজের অভাবের কথা মুখ ফু'টে বা আকার-ইঙ্গিতে কারো কাছে বল্‌তে পারে না। নিজেরা খুঁজে গিয়ে চিরকাল তাদের অভাব প্রকৃত দাতারা দূর করেছেন এবং প্রকৃত

দাতারা চিরকালই এভাবে নিজেদের প্রাণের গরজে পরের দুঃখ খুঁজে বেড়াবেন। এজন্য একদল ভিক্ষুকের চীৎকার বা বস্তা-বোঝাই চাঁদার খাতার অক্ষয় আয়ুর প্রয়োজন নেই। দানে চিত্ত পবিত্র হয় এবং চিত্ত পবিত্র হ'লে দানেচ্ছা আসে। যে দানে চিত্ত পবিত্র হয় আর পবিত্র হ'লে যে দানেচ্ছা আসে, জগতে প্রার্থী থাকুক আর না থাকুক, তা চিরকালই থাক্‌বে।

শিবপুর (কুমিল্লা)
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

জীবন-ভরা সুখ

ফকীর আপ্তাবুদ্দিনের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নায়েব আলী শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন বিষয়ে কোনও একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি স্বরচিত একটী গান আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—

(তোমার মধুর) নাম যে আমার
জীবন-ভরা সুখ।
নামটী যদি না ভু'লে যাই
বিশ্ব ভুবন হোক্‌না বিমুখ।।

সবাই মোরে দিক্ না গালি,
সকল ব্যথা সইব খালি,

নাম-সাধনের আনন্দেতে
পূর্ণ আমার থাক্‌বে বুক।।

ক্ষুৎ-পিপাসা নাই যে গো আর,
নামের মধু করেছি সার,
জন্ম-মরণ সৃষ্টি-প্রলয়
কিছুতেই আর নাই কো দুখ্,
নাম যে আমার পরম সুধা,
তাতেই আমার হাস্য মুখ।।

নামের আজ বান ডেকেছে

শ্রীযুক্ত নায়েব আলী এই গানটীর ভিতরেই নিজের প্রশ্নের জবাব পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি আবৃত্তি করিয়া চলিলেন,

নামের আজ বান ডেকেছে,
আয়রে ছুটে, আয়রে আয়;
পরম গুরুর পরম কৃপায়
পাগ্‌লা জোয়ার ব'য়ে যায়।।

অধম অবোধ জনের তরে
নাম-তরঙ্গ ছুটেছে রে;
ভাসতে পার, ডুবতে পার,
যেমন তোমার চিত্ত চায়।

বানের জলে স্নান ক'রে নে,
অতীত জীবন ভাসিয়ে দে;
আজকে হ'তে লও রে শরণ
সদ্‌গুরুর ঐ রাঙ্গা পায়।

নাম-সেবা যার সাধনা

শ্রীযুক্ত নায়েব আলী মুগ্ধ-শ্রবণে শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

নাম-সেবা যার সাধনা,
তিন ভুবনে পর কে রে তার,
সব যে রে তার আপনা।।

প্রাণ খুলে দেয় সবার তরে,
সবাইকে সে বক্ষে ধরে
সবার দুঃখে কেঁদে মরে,
সবার লাগি আনমনা।।

সবাইকে সে ভালবাসে,
সবার সুখে সমান হাসে,
সকল সোহাগ দেয় ছড়িয়ে
চায় না ফিরে এক কণা।।

বিনিময় সে জানে নারে,
প্রাণ সঁপে দেয় যারে তারে;

তুমি তারে চাইলে কিনা
করেই না সে গণনা।।

চখের দেখা দেখ্‌লি শুধু

শ্রীশ্রীবাবামণি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

চখের দেখা দেখলি শুধু,
প্রাণের দেখা দেখ্‌লি নারে।
মনের কোণে থাক্‌তে রতন,
রইলি ডুবে অন্ধকারে।।
বাহির-জোড়া গণ্ডগোলে
আসল কথা রইলি ভুলে,
নকল নিয়েই নাকাল হলি,
এখন মরিস্‌ হাহাকারে।।
রূপ-রসে তোর মজ্‌ল হৃদয়,
জীবন তাতেই কর্‌লি রে ক্ষয়,
শেষের কথা ভাব্‌লি না তাই
বক্ষ ভাসে অশ্রু-ধারে।।
যার হাসিতে জগৎ হাসে,
ভুল্‌লি তারে অনায়াসে,
বদ্ধ হ'য়ে মোহের ফাঁসে
রুদ্ধ র'লি কারাগারে।।

খোঁজার মত দেখনা খুঁজে

শ্রীশ্রীবাবামণি আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন,—

খোঁজার মত দেখা না খুঁজে
নামের মধু মিলে কিনা,
পরম রতন পায় নারে কেউ
হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি বিনা।।

চ'খ বুজে কি দুই মিনিটে,
পরম রূপের ক্ষুধা মিটে?
যত্নে যদি না হও রাজি,
রত্ন কেমন যায় না চিনা।।

মনপ্রাণে না হয় যদি মিল,
পরমপুরের খুল্‌বে না খিল,
স্বরগ্রাম না সাধ্‌লে কিরে
বাজান যায় প্রেমের বীণা?

নামের অমিয় রসে

শ্রোতার প্রাণে ভাবের আবেশ আসিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি মৃদকণ্ঠে সুর ধরিলেন। গাহিলেন,—

নামের অমিয় রসে মজ মন-মধুকর।
ভুলিবি বিষয়-তৃষা হবিরে চির-অমর।।

শত মতে শত পথে কেন আর ঘুরে মর,
নামে যদি তিরপিত হ'ল বিশ্ব-চরাচর?
পরম-মঙ্গল নাম পূরাইবে মনস্কাম,
শীতল করিবে প্রাণ শোক-তাপ-জরজর।।
ওরে অবিশ্বাসী মন, হারাবি হেন রতন?
অপথে আনন্দলাভে বিফল যতন কর।।

মূঢ় মন চিনে নাও আপন শরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

মূঢ় মন চিনে নাও আপন শরণ।
কেন ঘুরে মর মিছে
শত পথে অকারণ।।

করুণা-আধার নাম
পরম-আনন্দ-ধাম,
জপ জপ অবিরাম,
হবে দুঃখ-নিবারণ।।

ভুলি' হিত-উপদেশ
ভুগিতেছ যত ক্লেশ,
নিজ দোষে দীন বেশ
হারায়ে অমূল্য-ধন।।

শমন-সূদন প্রভুর চরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিতে লাগিলেন,—

শমন-সূদন প্রভুর চরণ
লভেছি আজিকে নাহি কোন ভয়।
হরিনাম ব'লে যাব কুতূহলে
চরণে দলিয়া কণ্টক-চয়।।

নামের মাঝারে যে নাদ বিরাজে
জলদ-গর্জ্জন ছার তার কাছে,
নামের হুঙ্কারে কাঁপায়ে মেদিনী
জাগাইব কোটি ঘুমন্ত হৃদয়।

হরিনাম-সুধা করি' বিতরণ
ছোট-বড় সবে করিব আপন,
পরমানন্দে গাহি' নাম-গান
ভ্রমিব হরষে ত্রিভুবনময়।।

কর্ম্ম, যোগ ও কর্ম্মযোগ

রংপুর নীলফামারি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কর্ম্ম যোগের জন্য, যোগ কর্ম্মের জন্য; শুধু কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম নয়, শুধু যোগের জন্য যোগ নয়। ইহা তোমাকে মনে রাখিতে হইবে। কর্ম্ম ছাড়া জীবের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব,

তাই কর্ম্ম প্রতিজনের পক্ষেই বাধ্যকর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই কর্ম্মকে যোগে রূপান্তরিত করিয়া লইবার কৌশল তোমার আয়ত্ত। কোনও কর্ম্মই যে করিবে না, তাহাকে অন্ততঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও ত' ছাড়িতে হইবে! কর্ম্মযোগী ইহাকেই যোগে পরিণত করিয়া লন। ইচ্ছা করিলেই তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রতিটি প্রশ্বাস তোমার যোগ-সাধনার অঙ্গরূপে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। যে নিজে পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিবে না, তাহাকে অন্যের পরিশ্রমলব্ধ হইলেও অন্ন গ্রহণ করিতেই হইবে। নতুবা প্রাণ বাঁচিবে না। এই আহারীয়-গ্রহণকেও ইচ্ছা করিলেই যোগে পরিণত করিয়া লইতে পারা যায়। সংসারে সকল লোকেই যতির ব্রত লইয়া সংসার-ত্যাগ করিবে না, সংসারে থাকিয়াও সকলেই আমৃত্যু ইন্দ্রিয়-সংযমী হইয়া বাস করিবে না,—করিলে সৃষ্টি লোপ পাইবে। কিন্তু এই সৃষ্টিরক্ষারই প্রয়োজনে নরনারীর যেটুকু ইন্দ্রিয়-ব্যবহার, তাহাকেই ইচ্ছা করিলে যোগে পরিণত করিয়া লওয়া যায়। যোগ কি? যাহা করিলে ভগবানের সঙ্গে জীবের মিলন-পথ খুলিয়া যায়। ভোগ কি? যাহা করিলে ভগবান্ হইতে মানুষ দূরে সরিয়া আসে, রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জাকেই চরম ও পরম সত্য বলিয়া মনে হয়। কেহ যদি ভোগের চর্চ্চা করিবার কালেও ভোগকে, ভোগাঙ্গ ক্রিয়া-সকলকে, ভোগলিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এবং ভোগজ শারীর মানস সকল অবস্থাকে ভগবানের সহিত আন্তর-যোগ-সাধনা করিবার উপায় রূপে গ্রহণে কুণ্ঠিত না হয়, তবে তাহার

ভোগাচারকে ভোগের অপবাদ হইতে মুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পৃথিবীতে নানা দেশে নানা সময়ে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত ভোগের জঘন্য আচরণ-সমূহকে জড়াইয়া এমন বীভৎস ব্যাপারে পরিণত করা হইয়াছে যে, আজ সাধারণ মানুষ ভোগের সহিত যোগের মিলনকে একটা অসম্ভব ব্যাপার বা অসুন্দর জিনিষ বলিয়া মনে করিতেই প্ররোচিত হয়। কিন্তু ভারতে ভোগেন্দ্রিয়াদির ব্যবহার লইয়া যোগের যে অনুশীলন হইয়াছিল, তাহা আভ্যন্তর প্রকৃতিতে, অন্তর্গত উদ্দেশ্যে ও পরিণামে অন্যান্য দেশের ধর্ম্মের নামে ভোগচর্চ্চার অপচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছিল। ভারত ভোগে-ন্দ্রিয়ের মধ্যে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছিল, যেমন সে ভগবান্‌কে দেখিয়াছে প্রতি জীবে প্রতি অণু-পরমাণুতে। তাহার ভগবদ্দর্শন কেবল মঠে ও মন্দিরে নহে, কেবল তীর্থে ও তপোভূমিতে নহে, কেবল গুরুগৃহে আর নিভৃত পর্ব্বতকন্দরে নহে, তাহার ভগবদ্দর্শন জগতের প্রতি স্থানে, প্রকাশ্য ও সংগুপ্ত সকল মানুষ, পশু, পক্ষী ও কীটপতঙ্গের প্রতিটী অঙ্গে। ভগবান্‌কে ভাগ করিয়া ভারতবর্ষ দেখিতে চাহেও নাই, পারেও নাই। বৈদিক ঋষির সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবাদ ভারতের প্রতিটি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সাধন-সম্প্রদায়ে এমনই ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে যে, ধর্ম্ম করিবার জন্য অশ্লীলতার অনুশীলন করিবার অবকাশ যতটা সে পাইয়াছে, স্বাভাবিক জীবনের অশ্লীলতাকে ধর্ম্মে রূপান্তরিত করিবার জন্য প্রেরণা তাহার অপেক্ষা অধিক তাহার

নিকটে আসিয়াছে। এই কারণেই পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সকল গোপন সাধন-পথগুলি লোপ পাইয়া সাগরজলে ডুবিয়া গেল কিন্তু উলঙ্গিনী শ্যামা এখনো দীপান্বিতায় পরিপূজিতা। তান্ত্রিকের সাধনা সকলের জন্য নহে কিন্তু তন্ত্র সেই সত্যকে প্রকাশ করিয়াছে, যাহাকে রূপ-দান প্রতি গৃহস্থের পক্ষেই ভারতে সহজ। কারণ, প্রতি কর্ম্মকে যোগে রূপান্তরিত করিতে হইবে, ইহাই তাহার স্বাভাবিক সাধন। যাহা করিবেই করিবে,—ভাল হউক, মন্দ হউক, ক্ষুদ্র হউক, প্রকাশ্য হউক, গোপন হউক, বৃহৎ হউক,—তাহাকে ঈশ্বর-লাভের উপায়ে রূপবন্ত কর। ইহাই কর্ম্ম-সুকৌশল, ইহাই যোগ।"

দুঃখজয়ী হও

দিনাজপুর রাইগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিষণ্ণ হওয়া কেবল দুর্ব্বলতাই নহে, ইহা পাপ। ইহা পরমেশ্বরে অবিশ্বাস। ইহা নিজের অনন্ত ভবিষ্যতে অনাস্থা। অতএব ইহা নাস্তিকতা। বিপত্তি যতই বিষম হউক, ইহা তোমার ভাব-সম্পদকে শক্ত বনিয়াদ দিবার জন্যই আসিয়াছে। বনিয়াদে কাঁচা কংক্রিটের উপরে দুরমুজের শক্ত আঘাত, শাবলের নির্ম্মম খোঁচা, কর্ণির তীক্ষ্ণধার চোট প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে অস্বীকার করিতেছ বলিয়াই সামান্য দুঃখে একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছ। দুঃখের প্রয়োজনকে সাহসের সহিত স্বীকার

কর, নির্ভয়ে দুঃখকে আলিঙ্গন দাও, হাসিমুখে যুদ্ধ করিয়া দুঃখজয়ী হও।"

পিতামাতার মহৎ অনুশীলন ও মহান্ পুত্র লাভ

ত্রিপুরা বাহাদুরপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা কি জানো, যে আমাকে হত্যা করিবার জন্য রামদা শানাইয়া রাখিয়াছে, আমি সকল জানিয়া শুনিয়া তাহারই গৃহে নিশ্চিন্তে নিশাযাপন করিয়াছি, শুধু এই ভরসায় যে, আমার যে পরমপ্রিয়, সে ঐ রামদার তীক্ষ্ণ ধারে বসিয়া আছে শুধু আমার ওষ্ঠচুম্বন লালসায়? যে আমাকে হত্যা করিয়া নিজ মনের অকারণ আতঙ্ক হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যগ্র, আমি তাহারই যশোগাথা গাহিয়া চারিদিকে ফিরিয়াছি। হিংসক ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে যে, আমি তাহার জঘন্য অপরাধের কল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানি না। প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে, দ্বেষদ্বিধাহীন মধুমাখা বচনে ও হৃদ্যতাপূর্ণ পুনঃ পুনঃ মিলনের মধ্য দিয়া তাহার মন হইতে আমি জিঘাংসাকে দূর করিয়া দিয়াছি। পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় কোন্ স্নেহবান্ পিতা কেশব ভারতীকে হাতের মুঠায় পাইলে হত্যা না করিয়া ছাড়ে? এই নিষ্ঠুর জিঘাংসা স্নেহময় পিতার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সকলের পুত্রই যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

হইতে পারে না, ইহা কে বুঝিবে বল? তোমরাও প্রতি জনে নিজ নিজ পুত্র-কন্যা সম্পর্কে কত আশার প্রাসাদই রচনা কর। কিন্তু যাহাতে তোমাদের ঔরসে তোমাদের পত্নীদের গর্ভে লোকপাবন মহাপুরুষদের আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে, তাহার জন্য কি কিছু মাত্র সাধন করিয়াছ? এই স্থানেই তোমাদের আশার বা আশঙ্কার চরম ব্যর্থতা। নিজেরা যদি যোগ্য না হও, তাহা হইলে কেবল আশঙ্কা করিলেই পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া জগৎত্রাণে বাহির হইয়া যাইবে না। নিজেরা যদি উপযুক্ত সাধনা করিয়া নিজেদের শুক্রে ও রজে দিব্য শক্তির আভিজাত্য না সৃষ্টি করিতে পার, তাহা হইলে কেবল আশা করিলেই পুত্র পতিতপাবন মহামানব হইবে না। নিজেরা যোগ্য ভাবে যোগ্যতার অনুশীলন কর। মহান্ পুত্র লাভ করিতে হইলে পিতামাতার মহৎ অনুশীলন চাই।”

কিশোর ও বালকদের প্রতি সুমহৎ দায়িত্ব

ত্রিপুরা খিদিরপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“অতীতের মহতেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত নিজেকে পরিচিত না করিয়া হঠাৎ করিয়া এক একজন ভবিষ্যতের মহতের আবির্ভাব ঘটিবে, ইহা সাধারণ রীতি নহে। অসাধারণ দুই এক ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটনা হয়ত হইয়া

থাকে। তাই যাহাকে দেখিবে কোনও দিক দিয়া কণামাত্রও বিশেষত্বের অধিকারী, অমনি তাহাকে এমন ভাবে তাঁহার প্রতিভানুকূল মহাপুরুষদের কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানদান করিবে, যেন তাহার ভিতরের সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার প্রেরণা সে পায়। কিশোর এবং বালকদের প্রতি ইহা তোমাদের অতি সুমহৎ দায়িত্ব।”

সহযোগিতা

ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“এমন শক্তিমান্ এই ভুবনে কে আছে, যে অপরের সহযোগ ছাড়া কোনও কাজ করিতে সমর্থ হয়? চাষারা সহযোগ করে, তাই ঘরে বসিয়া ভাত খাও। তুমি টাকা দিয়া চাউল কিনিয়াছ বলিয়াই তাহাদের সহযোগ মিথ্যা হইয়া যায় না। কুলীরা সহযোগ করে, তাই তোমার গুদাম মরশুমের সময়ে শস্যসম্ভারে ভরিয়া ওঠে। কুলীদের তুমি মজুরি দাও বলিয়াই তাহাদের সহযোগ মিথ্যা হইয়া যায় না। রোগীদের জন্য তুমি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াছ, রোগীরা তোমার সততায় বিশ্বাস করিয়া তোমার ওখানে বিনামূল্যে ঔষধ নিতে আসে। একবারও তাহারা মনে ভাবে না যে, তুমি ঔষধের বদলে বিষও পরিবেশন করিতে পার। তুমি তাহাদের যতই সেবা কর, তাহারা তোমার সেবা গ্রহণ করিবার কাজে

সহযোগ করিতেছে বলিয়াই তোমার পক্ষে এই পুণ্যানুষ্ঠান সম্ভব হইতেছে। তুমি বিনা পয়সায় ঔষধ দাও বলিয়াই ইহাদের সহযোগ মিথ্যা হইয়া যায় না। এই পৃথিবীর প্রতিজনের প্রতি কার্য্য অপরের কিছু না কিছু সহযোগের অপেক্ষা রাখে, কিছু না কিছু অপরের সহযোগের উপরে চালু রহিয়াছে। তুমি কাহাকেও অনুগ্রহ করিতেছ, এই ভাবটা তোমার মনে থাকার মতন নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নাই।

"যে-কাহারো সহযোগ চাহিয়া কাছে ডাকিয়া আনিবার অধিকার প্রতি জনেরই আছে, যদি কোনও সমাজবিরোধী, ধর্ম্মবিরোধী, বিবেকবিরোধী অন্যায় কাজের জন্য না হয়। পাপ কাজে সঙ্গী হইবার জন্য ডাকিবার অধিকার কাহারও নাই। সহযোগ করিবার জন্য যাহাকে ডাকিবে, প্রাণভরা দরদ লইয়া তাহার কাছে যাইতে হইবে। অনুযোগ অভিযোগের পসরা সাজাইয়া তুমি ঘরে ঘরে ফিরিবে আর আশা করিবে যে, প্রতি ঘর হইতে তোমার জন্য সহযোগের সহৃদয় হস্ত প্রসারিত হইবে, ইহা দুরাশা মাত্র। সহযোগের আহ্বানে যখন অভিযোগ, অনুযোগ, দোষারোপ ও প্রচ্ছন্ন নিন্দাকণ্ডুয়ন থাকে, তখন সেই আহ্বান নিজেকে নিজে খণ্ডিত করে। 'এস দুনিয়ার যত পাপিষ্ঠ পামর নরাধমেরা আমার কাছে, আমি তোমাদের পশুত্ব ঘুচাইব',—ইহা বলিয়া হাঁক মারিলে পশুরা বরং ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাসন করিতে আসিবে। 'এস দুনিয়ার প্রচ্ছন্ন দেবতারা, যাহারা, নিজ নিজ দেবত্বকে ভুলিয়া রহিয়াছ বলিয়া জানো না যে তোমরা কত বড়, কত মহান্, কত

শ্রেষ্ঠ',—এই বলিয়া যদি ডাক দিতে পার, আর সেই ডাকে যদি তোমার কোনও ফাঁকি না থাকে, তাহা হইলে দেখিও, সারা বিশ্ব ছুটিয়া আসিবে তোমার কাছে, তোমার সেবা গ্রহণের জন্য তোমাকে সহযোগ দিতে। 'নিমন্ত্রণ খাও' বলিলেই কেহ কাহারো গৃহে যাইয়া পাত পাড়িয়া বসে না। তুমি আসিলে আমার বহু ব্যয় ও আয়োজন সার্থক হয়, অতএব হে আমার সকল প্রয়াসের সকল ত্যাগের সকল সাধনার সার্থকতা-দাতা, এস, আমাকে কৃতার্থ কর,—এই ভাব মনে রাখিয়া ডাকিলে তবে সে তোমার ডাকের মর্য্যাদা দিতে আসিবে। পিতামাতাকে যেমন 'রে শ্যালা', 'হে কুলাঙ্গার', 'রে পাপিষ্ঠ, পামর বৃষল' বলিয়া ডাকিলে তাঁহারা খুশী হন না, তেমনি গ্রামের গরীব লোক, বস্তির নীচ-জীবন-যাপনকারী মূর্খ, পাপের অন্ধ গলিতে বিচরণকারী কবন্ধেরাও সমাদর চাহে। তাহা যদি দিতে পার, তবেই তাহাদের সহযোগ তোমার সুলভ্য হইবে।"

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (কুমিল্লা)
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

অন্য প্রভু নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসিয়াছেন। জনৈক ভক্ত-গৃহে উঠিলেন।

এই ভক্তের পরিচয়-প্রদান প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—

"চতুর্দ্দিকে ডাকে যদি সমগ্র ভুবন,
নামে লাগাইয়া আছি আমি মোর মন।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা মোর কার্য্য নয়,
পরদোষ অন্বেষণে মোর সদা ভয়।

আপনার চিত্তশুদ্ধি জগতের তরে,
জগতের সেবা মোর চিত্ত শুদ্ধ করে।

অদ্বেষী চরিত্র মোর, নির্ভীক হৃদয়,
করি সদা সর্ব্বভাব প্রভু-পদে লয়।

একেরে সেবিয়া আমি সহস্রেরে পাই,
অদ্বিতীয় প্রভু মোর, অন্য প্রভু নাই।"

মেঘ কাটিয়া যাইবে

আকাশ একটু মেঘাচ্ছন্ন দেখা যাইতেছে। জনৈক দর্শনার্থী ভক্ত তজ্জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আকাশ থাক্‌লেই মেঘ থাকে, কিন্তু নামে ডুবে যাও, মেঘ কেটে যাবে।

নামের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামের যে কি শক্তি, সাধন ক'রে তার পরিচয় নাও বাবা! নাম নিজেই শক্তির Power-house, (উৎপাদনকেন্দ্র) এখান থেকেই তোমার সমগ্র জীবনের

সকল কর্ম্মলীলার পূর্ণ সাফল্যের guarantee (নিশ্চয়তা) সংগ্রহ।

এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি যে সকল পত্রের উত্তর-প্রদান করিলেন, তাহার যে কয়েকখানার অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নামে সর্ব্ব অনর্থের নাশ

চট্টগ্রাম কক্সবাজার-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানের নামের স্মরণ, কীর্ত্তন দ্বারা জীবের সর্ব্ববিধ অনর্থ অপগত হয়। ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণের পিপাসা এবং দেহাত্মবুদ্ধি মানবের সর্ব্ববৃহৎ অনর্থ। আত্মাভিমান, পরচর্চ্চা, অনিত্যে নিত্য বোধ এবং নিত্যে অনভিনিবেশ মানবের নিদারুণ অনর্থ। ভগবানে অবিশ্বাস এবং ভক্তবিদ্বেষ মানবের অতি শোচনীয় অনর্থ। এই সকল অনর্থের বিপজ্জনক ঘূর্ণীচক্রে নিপতিত হইয়া চিরকাল না হা-হুতাশ করিয়া মর, তাহারই জন্য একান্ত ভাবে মঙ্গলময় নামের শরণাপন্ন হও। উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে, খাইতে, শুইতে, বলিতে, শুনিতে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র নামকেই জীবনের পরমাশ্রয়-রূপে গ্রহণ কর। অপর দশজনে যখন নিজেদের মতের ও পথের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য জগজ্জোড়া তর্কের জাল বিস্তার করিয়া ক্রমক্ষীয়মাণ পরমায়ুর কেবলই অপব্যবহার করিতেছে,

সেই সময়ে তুমি তর্কের বিপজ্জনক বনপথ পরিহার করিয়া বিশ্বাসের নিরাপদ রাজপথে যাত্রা সুরু কর। নামেই সর্ব্ব অনর্থের সুনিশ্চিত নাশ জানিয়া অনুগত চিত্তে নামেই একান্তভাবে আত্মসমর্পণ কর।"

মানবের নিজস্ব স্বভাব

রংপুর তাজহাট-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মনে রাখিও, তুমি মান আর না মান, তুমি একান্তভাবে শ্রীভগবানেরই কিঙ্কর, তুমি আর কাহারও দাস নহ। ভগবৎসেবাই তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং এই সেবাতে নিজেকে সম্যগ্‌রূপে সমর্পণ করিতে পারাই তোমার পরম-পুরুষার্থ। তোমার প্রকৃত স্বভাব ভগবৎসেবা এবং যখন তুমি ভগবৎ-সেবায় বিমুখ, তখনই তুমি স্বভাবচ্যুত দুর্ভাগা। কতজনে কতভাবে তোমার নিকটে তোমার কর্ত্তব্যকার্য্যসমূহের তালিকা আনিয়া উপস্থাপিত করিবে কিন্তু কোনও কর্ত্তব্যই তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে, যতক্ষণ তাহাকে ভগবৎসেবারূপ বৃহত্তম-কর্ত্তব্যের অনুগত করিয়া লইতে না পারিবে। সন্ন্যাসেচ্ছু সংসার ত্যাগ করুক ভগবৎসেবার আনুগত্যে, গৃহস্থ প্রজা সৃষ্টি করুক একমাত্র ভগবৎসেবারই আনুগত্যে, কাঠুরিয়া কাঠ ফাড়ুক, মাটিয়াল মাটি কাটুক, ঘরামিরা বেড়া বাঁধুক, কুলীরা বোঝা বহুক, হাটুরিয়া হাট করুক এবং মাঝি-মাল্লা নৌকা চালাক

একমাত্র ভগৎ-সেবারই অনুগত্যে। নিখিল ভুবনে সর্ব্ব-রাজ-রাজেশ্বর শ্রীভগবানেরই অদ্বিতীয় রাজত্ব দেহে, মনে, প্রাণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাউক, এবং সৈনিক ও সেনাপতি, বণিক ও ধনপতি, শ্রমিক ও কর্ম্মদাতা, শ্রোতা এবং প্রচারক সকলের নিকটে সম্রাটের সম্রাট পরমেশ্বরের সেবাই জীবনের পরম লক্ষ্য হউক। মনে করিও না, এমন দিন জগতে আসিবে না। ভাবিও না, ইহমুখ স্থূলসত্ত্ব জড়বুদ্ধি ক্ষণসুখী ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ চিরকালই মানবের মনের উপরে রাজত্ব করিতে পারিবে। স্বর্গরাজ্য সন্নিকট, এই বিশ্বাস অন্তরে পুষিয়া তুমি তোমার আপন স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টিত হও। জলপ্রবাহবৎ সময় চলিয়া যাইতেছে, একটী অনুপলও বৃথায় বহিতে দিও না।"

স্বাবলম্বন

ময়মনসিংহ বেগুনবাড়ী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জাতি এবং ব্যক্তি উভয়েরই স্বাবলম্বন প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনে পরমুখাপেক্ষীর কোনও সম্মানার্হ স্থান নাই,—তাহার স্থান পদতলে, তাহার প্রাপ্তি নির্য্যাতন। কিন্তু স্বাবলম্বী হইতে হইলে নিজ পরমুখাপেক্ষিতার একটা সঠিক পরিমাণ নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। কোন্ বিষয়ে কতটুকু স্বাবলম্বী তোমার হওয়া চলিত কিন্তু হইতেছ না, তাহার খুদে-গুণে

হিসাব প্রয়োজন। কেন তুমি পরমুখপানে চাহিয়া থাক, কেন তুমি পরাধীন, ইহার বিচার প্রয়োজন। তাহার পরে প্রয়োজন, এই অধীনতা বিদূরণের পন্থা-আবিষ্কার। যদি বহু পন্থা মিলে, তবে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ, সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়িফলপ্রদ, সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াবর্জ্জিত পন্থাটীকে বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। তৎপরে প্রয়োজন সেই পন্থা ধরিয়া চলা। যদি দেখ, সেই পন্থাকে সুপন্থা জানিয়াও দুর্ব্বল চরণ চলিতে চাহে না, তবে সবল প্রযত্নে পদদ্বয়ে শক্তি-সঞ্চারের সাধনা ধরিতে হইবে। স্বাবলম্বন দুর্ব্বলের সাধনা নহে, বলের সাধনাই ইহার গোড়ার কথা।"

রেলে চড়িলে কি স্বাবলম্বন যায়

একটী স্কুলের বালক শ্রীশ্রীবাবামণির পত্রগুলি খাতায় নকল করিয়া রাখিতেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—স্বাবলম্বন যদি কত্তে হয়, তবে লোকে রেলগাড়ী কেন চড়্‌বে? হেটে গেলেই ত' হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথা সত্য। কিন্তু তুমি যদি পকেট থেকে টাকা দিয়ে টিকিট কিনে রেলে চড়, তবে ব্যক্তিগতভাবে তুমি স্বাবলম্বী। রেল কোম্পানী, ট্রাম কোম্পানী প্রভৃতি যদি হয় বিদেশীর সম্পত্তি, তাহ'লে দেশগত-ভাবে তুমি পরমুখাপেক্ষী। সমগ্র দেশ যদি একযোগে বিদেশীর যানে আরোহণ কত্তে অস্বীকার না করে, তাহ'লে একা তুমি না

চড়লেই এই বিষয়ে দেশগত পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচবে না। কিন্তু টিকিট কিনে রেলগাড়ীকে তুমি সাময়িক ভাবে তোমার চাকর ক'রেছ। ভৃত্যের কাছ থেকে প্রাপ্য সেবা আদায় কল্লে তাতে ব্যক্তিগত স্বাবলম্বন যায় না। তুমি বিনা টিকিটে রেল চড়লে তাতে ভিক্ষা কিম্বা চুরি হয়, ওটা পরমুখাপেক্ষিতা। তোমার নিজের অর্জ্জিত অর্থে টিকিট কেনা চলে না, এমতাবস্থায় তুমি যদি অপরের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে এনে টিকিট কেন, তাতেও পরমুখাপেক্ষিতা হয়। স্বাবলম্বনের মানে নিজের প্রয়োজন নিজের সামর্থ্যেই মিটানো, অপরকে অনুগ্রহ কত্তে বাধ্য না করা। স্বাবলম্বী হ'তে হ'লেই যে নিজে ক্ষেত চ'ষে, নিজে ধান রু'পে, সেই গাছের উৎপাদিত ধান থেকে নিজে চাল বে'র ক'রে, সেই চাল নিজে সিদ্ধ ক'রে ভাত রেঁধে খেতে হবে, তা' নয়। তোমার জন্য যদি কেউ শস্য উৎপাদন করে, সে যেন তার প্রাপ্য পায়। তার অনুগ্রহ, দয়া, দান বা ভিক্ষার উপরে যেন তোমাকে নির্ভর কত্তে না হয়। এই হচ্ছে স্বাবলম্বনের মানে। পরের অনুগ্রহ নিয়ে যারা নিজেরা একটু আরামে থাক্‌তে চান, রেলে চড়্‌লে স্বাবলম্বন যায়, এ সব যুক্তি তাঁদের মুখের। ঐ সব বাজে কথায় কাণ দিও না। পরমুখাপেক্ষিতার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হয়েছে। যুগের দাবী আত্মনির্ভরতা। দেশের প্রয়োজন আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই সময়ে ভিক্ষান্নজীবী ও ভিক্ষান্নলোভী দুর্ব্বল-চেতা যুক্তিবিশারদদের অপভাষণে তোমরা কাণ দিও না।

গোবিন্দপুর * (ময়মনসিংহ)
৬ই জ্যৈষ্ঠ ** ১৩৪১

অদ্য বেলা দশ ঘটিকায় অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কিশোরগঞ্জ পৌঁছিয়াছেন। সেখান হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে তিনি গোবিন্দপুর কবিরাজ শ্রীযুক্ত রেবতীকুমার কবিরঞ্জনের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন প্রায় বেলা বারোটায়।

পথশ্রান্তি নিবারণার্থ আজ শ্রীশ্রীবাবামণি বিশ্রাম নিবেন অর্থাৎ কোনও বক্তৃতা বা যৌগিক আসন-মুদ্রাদির প্রদর্শনী আজ হইবে না। কিন্তু নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের কতিপয় যুবক শ্রীপাদপদ্মদর্শনে আসিয়াছেন।

ফুলের সার্থকতা

শ্রদ্ধেয় রেবতী কবিরাজ মহাশয়ের গৃহের এক প্রান্তে একটী কনকধুস্তুরের গাছ রহিয়াছে। গাছটী ফুলে ফুলময়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ফুলের সার্থকতা ভগবানের পায়ে আত্মাঞ্জলিতে। তোমরা কি বাবা নিজ নিজ জীবনকে

* দ্বাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে এই স্থান হইতে নব-সংযোজন ঘটিয়াছে।

** ৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে কয়েক দিনের তারিখ-সঙ্গতি করা যায় নাই। এই কয়দিনের তারিখ দুই একদিন আগে পরে হইতে পারে। বিভিন্ন জনের প্রদত্ত তথ্যে তারিখের একটু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অঃ সঃ সঃ।

এই ফুলের মত কর্‌বে? তোমরা কি বাবা নিজ নিজ জীবন ভগবানের পায়ে অঞ্জলি-স্বরূপে অর্পণ কর্ব্বে? তোমরা কি হবে এই ফুলগুলির মত অমল, সুন্দর, কোমল এবং মধুর?

চিত্তশুদ্ধি ও আত্মসমর্পণ

ধুস্তুর-ফুলের গাছটীর পাশে বসিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি স্নান করিতেছিলেন। গামছা দ্বারা গাত্র-মার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—এই দেহটাকে যে ভাবে পরিষ্কৃত কচ্ছি, মনকে পরিষ্কার করা দরকার তার চেয়ে শতগুণ তেজে। মন যার যত পরিষ্কৃত, আত্মসমর্পণ তার তত নির্ভুল।

চিত্তশুদ্ধি ছাড়া প্রেম ধরে মিথ্যাচার।
প্রেম ছাড়া চিত্তশুদ্ধি অবোধ্য ব্যাপার।

আত্ম-সমর্পণের অর্থ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু অহমিকা বজায় রেখে আত্মসমর্পণ চলে না। নিজেকে, নিজের অহমিকাকে, নিজের সুখলিপ্সা, ভোগলিপ্সা, কর্ত্তৃত্বলিপ্সা, নেতৃত্বলিপ্সা, নাম-যশঃ-কীর্ত্তিলিপ্সা, সব কিছু পরমারাধ্যের চরণে বিনা সর্ত্তে সমর্পণ করার নামই আত্মসমর্পণ। আমার খেয়াল-মাফিক আমার খুশী-মত ভগবানকে চল্‌তে হবে, এই দাবী থাক্‌লে আর আত্মসমর্পণ হ'ল না, বরং ভগবানের উপরে ভোগবুদ্ধি হ'ল, অর্থাৎ

ভগবানকে ভৃত্য জ্ঞান করা হ'ল। ভগবানের দাস কখনো নিজেকে ভগবানের প্রভু কত্তে চাইতে পারেন না।

সেবাব্রত শাশ্বত হউক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের জীবন আত্মসমর্পণের জীবন হোক্। স্বচ্ছ, অনাবিল, অকিঞ্চন, বিনিময়-বুদ্ধিহীন সেবাই তোমাদের একমাত্র আদর্শ ও লক্ষ্য হোক্। ভোগলুব্ধ জীবনের সহস্র বিড়ম্বনার উর্দ্ধে তোমরা সুপ্রতিষ্ঠিত হও। তিলে তিলে নিজেকে সেই পরমদয়িতের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কিছু পাবে, এ আশা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে তার কাজে বিকিয়ে দেওয়া,—এই হোক্ তোমাদের চিরন্তন, শাশ্বত, সনাতন ব্রত।

ভগবানেরই সেবা কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ভগবানের মুখোশ প'রে শয়তানও মানবকে প্রলুব্ধ কত্তে পারে। নিজেকে ভগবান্ ব'লে দাবী ক'রে অসত্য এসে ভক্তিপ্রবণ প্রাণ-সমূহের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দাবী করে। ভক্তিই যার স্বয়ংসিদ্ধ স্বভাব, সে বিচার না ক'রে আত্মসমর্পণ করে এবং পরে অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে মরে। মনে রেখো, সেবা দেবে ভগবানকে, ভগবানের নামধারী প্রচ্ছন্ন শয়তানকে নয়। একমাত্র ভগবানই তোমাদের সেবার বিগ্রহ হউন, অপর কেউ নয়।

বাহ্যানুষ্ঠান ও নির্জ্জন ভজন

হাজারিবাগ-পালগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাহ্যানুষ্ঠান এবং নির্জ্জন ভজন উভয়েরই নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রয়োজন, অধিকার, উপযোগিতা এবং স্থান রহিয়াছে। উহা অবধারণ করিয়া জীবন-মধ্যে উভয়ের সুসমঞ্জস সমাবেশ করাই তোমার সঙ্গত হইবে। যে সকল বাহ্যানুষ্ঠান অন্তরঙ্গ সাধনের রুচি এবং আনুকূল্য বৃদ্ধি করিবে, শুধু বাহ্য বলিয়াই তাহা হেয় বা পরিত্যাজ্য নহে। অনেক সময়ে বাহ্যানুষ্ঠানের অতিমাত্রায় বিলোপ-হেতু অন্তরঙ্গ সাধনের রুচি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানের মুখ যদি থাকে অন্তরের দিকে, তাহা হইলে তাহা বাহ্য হইলেও ঠিক্ ঠিক্ বাহ্য নহে। অনেক সময়ে বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান-সমূহ ভজন-গোষ্ঠী বিস্তারের সহায়তা করে। অনেক সময়ে বাহ্যানুষ্ঠান দর্শনে অসাত্ত্বিক মানবের মনে সাত্ত্বিকী প্রেরণার সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে তাহা তাহার অন্তরঙ্গ সাধন-পথে অগ্রসর হইবার সহায়িকা হয়। এই সকল বিচার করিলে বাহ্যানুষ্ঠানমাত্রই বর্জ্জনীয় বা নিন্দনীয়, এইরূপ বলা চলে না। কিন্তু ধর্ম্মভাব প্রবর্দ্ধনের মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবলই আড়ম্বর করিবার জন্য ধর্ম্মের নামে যে সকল রাজসিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা হইতে সাধক বা দর্শক প্রত্যেকের পক্ষেই লাভ উঠান কঠিন কার্য্য। অত্যধিক আড়ম্বরে

অপচয়িতশক্তি ব্যক্তির পক্ষে শেষে প্রকৃত কার্য্যটুকু সমাধা করিবার কালে উৎসাহ, উদ্যম, স্ফূর্ত্তি বা একাগ্রতা থাকে না। এমন কি বাহ্যাড়ম্বর অনেক সময়ে মনের মধ্যে এমন এক কৃত্রিম আত্মতৃপ্তির মোহিনী মায়ামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া যায় যে, অন্তরঙ্গ সাধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার রুচি পর্য্যন্ত থাকে না। এই ক্ষেত্রে বাহ্যানুষ্ঠানের বল্‌গা শক্ত করিয়া টানিয়া ধরিয়া আড়ম্বর ও বাহ্যমুখিতা হ্রাস করা একান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া জানিতে হইবে। অপর দিকে একক ও নির্জ্জন তপস্যাও স্থল-বিশেষে বিড়াল-তপস্বীর তপস্যায় বা বকধার্ম্মিকের ধর্ম্ম-সাধনায় পরিণত হইতে পারে। অন্তরঙ্গ সাধন লোকালয় হইতে দূরে গিয়া কর আর না কর, লোক-সমাগম হইতে দূরে থাকিয়াই উহা করিতে হইবে। অবিরাম জনস্রোতের কল-কল্লোলের মাঝখানে থাকিয়াও যে অনাসক্ত নিঃসঙ্গ সাধন, ইহা সামান্য ব্যক্তির সাধ্য নহে এবং সামান্য অবস্থায়ও সাধ্য নহে। ইহার জন্য অসামান্য ব্যক্তি এবং অসামান্য অবস্থার প্রয়োজন হয়। সুতরাং অন্তরঙ্গ সাধনকে অবাধ রাখিবার জন্য 'অরতির্জনসংসদি' গীতার এই মহাবাক্যকে মান্য করিতেই হইবে। যে যার সঙ্গ লয়, সে তার ভাব পায়, স্বভাব পায়, রুচি, প্রকৃতি, নিষ্ঠা, অনিষ্ঠা, দ্বন্দ্ব, কুণ্ঠা ও দুর্ব্বলতা সবই পায়। সুতরাং অন্তরঙ্গ সাধক দুর্ব্বল ব্যক্তি অপর দুর্ব্বলের, অপর কুরুচিতের, অপর দ্বন্দ্ব-পীড়িতের, অপর নিষ্ঠাহীনের সংসর্গ অবশ্যই বর্জ্জন করিবেন। ইহাকে দম্ভ, আত্মাভিমান, নিজ

শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে একান্ত জাগরূকতা, ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি বলিয়া যিনিই যে নিন্দাব্যঞ্জক সংজ্ঞা প্রদান করুন, তাহার প্রতি দৃষ্টি দিলে চলিবে না। কেবল লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সত্য সত্যই অন্তরঙ্গ সাধনের নাম করিয়া জনসংসদবর্জ্জনের দ্বারা নিজের ভিতরে নিন্দকের উচ্চারিত ঐ সকল অসদ্‌গুণ কোনও প্রকারে না প্রবেশ করিতে পারে। উদ্ধত অহমিকা সাধকের সাধন-পথে বিন্দুমাত্রও সহায়িকা নহে, বরং নির্ম্মল তপস্যাকে উহা বজ্রাঘাতে পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় সবলে উপাড়িয়া দেয়। যাঁহারা নিঃসঙ্গ নির্জ্জন সাধন-জীবন যাপন করেন না, তাঁহাদের মধ্যেও যে তোমার অপেক্ষা কত কত শ্রেষ্ঠ সাধন-মহারথেরা রহিয়াছেন, এই কথা স্মরণে রাখিয়া নির্জ্জন-ভজনে বসিলে সেই ভজন আত্মাভিমান বা অহমিকার বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় প্রদান করে না। একই জীবনে কখনো নির্জ্জন-সাধন কখনো জনসমাগম-বহুল বাহ্যানুষ্ঠান-সমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া উপলব্ধ হয়। যখন যেইটী প্রয়োজনীয় হইবে, তখনই সেইটী গ্রহণীয় জানিও, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই নিজেকে অপরাপর জনসমূহ অপেক্ষা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ বা মহত্তর বলিয়া কল্পনাও করিও না। একদল লোক নগরে পল্লীতে অবিরাম হরিনাম-কীর্ত্তন করিয়া নিদ্রিতের তন্দ্রালস-চক্ষে জাগরণের উষারুণ-সম্পাতে প্রয়াসী হন। তাঁহারা যদি মনে করেন যে, নিদ্রিতদের অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ এবং নিদ্রিতদের জাগাইবার মহদ্‌ব্রত গ্রহণের তাঁহারাই জগতে উচ্চতম

অধিকারী, তাহা হইলে অহঙ্কারের মল-প্রক্ষেপে তাঁহাদের হরি-সঙ্কীর্ত্তনের পবিত্র বায়ু-প্রবাহ দুর্গন্ধায়িত হইয়া যাইবে। এইজন্য এই সকল পবিত্র বাহ্যানুষ্ঠানের পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চিত্তের নিরভিমানতা এক অপরিহার্য্য প্রয়োজন জানিও। নীরব ধ্যানযোগী বা মৌনী জাপক পুরুষদের কার্য্য কলিযুগে নিতান্তই অপ্রশস্ত বলিয়া নিন্দা করিয়া একদল হরি-নাম-কীর্ত্তনকারীরা নিজেদের অবলম্বিত পন্থাকে শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টিত হন। এইসকল চেষ্টারও কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া আমি জ্ঞান করি না। কেন না, যিনি হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা কলি-কলুষনাশনে ব্রতী হন, তিনি যদি এই নাম-প্রচার ব্রত উদ্‌যাপনের সহিত নিজের চিত্তকে নিরন্তর অকপট ও নিরভিমান রাখিতে প্রযত্নপরায়ণ থাকেন, তাহা হইলে কিছুদিন পরেই তিনি নিজের অন্তরের দাবী উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, নীরব, নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ ও একান্ত ধ্যান ও জপের প্রয়োজন আছে। বহিরঙ্গ সাধন এবং অন্তরঙ্গ সাধন এইভাবে একে অপরের অনুপূরক। নিরভিমান চিত্তে একটী করিলে অপরটীর সম্পর্কে প্রয়োজনীয়তা-বোধ ঠিক্ যথাযোগ্য সময়ে অন্তরে জাগরিত হইবেই। এক এক সম্প্রদায়ের বাহ্যানুষ্ঠানকারীদের আবার এক এক প্রকারের মুদ্রাদোষ আছে। মুদ্রাদোষ শব্দটী এখানে কোনও নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহার করি নাই। বাঁধা-ধরা নির্দ্দিষ্ট একই প্রকারের আচরণ, বাহ্য হইতে এক চুল বিচ্যুত হইয়া অনুষ্ঠানটী করিলে,

সেই সম্প্রদায়ভুক্ত কুলীন সাধকদের চক্ষে গুরুতর অপরাধ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে, সেই সকল ফরমূলা-মাফিক গৎ-বাঁধা আচরণকে এই ক্ষেত্রে মুদ্রাদোষ বলিতেছি। লিখিতে বসিয়া অন্য একটী অনুরূপ ভাল শব্দ পাইতেছি না বলিয়াই এই শব্দটী ব্যবহার করিতেছি। তুমি ভাল অর্থে শব্দটীকে বুঝিও, বিকৃত অর্থে বুঝিও না। এক সম্প্রদায়ের মুদ্রাদোষ অপর সম্প্রদায়ের নিকট এমন নিন্দনীয় যে, নিজেদের বাঁধাধরা নিয়ম পরিহার করিয়া ক-সম্প্রদায়ের ধরাবাঁধা নিয়মে যদি খ-সম্প্রদায় দ্রুত তাঁহাদের বাহ্যানুষ্ঠানের ধারা পরিবর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকলের অনন্ত নরক একেবারে অবধারিত। এই যে আমি নির্দ্দিষ্ট একটী ভাবে আরতির ধূপতি ধরিয়াছি, তুমি যদি নিজ কনিষ্ঠাঙ্গুলিটী তাহা হইতে একটু হেলাইয়া রাখ, তাহা হইলে তোমাকে চৌদ্দপুরুষ সহ যমকিঙ্করের শাণিত-কৃপাণের আঘাতে সুনিশ্চিত জর্জ্জরিত হইতে হইবে। এই অনুষ্ঠানের প্রকৃত লক্ষ্য যে ভগবৎ প্রেম, তাহা ভুলিয়া এভাবে এক অনুষ্ঠানকারী অপর অনুষ্ঠানকারীর দোষোদ্ঘাটনে ও দোষপ্রচারে মদমত্ত-হস্তীর উৎসাহে যত্নবান্। আনুষ্ঠানিকের সহিতই আনুষ্ঠানিকগণের এইভাবে প্রমত্ত সংগ্রাম চলিতেছে, সুতরাং নিরনুষ্ঠানিক অন্তরঙ্গ সাধকদের বিরুদ্ধে যে তাঁহারা অনেকেই অনর্থক বিষোদগার করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই বাছা। তোমরা এই সকল কোলাহল ও কচায়নের ঊর্দ্ধে থাকিয়া কেবল নিজেদের

আভ্যন্তর উপলব্ধির মানদণ্ডের পানে তাকাইয়া জীবনকে প্রয়োজনমত ধর্ম্মবর্দ্ধক বাহ্যানুষ্ঠানে এবং প্রেমবর্দ্ধক অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে নিরত রাখ। সামঞ্জস্য হারাইও না বা একদেশদর্শী হইও না। তোমাকে দিয়া তোমারও যেমন প্রয়োজন, জগতেরও তেমন প্রয়োজন। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিও না।

সকলের শক্তিকে মিলাও

কুমিল্লা চান্দলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা তোমাদের দেশকে বিগত কয়েক শত বৎসর ধরিয়া কি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ? এক একটী অসাধারণ মানুষ আসিয়াছেন, শত সহস্র লোকের প্রাণে জীবন্ত প্রেরণা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নাম ধুইয়া মাদুলী করিয়া দৈনিক জল পান করা ব্যতীত আর কিছুই হইতেছে না। যে কাজ তাঁহারা ধরিলেন, তাহার রথের রজ্জু কেহই ছুঁইল না, কেবল জয়ধ্বনি দিয়া মহাপুরুষের মহত্ত্ব-বিস্তার হইয়া যাইবে বলিয়া আশায় আশায় সকলে দিন গণিতেছে। এই দোষটী তোমাদের পরিহার করিতে হইবে। প্রতি জনে প্রতি জনের সহিত সুশৃঙ্খল সহযোগ দিবার অনুশীলন করিলেই তবে এই ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূরীভূত হইতে পারে। ক্ষুদ্র কাজ, অতি ক্ষুদ্র কাজ এক একটা তোমাদের হাতে তুলিয়া ধরিতেছি, তাহাতে কি তোমরা

সকলের শক্তিকে মিলাইবার সাধনা করিবে? একা একজনের অসাধারণ ত্যাগ, একা একজনের অসাধারণ নিষ্ঠা দিয়া একটা ছোট বা মাঝারি কাজ আপাততঃ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে কিন্তু সকলের সকল সামর্থ্যের সমন্বয় ও সমবায় ঘটাইতে না পারিলে বড় কাজ হইতে পারে না বা চিরকালের জন্য জয়যাত্রার গতি অব্যাহত থাকিতে পারে না। সকল ছোটকে কাজে লাগাইয়া এবং এক সাথে লাগাইয়া তোমরা প্রতিটি কাজ করিতে অভ্যাস কর। ছোট ছোট কাজের মধ্যে একার শক্তিকে অবহেলা করিয়া সকলের শক্তিকে কি তোমরা মিলাইবার চেষ্টা করিবে? আমি জানি, আত্মাভিমান, ব্যক্তিগত সামর্থ্য সম্পর্কে অসাধারণ উচ্চ ধারণা, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাসের ও নির্ভরের অভাব ইহার দুরন্ত বাধা। কিন্তু আমার সন্তান হইয়া বাধাকে দমন করিতে পারিবে না, ইহা আমার পক্ষে এক অসামান্য অসম্মান।"

স্বর্গ ও নরক

বরিশাল বাইশারি-নিবাসী জনৈক পত্র-প্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সত্যই ভগবান্ তোমাদের সৃষ্টি করিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়া গিয়াছিলেন। দিলেন তিনি তোমাদিগকে স্বাধীন বিচারের শক্তি, স্বাধীন কর্ম্মশক্তি এবং নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইবার অনুকূল প্রতিকূল সর্ব্বপ্রকার পরিবেশ।

তোমরা এক এক জনে এক এক প্রকার কাজ করিয়া কেহ স্বর্গের ভাগী, কেহ বা নরকের ভাগী হইলে। নিশ্চয়ই ভগবান্ তখন তাড়াতাড়ি করিয়া তোমাদের কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গ ও নরক সৃষ্টি করিবার জন্য নিজেই লাগিলেন বা কাহাকেও লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতেই বিপদ কাটিল না। তোমরা এক একটা করিয়া নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়িতে লাগিলে, তাই এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া এক একটা আলাদা স্বর্গ ও এক একটা করিয়া আলাদা নরক নির্ম্মাণ করিলেন। ইহুদীর স্বর্গ-নরক হিন্দুর স্বর্গ-নরক হইতে আলাদা, হিন্দুর স্বর্গ-নরক বৌদ্ধের স্বর্গ-নরক হইতে আলাদা, বৌদ্ধের স্বর্গ-নরক খ্রীষ্টানের স্বর্গ-নরক হইতে আলাদা, খ্রীষ্টানের স্বর্গ-নরক মুসলমানের স্বর্গ-নরক হইতে আলাদা, শিখের স্বর্গ-নরক মুসলমানের স্বর্গ-নরক হইতে আলাদা। এক সম্প্রদায়ের নরকে অপর সম্প্রদায়ের লোক হয়ত ঢুকিয়া গেলে ঢুকিতে পারে কিন্তু এক সম্প্রদায়ের স্বর্গে অপর সম্প্রদায়ের লোকদের প্রবেশাধিকার আছে কিনা সন্দেহ। এইরূপ বিভিন্ন রকম স্বর্গ-নরক সৃষ্টি করিবার জন্য এক এক সম্প্রদায় হইতে কারিকর নিয়া ভগবানকে লাগাইতে হইয়াছে, কেন না, যিনি যেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তিনিই ত' কেবল সেই সম্পর্কে নিখুঁত জিনিষটী তৈরী করিতে পারিবেন। হিন্দুর স্বর্গ-নরক তৈরী করিবার জন্য কারিকরের দল সম্ভবতঃ এবং প্রধানতঃ নৈমিষারণ্য হইতেই গিয়াছিলেন এবং সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কালের পর হইতেই হয়ত নির্ম্মাণ-কার্য্যের ফিনিশিং

টাচ্ দিতে হইয়াছিল। খ্রীষ্টানের স্বর্গ-নরক নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্যালেষ্টাইনের কারিকরদের দ্বারাই হয়ত সবটা কাজ সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ হয় নাই, এই জন্য হয়ত শেষ দিক দিয়া অনেক কারুশিল্পী ইটালি-দেশস্থ রোম এবং এশিয়াস্থিত কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল হইতেও আমদানী করিতে হইয়াছিল। সেই যুগে পাসপোর্টের প্রথা ছিল না বলিয়া ভগবানকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। মুসলমানদের স্বর্গ-নরকের ব্যাপারে সংস্কার, কল্পনা, বিশ্বাস ও অনুভূতির জন্য ভগবানকে আরব দেশের বাহিরে দূরে কোথাও হয়ত যাইতে হয় নাই, ইহা একপ্রকার মনে করা যাইতে পারে। কারণ, মুসলমানদের ধর্ম্মে আরব্য রীতিকে রক্ষাই এবং তাহাকে বিশ্বব্যাপী করিবার চেষ্টাই হইতেছে একটা অসাধারণ বিশেষত্ব, যাহা অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে এত স্পষ্ট নহে। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার-শীল হইয়া প্যালেষ্টাইনের ইহুদীদের রীতি সর্ব্বত্র প্রসারিত করিবার চেষ্টাকে প্রশ্রয় দেয় নাই, যদিও যীশু ইহুদীদের পুত্র বলিয়াই সকল দেশের সকলে খ্রীষ্টানকে ইহুদীদের রীতিনীতি গ্রহণ করাইবার জন্য একটা আন্দোলন ইহুদী-বংশজাত খ্রীষ্টানেরা একদা করিয়াছিলেন। ইহাকে Religious Patriotism বা দেশাত্মবোধগত ধর্ম্মবোধ বলিতে পার। বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনে, আফগানিস্থানে, তাতারে, তুর্কে, গ্রীসে, মিশরে যাইয়াও সেখানকার লোকগুলিকে ভারতীয় করিবার চেষ্টা করে নাই। সুতরাং মুসলমানদের স্বর্গনরক-ব্যবস্থায় আরবীয়

সংস্কারের বাহিরে যাইতে হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয় না। অবশ্য স্বর্গনরক সম্পর্কে খ্রীষ্টান ও ইহুদী সংস্কারের সহিত ইসলামীয় সংস্কারের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। বলা কঠিন, ইসলামীয় সংস্কার পূর্ব্ববর্তন ঐ দুই ধর্ম্মের সংস্কারের নিকট কতটা ঋণী। শক্তিধর ধর্ম্মসংগঠক মহাপুরুষ মহম্মদের আগে আরব কি ছিল, তাহার পরিচয় পাইবার মতন উপাদান বিশেষ কিছুই সম্ভবতঃ বিজয়ী ইস্‌লাম রক্ষা করে নাই। তাই এই ক্ষেত্রে অনুমান ছাড়া অন্য উপায় সত্যই নাই। হিন্দুর ঘরের ছেলেরা যেমন মাত্র যজ্ঞধূমের, পশুহত্যার ও জাতিভেদের প্রতিবাদেই বৌদ্ধ হইয়া গেল, অথচ হিন্দু সাধনা ও সংস্কৃতিরই রূপান্তরকে মাত্র আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধ সংঘ গড়িয়া উঠিল, আরবের প্রাচীন সংস্কৃতি তেমনি করিয়া নবাবির্ভূত ইসলামের মধ্যে কতটা অঙ্গীভূত হইয়াছে, তাহার প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ সম্ভবও নহে। তথাপি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সংস্কার ও অনুভূতি সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য স্বর্গ ও নরক সৃষ্টি করিতে যেমন করিয়া সহায়তা করিয়াছে, এক্ষেত্রেও তাহাই হয়ত হইয়াছে। তোমরা অখণ্ডগণ আবার আস্তে আস্তে একটা নূতন ধর্ম্মমতের রূপ নিতে যাইতেছ। তোমাদের জন্যও হয়ত ভগবান্ ভাবিত হইবেন যে, তোমাদের স্বর্গ-নরক কেমন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তোমাদের সংস্কারের বিরুদ্ধ কোনও স্বর্গ ও নরক সৃষ্টি করিলে তোমরা যদি তাহা বরদাস্ত না করিতে পারিয়া স্বয়ং ভগবানকেই একেবারে বাতিল করিয়া দাও,

সেই ভয় যে ভগবানচন্দ্রের নাই, ইহা মনে করিও না। কারণ, এই যুগ যুক্তির যুগ। প্রত্যক্ষে যাঁহাকে পাইব না, প্রত্যয়ে যাঁহাকে ধরিতে পারিব না, তাঁহাকে অন্ততঃ যুক্তিতে পাওয়া চাইই চাই। প্রত্যক্ষে ভগবানকে না পাইয়া অনেকে ভগবানকে বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু যুক্তির চোখে তাঁহাকে ধরা-ছোঁয়া না গেলেও কেমন যেন একটা মধুগন্ধ তাঁহার অঙ্গ হইতে ভাসিয়া আসিতে টের পাওয়া যায়। তাই বেচারী ভগবান্ নানা রকম বোম্বার্ডমেণ্টের পরেও এখনও টিকিয়া আছেন এবং নানা-ধর্ম্মাবলম্বীদের স্বর্গ-নরকের ব্যবস্থাকে বহাল রাখিতে পারিয়াছেন। এই সময়ে আবার একটা নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-রূপে তোমাদের অভ্যুদয় দেখিয়া ভগবান্ ভাবিত না হইয়া পারেন না। ভগবানের অশেষ দয়ার আস্বাদন পাইয়া কৃত-কৃতার্থ আমি ভগবানকে এমন একটা সদ্যঃ সদ্যঃ নূতন বিপদে ফেলিতে চাহি না। তাই তোমাদের জানাইয়া দিতেছি যে, তোমাদের জন্য কুকর্ম্মজনিত দুঃখই নরক, সৎকার্য্য-জনিত বিমল আত্মপ্রসাদই স্বর্গ। এই নরককে তোমরা এড়াইয়া চলিও, এই স্বর্গকে তোমরা লাভ করিবার জন্য আপ্রাণ সাধনা করিও।"

সমবেত উপাসনা কখন বর্জ্জনীয়

কুমিল্লা সেন্দ-নিবাসিনী জনৈক-পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পাপী, অপরাধী, অন্যায়কারী ব্যক্তিও যদি সরল মনে তোমাদিগকে সমবেত উপাসনায় ডাকে, তাহা হইলে তোমরা তাহাতে সাড়া দিও। একজনের সহিত তোমার কলহ ছিল বা আছে বলিয়া সমবেত উপাসনার ব্যাপারে কখনো তাহার জের টানিও না। সমবেত উপাসনাকে তোমাদের সকল প্রকার সাংসারিক, সামাজিক ও বৈষয়িক হিসাব নিকাশের বাহিরের বস্তু বলিয়া জানিও। কিন্তু সমবেত উপাসনার মত পবিত্র অনুষ্ঠানকে যদি কেহ নিজ পাপাচরণের উপায় রূপে গ্রহণ করে, অথবা একজন কেহ চুরি করিয়া, ডাকাতি করিয়া পরনারীর অমর্য্যাদা করিয়া, খুন করিয়া নিজ দোষ ঢাকিবার উদ্দেশ্যে যদি সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করে, আর তাহার এই অসদুদ্দেশ্য যদি তোমাদের গোচরীভূত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার গৃহে যাইয়া সমবেত উপাসনায় যোগ দেওয়ার আগ্রহ তোমরা অবশ্যই উপশমিত করিবে। মঠে, মন্দিরে বা আশ্রমে হউক অথবা গৃহীর গৃহে হউক, নীরব নিভৃত স্থানে হউক অথবা হাটে বাজারে জনারণ্যের মধ্যে হউক, সমবেত উপাসনার মধ্যে কোনও সময়ে কোনও প্রকারের ইন্দ্রিয়গত ব্যভিচারাদির সহায়ক, প্ররোচক বা প্রশ্রয়দায়ক কোনও আচার-ব্যবহারকে নাক গলাইতে দেওয়া হইবে না। তরুণ-তরুণীদের প্রণয়ানুশীলনের ইহা ক্ষেত্র নহে,—এখানে তেমন ব্যাপারকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। উপাসনার পুষ্প-বিল্বদল সজ্জিত করিবার বা নৈবেদ্য তৈরী করিবার নাম করিয়াও

একের সহিত অপরের অন্যায় ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধনের সুযোগ দেওয়া হইবে না। নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া যেখানে দ্বিধার বিন্দুমাত্র কারণ থাকিবে, সেখানে সমবেত উপাসনা বর্জ্জন করা অন্যায় হইবে না। কিন্তু ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা-দ্বেষকে চরিতার্থ করিবার জন্য সমবেত উপাসনার আহ্বানকে অসম্মান করা দোষাবহ হইবে।"

সমবেত উপাসনার মহত্ত্ব

কুমিল্লা হাজিগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন—

"একা একটা কাজ করিলে তাহাতে আনন্দ কম। দশ জনে মিলিয়া করিতে পারিলে মিলনজনিত প্রহর্ষ তাহার মূল্য ও মর্য্যাদা বর্দ্ধিত করে। মিলনেচ্ছার ভিতরে শক্তির প্রত্যক্ষ আহ্বান রহিয়াছে। মিলন-প্রয়াসের ভিতরে শক্তির রহিয়াছে সুস্থির সন্ধান। মিলনের সাফল্যের ভিতরে লুক্কায়িত রহিয়াছে শক্তির অফুরন্ত উৎস। তোমরা সমবেত উপাসনাকে প্রাণাধিক প্রিয় অনুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করিও। ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যাদ্বেষকে ইহার প্রতিবন্ধক হইতে দিও না। মান-যশের লোভে কেহ সমবেত উপাসনায় নেতৃত্ব করিতে চাহিও না। প্রাণের অকপট ভালবাসার তাগিদে ইহা করিবে। আন্তরিক প্রেম সমবেত উপাসনার প্রেরণা দিতে থাকুক, প্রতিটী উপাসনানুষ্ঠান তোমাদের প্রাণকে দিগ্‌দিগন্ত-বিস্তারী পরিপ্রসার প্রদান করুক। তোমাদের

স্বভাবে, চরিত্রে, চেষ্টায়, চিন্তায়, সমবেত উপাসনার মধুময় মহত্ত্ব আত্মপ্রকটন করিতে থাকুক। তোমরা খাঁটি মানুষ হও, প্রেমিক মানুষ হও, সমবেত উপাসনার মহিমায় সহিষ্ণু, কর্ম্মঠ, রণদুর্দ্ধর্ষ, মহাশক্তিধর, বীর্য্যবরীয়ান্ মহাজাতিতে পরিণত হও।"

নিজের দিকে তাকাও

পাবনা ভাঙ্গুরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাহার মতকে তুমি মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিবে, বল? যতক্ষণ মানুষ নিজ উপলব্ধ সত্যের উপরে দাঁড়াইয়া বলে বা চলে, ততক্ষণ তাহার মত ও পথকে মিথ্যা বলিবার তোমার কোন্ অধিকার রহিয়াছে? অথবা নিজের অল্পবুদ্ধিতার বা অন্তরের কোনও সুপ্ত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি তাহাকে মিথ্যা বলিলেও তাহা মিথ্যা হইয়া যাইবে না। যতক্ষণ উপলব্ধির সহিত মিল রাখিয়া মানুষ চলিবে, বলিবে, ততক্ষণ তাহার রহস্যময় আদর্শবাদ বা দুর্ব্বোধ্য আচরণগুলিকেও লোকে সত্যের সম্মান দিবে। তারপরে যেমন যেমন নিজ উপলব্ধির অনুশাসন হইতে স্খলিত হইয়া সে নিজের ব্যক্তিগত গোঁড়ামি ও দুর্ব্বলতাকে ধর্ম্মের ছদ্মবেশ পরাইয়া সকলের মধ্যে চালাইতে থাকিবে, তেমন তেমন তাহার মতের ও পথের প্রতিষ্ঠা লোক-সমাজে কমিতে থাকিবে। অপরের এই বাড়া-কমার সহিত তোমরা নিজেদিগকে সংশ্লিষ্ট করিও না। যে পারে,

নিজ স্বভাবের বশেই ত' বাড়িয়া চলিবে; স্বভাব যাহার অনুপন্থী, তাহার দুর্ব্বার গতি ঠেকাইবে কে? যে পারে, নিজ স্বভাবের বশেই আবার ঢলিয়া পড়িবে; স্বভাব যদি মরণমুখী হয়, তবে কেহ জোর করিয়া তাহাকে অনন্ত জীবন দান করিতে পারে না। তোমরা অপরের কার্য্য, রীতি, নিয়ম, নীতি, সাধনাদর্শ ও প্রচার-পদ্ধতির প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্পাত না করিয়া কেবল লক্ষ্য রাখ, তোমরা নিজের সত্যে স্থিতধী হইয়াছ কি না। এইখানেই তোমাদের অমরত্বের উৎস। অপরের মত বা পথকে মিথ্যা বলিয়া যুক্তিজাল বিস্তারে যে শক্তিক্ষয় হইয়া যাইতেছিল, তাহাকে সম্বরণ করিয়া নিজের মুষ্টির মধ্যে বজ্রদৃঢ় আকর্ষণে ধরিয়া রাখ এবং নিজের শক্তিবর্দ্ধনে কর নিয়োজিত। নিখিল বিশ্বের হিতের জন্য প্রাণপণে তাকাও নিজের দিকে। স্খলিত, গলিত, দলিত হইয়া নহে, অক্ষুণ্ণ, অটুট, অটল বীর্য্যে কর শক্তির সাধনা।"

জয়ধ্বনি চাহি না

ময়মনসিংহ দিলালপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিয়া আমার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করুক, ইহা আমি চাহি না। মুষ্টিমেয় দুই-চারি জন হইলেও আমার জীবনের সাধ, মরণের লক্ষ্য, দিবসের প্রয়াস, নিশীথের স্বপ্ন,

আদরের আদর্শ ও দুঃখের প্রাপ্তিকে নিজ নিজ জীবনে সফল করিয়া রূপায়িত করুক, ইহাই আমি চাহি। আমার কামনা অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য,—তোমরা পাঁচটী ছেলে-মেয়ে একত্র হইয়া ইচ্ছা করিলেই তাহার পূরণ হইতে পারে। আমার প্রত্যাশা অনেক কিন্তু দাবী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।"

দেবতা হও

ঢাকা নবাবগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার চিন্তা এমন স্বচ্ছ সরল সুন্দর হউক, এমন শুদ্ধ সহজ সত্য হউক, যেন পৃথিবীর যেই ভাষাতেই যে ইহার সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে, সে অনন্ত অপার প্রেমজলধির উদ্বেল তরঙ্গমালার প্লাবনে জীবনবেলার তটবিস্তারে উৎফুল্ল আনন্দের রসঘন আস্বাদন লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হয়। তোমার জীবন এমন সরল অনাড়ম্বর নিরভিমান হউক যেন নিখিল বিশ্বের প্রতিজনকে স্পর্শ করিয়া যে দিব্য চিন্তা অনেক সাধনায় মানবের জীবনে ফুটিয়া ওঠে, তাহা বিনা কঠোর সাধনায়, বিনা উৎকট তপস্যায় তোমার মধ্যে সহজাত সম্পদের মতন ফুটিয়া ওঠে। জগৎকে দেবত্বের আস্বাদন দিবে, তবেই না তুমি দেবতা! তৃষিত জগতের পানে সকরুণ নয়নে তাকাইতে তুমি ছাড়া আর কে আছে? তাই আমার নিয়ত আশীর্ব্বাদ, দেবতা হও।"

আস্তিকের যুক্তি ও নাস্তিকের যুক্তি

ত্রিপুরা হাজিগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ঋণ করিয়া ঘৃত খাও, ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া মরিতে পারিলে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগ মনে মরিয়া যাও,—ইহা চার্ব্বাকীয় নীতি। আর, পারত-পক্ষে ঋণের রাস্তায় যাইও না, আগুন লইয়া খেলিও না, রমণীর যৌবনের ফুটন্ত তৈলে নিজের শরীরের ছোঁয়াচ লাগাইও না,—কারণ, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল আছে, তাহা হইতে কাহারও নিস্তার নাই,—ইহা আস্তিক জনের নীতি। ভস্মীভূত দেহের আবার পুনরাগমন কোথায়,—ইহা চার্ব্বাকীয় যুক্তি। কিন্তু দেহ মরিলেও তুমি মর না, তোমাকে জীবনভরা কর্ম্মের সকল সংস্কার বহন করিয়া বেড়াইতে হয়, কর্ম্মজ এই সকল সংস্কারই তোমার বন্ধন বা মুক্তির হেতু, দান করিলেই তাহার প্রতিদান আছে, আঘাত করিলেই তাহার প্রতিঘাত আসে, প্রতিধ্বনি ছাড়া ধ্বনি নাই, প্রতিফল ছাড়া কর্ম্ম নাই, কোনও-না-কোনও প্রকার সুদ ছাড়া কোনও ঋণ হইতে পারে না,—ইহা আস্তিকের যুক্তি। ঋণের টাকা দিয়া যে ব্যবসায় খোলে, সে প্রথমেই খোঁজে ঋণ শোধ না করিয়া ফাঁকি দিয়া দাঁও মারিবার পথ কি। আর, নিজের উপার্জ্জিত স্বল্প মূলধন লইয়া যে কাজ সুরু করে, সে কেবলি চেষ্টায় থাকে যে, কমকে

বাড়াইয়া বেশী করিবার পথ কি, সামান্যকে অমিত সম্পদে রূপান্তরিত করিবার কৌশল কোথায়। আস্তিক যেখানে সততাকেই শ্রেষ্ঠ কৌশল বলিয়া জানে, নাস্তিক সেখানে ফাঁকিবাজি ধোকাবাজিকেই কিস্তিমাৎ করিবার শ্রেষ্ঠ ও সদ্যঃফলপ্রদ উপায়রূপে গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে কে বেশী সমাজহিতকারী হইতে পারে, ভাবিয়া দেখ। মানুষকে প্রতারণা করিবার বাহাদুরী-ভরা নীচতার কবল হইতে প্রতিজনে সরিয়া আইস,—মানুষের জীবনযাত্রার পথ সরল ও নিরাপদ হউক।"

সন্ন্যাসী

খুলনা-সেনহাটী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যৌবন বিষম কাল। একথা নিশ্চয়ই শত বার শত জনের মুখে শুনিয়াছ। নিজেকে এমনি কাজে বিলাইয়া দিয়াছ যে, যৌবন কখন আসিল, কখন পার হইয়া গেল, টেরও পাইলে না। কিন্তু সত্যই যৌবন বিষম কাল। যৌবনকে যে তাহার চরিতার্থতার মধ্য দিয়া তুষ্ট করিয়া দেও নাই, তাহার পরিশোধ কি সে তোমার বার্ধক্যে আসিয়া লইতে পারে না? কথায় বলে যে, চিরশত্রুর ভূতেও তাহাকে অনুসরণ করে। যৌবনকে ভুলিয়া গিয়াছিলে কিন্তু বার্ধক্যে বা প্রৌঢ়ত্বে সে তোমার প্রতিটী ক্ষয়িত অণুপরমাণুগুলির মধ্যে আসিয়া বসন্তের মলয়-হিল্লোল আস্বাদন করিতে চাহিতে পারে। তখন তুমি কি

করিবে? তখন তুমি কি করিয়া বার্ধক্যের পিক-কূজন ভ্রমর-গুঞ্জন অবরুদ্ধ করিবে?

"তাই বাল্যে বালকের মতন, কৈশোরে কিশোরের মতন, যৌবনে যুবকের মতন, প্রৌঢ়ত্বে প্রৌঢ়ের মতন, বার্ধক্যে বৃদ্ধের মতনই জীবন যাপন করা সঙ্গত। এই জন্যই ভারতে সন্ন্যাসের অত সমাদর থাকা সত্ত্বেও সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে, এমন কোনও অনুশাসন নাই। এই জন্যই চুয়ান্ন লক্ষ সন্ন্যাসীর দেশেও গৃহীকে সম্মান করিবার শিক্ষা বজায় রহিয়া গিয়াছে। এইজন্যই ভারতে চতুরাশ্রম,—যাহা অন্য কোনও দেশে নাই। চাতুর্বর্ণ্যের সঙ্গতি লইয়া তর্ক থাকিতে পারে কিন্তু চতুরাশ্রমের সঙ্গতি লইয়া কোনও তর্কের অবসর নাই।

"চিরযৌবনের অধিরাজ শ্রীভগবানকে জীবন সমর্পণ করিয়া দিতে পারিলে এই আতঙ্কের অবসান ঘটে, আশঙ্কার কোনও কারণও থাকে না। কিন্তু সকলেই কি এক কথায় ভগবানে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিতে পারে? এই জন্যই তোমাকে বারংবার বলিতেছি যে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ত্যাগী সাজিবার জন্য যুবকদের বুদ্ধি দান করিও না। গৃহে থাকিয়াই কে কতখানি ত্যাগী হইতে পারে, তাহার শিক্ষাই সকলের মনে জাগাইয়া তোল। তাহার পরে যদি কেহ সন্ন্যাসী হইয়া যায় ত' যাউক, সেও ত' ভাল কথাই। আগে হইতেই সন্ন্যাসের জন্য ইহাদের একটা জাগ্রত সংস্কার সৃষ্টি করিতে গেলে পরিণামে ফল এই দাঁড়াইবে যে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই

ত' সন্ন্যাসী হইবে না, সন্ন্যাসীর ঢং-ঢাংগুলির অনুকরণ করিয়া জগতের লোককে কেবল ধোঁকা দিয়া বেড়াইবে। মাঝখান হইতে পিতামাতা হইবেন তাঁহাদের প্রাপ্য সেবা হইতে বঞ্চিত, সমাজ হইবে তাহাদের সঙ্গত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত, জাতি হইবে রাজনৈতিক বা সামরিক বিপদের সময়ে কতকগুলি অনাবশ্যক বোঝায় উৎপীড়িত। সন্ন্যাস নহে, পূর্ণ মনুষ্যত্বই হইবে তোমার প্রচারের আদর্শ। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য যাহার সন্ন্যাসই আবশ্যক, সে যথাকালে সন্ন্যাসীই হইবে। গড়িয়া পিটিয়া কাহাকেও সন্ন্যাসী করা যায় না,—সন্ন্যাসী তাহার অসাধারণ আত্মশক্তির মহিমাতেই প্রকটিত হন। এই একটি অতি খাঁটি সত্য সম্পর্কে দেশব্যাপী অচেতনতার দরুণই মেকী সন্ন্যাসীতে দেশ ভরিয়া গেল, খাঁটি সন্ন্যাসীরা আর কলিকা পাইলেন না।

"যাও, একবার ঘুরিয়া আইস ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর। যাও, একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আইস সসাগরা এই বিরাট বিপুল বিচিত্র তোমার মাতৃভূমিকে। মঠ দেখিবে, মন্দির দেখিবে, দেবতা দেখিবে, পূজা দেখিবে, তাহার প্রাচুর্য্য কম নহে কিন্তু সন্ন্যাসী কয়জন দেখিবে, তাহা কেবল তোমার ভাগ্যবলের উপরই নির্ভর করে। শত শত ভক্তের আরতি গ্রহণ করিতেছেন স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত সিংহাসনে বসিয়া কিন্তু হায় হয়ত সেখানে সন্ন্যাসী নাই, বসিয়া আছে হয়ত একটা চাটুবাক্যে নারীজনকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার অলঙ্কাররাশি-অপহরণে সুপণ্ডিত এক চতুর

চোর। ভক্তেরা দেবতার পূজা করিয়া যাইবার পরে দেবতার প্রাপ্য নিজ ভোগবিলাসে ব্যয় করিবার জন্য হয়ত বসিয়া আছে একজন সন্ন্যাসী-বেশধারী অতিধূর্ত্ত ধনতৃষু। এক পিপাসিত কি অপর পিপাসিতের পিপাসা-নিবারণ করিতে পারে? এক ক্ষুধিত কি অপর ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা-বিদূরণে সক্ষম? যাহার নিজের তৃষ্ণা নাই, অপরের তৃষ্ণা সে-ই নিবারণ করিবে। যাহার নিজের ক্ষুধা নাই, অপরের ক্ষুধা সে-ই মিটাইবে। দেবতাদের উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রদত্ত নৈবেদ্যটুকু অপহরণ করিয়া জগতে যাহার হইবে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি, সে আর যাহাই হউক, সন্ন্যাসী নহে।"

ক্ষমা

চট্টগ্রাম আবুতরাব-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাহারও কোনও দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করিবে না, কেবল নিজের দুর্ব্বলতা সম্পর্কেই হইবে তোমার ক্ষমাশীলতা ধরিত্রীকেও অতিক্রমকারিণী,—ইহা অতি আত্মঘাতী সমাজঘাতী কুবুদ্ধি। মানুষের সহস্র দোষক্রটি থাকিবেই, তাহাকে কমাইয়া শতে পরিণত করিতে পার কি না, তাহার জন্য চেষ্টা কর কিন্তু তোমাকে হইতে হইবে সর্ব্বপ্রযত্নে নিষ্পাপ, নির্ম্মল, নিষ্কলুষ। একেবারে দোষহীন মানব হয় না, ইহা হইবে সকলের সম্পর্কে তোমার নীতি, আর এই মানবশরীরেই সর্ব্বদোষমুক্ত অপাপবিদ্ধ সুন্দরতা লাভ করা যায়, ইহা হইবে

তোমার নিজের সম্পর্কে তোমার নীতি। অপরের দোষ যতটা পারা যায় ক্ষমা করিয়াই তাহাকে সুন্দরতর হইবার সুযোগ দিতে হইবে, নিজের তুচ্ছতম অপরাধের প্রতিও ক্ষমাহীন হইয়া নিজেকে যোগ্যতর করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পৃথিবীতে যত সত্য ও সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ভিত্তিমূল খুঁজিয়া দেখিলে ইহাই পাইবে। ক্ষমার এই সদাসুন্দর মর্ম্মর পাথরের উপরে দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই বুদ্ধের, যীশুর, চৈতন্যের ধর্ম্ম জগৎকে করিয়াছে বিমুগ্ধ। কেবল শাসন, কেবল রক্তচক্ষু প্রদর্শন করিয়া কে কবে কোন্ সুমহৎ কার্য্যকে সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে? একক প্রযত্নে জগতের কয়টী কার্য্য সমাধা হইতে পারে? তার ব্যাপকতাই বা কতটুকু? সকলকে লইয়া সকলে নামিবে জগৎত্রাণের মহাসাধনার সিদ্ধি লভিতে, সকলের প্রেমময় ক্ষমা সকলকে করিবে সংশোধিত, বিশোধিত, পরিশোধিত এবং পশু-সুলভ নীচ-অস্তিত্বে জীবন-যাপনের অভ্যাস হইতে দেবতার জীবন যাপনে অভ্যস্ত করিয়া করিবে রূপান্তরিত। নিজের প্রতি ক্ষমা নাই, নিজেকে প্রতিটি অপরাধে প্রতিটি স্খলনে করিতে হইবে মার্জ্জনাহীন শাসন কিন্তু সকলের প্রতি ক্ষমার মধুময়ী স্নিগ্ধতাকে করিতে হইবে বর্ষার বারিধারার ন্যায় সুলভ। যেখানে ক্ষমা কাহারও পাপপ্রবৃত্তির ইন্ধনই যোগাইয়া থাকে, মাত্র সেই ক্ষেত্রেই ক্ষমাকে করিতে হইবে নির্ব্বাসন। অন্যত্র সে ঝরিবে শারদীয়া উষার শেফালীরাশীরই মত স্নিগ্ধ কোমল সৌরভে!"

অমৃত আস্বাদ

বীরভূম দুবরাজপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজেরে করিয়া দিয়া বিশ্বতোবিস্তার,
জানিও বন্ধন হ'তে নিজের নিস্তার।
একের মুক্তিতে বিশ্ব মহামুক্তিময়,—
মনুষ্যজন্মের ইহা উন্নত বিজয়।
পশুপক্ষী নিজ মুক্তি চাহিয়া কেবল
আত্মদুঃখ নিবারণে নিয়ত বিহ্বল।
নিজের চাহিবে মুক্তি শুধু দুর্ব্বলেরা,
তুচ্ছ সুখ-লোভে যার সর্ব্বেন্দ্রিয় ঘেরা।
বলীয়ান্ মানবেরা বিশ্বের লাগিয়া
আত্মারাম বারংবার আত্মবলি দিয়া।
বলীয়ান্ হও পুত্র,—এই আশীর্ব্বাদ,—
আত্মবলি দিয়া লভ অমৃত আস্বাদ।"

আমি ভালবাসিব

নোয়াখালী ছাগলনাইয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার জীবনের দুঃখময় অতীত জানিয়া হৃদয় আমার করুণায় বিগলিত হইল। এত পাপ আর এত অপরাধ তুমি তোমার

এই ক্ষুদ্র জীবনটীর মধ্যে কি করিয়া করিতে পারিলে? দুষ্কৃতির যে সংখ্যা তুমি জানাইতেছ, তাহাতে হিসাব করিয়া দেখিতেছি যে, জ্ঞানের বিকাশের ও হিতাহিতবুদ্ধির অভ্যুদ্গমের পর হইতে প্রতি দিনে তুমি তিন চারিটী করিয়া অতি জঘন্য কার্য্য করিয়াছ। তোমার বিষয় ভাবিয়া তোমার জন্য আমার কান্না পাইতেছে। দুই বাহু প্রসারিয়া তোমাকে আমি বুকে তুলিয়া নিতে চাহি। আমি দেখিতে চাহি যে, আমার স্নেহের বুকের পরশ পাইবার পরে কি করিয়া তুমি পুনরায় পাপকার্য্য কর! কেহ বলিবেন, ইহা তোমার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। কেহ বলিবেন, ইহা তোমার জন্মগত পৈতৃক সম্পদ। কেহ বলিবেন, তোমার মন ও মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যেই বিকৃতি রহিয়াছে। তাই, পৃথিবীর সভ্য-অসভ্য সকল জাতির মধ্যে যাহা বিনা দ্বিধায় এক বাক্যে অতি ভয়ঙ্কর অপরাধ বলিয়া বর্ণিত, তাহাকে তুমি জল-ভাত করিয়া লইয়াছ। কিন্তু আমি বলিব, তাহা নহে। কেহ এই জগতে তোমাকে ভালবাসে নাই। তাই তুমি মানুষ না হইয়া পিশাচ হইয়াছ। আমি তোমাকে হেয় জ্ঞান না করিয়া তোমাকে ভালবাসিব। তোমার সহস্র পাপ সত্ত্বেও তোমাকে প্রাণ দিয়া স্নেহ করিব। তোমার মনের আবিলতা, অনুভূতির মলিনতা, দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, চেষ্টার অসুন্দরতা, নিষ্ঠার অপবিত্রতা এবং লক্ষ্যের খর্ব্বতা সত্ত্বেও আমি তোমাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিব। তোমাকে শাসন দিয়া নহে, ভয় দেখাইয়া নহে, ঘৃণা করিয়া নহে, ভালবাসিয়া আমি জয় করিব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।"

ব্যথার ব্যথী

কুমিল্লা শ্রীরামপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা গরীব, তোমরা দুঃখী, তাহা তোমাদের চেয়ে আমি বেশী জানি। বাহিরের দুঃখদৈন্য দেখিয়া তোমরা যখন ম্রিয়মাণ হও, আমি তখন তোমাদের ভিতরের দুঃখদৈন্য দেখিয়া হাহাকার করি। তোমাদের দুঃখ আমি জানি বলিয়াই তাহার মুখে পদাঘাত করিয়া দুঃখজয়ী হইবার জন্য নিয়ত আমার কম্বুনির্ঘোষ প্রচারিত হইতেছে। বাগ্মিতা করিবার জন্য নয়, নিতান্তই তোমাদের প্রতি সমবেদনায় আমার কণ্ঠ চঞ্চল হয়। আমি তোমাদের ব্যথার ব্যথী, ইহাই আমার প্রধান সান্ত্বনা এবং ইহাই আমার একমাত্র পরিচয়।"

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

সসীম দেবদেবীর পূজা

গোবিন্দপুরের শ্রীযুক্ত রেবতী কবিরাজ মহাশয় ভক্ত ব্যক্তি, কিন্তু অন্ধ ভক্ত নহেন, তিনি ধর্ম্ম মানেন, কিন্তু বিচার-বর্জ্জিত গতানুগতিকের উপাসক নহেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রশ্ন করিলেন,—সসীম দেব-দেবীর পূজার আবশ্যকতা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এঁদের পূজা ব্যতীত যাঁদের মন অসীমের দিকে ধাবিত করা যায় না, তাঁদের জন্যই এঁদের পূজা আবশ্যক। যাঁদের মন অনায়াসেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের

দিকে ধাবিত করা সম্ভব, তাঁদের পক্ষে সসীম দেবতার পূজা নিরর্থক।

পুরাণে বর্ণিত দেব-চরিত্র

কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—পুরাণে বর্ণিত দেবতাদের চরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় চরিত্রবান্ মানুষের সহিত তুলনায় নিকৃষ্ট। দেব-চরিত্র এ ভাবে অঙ্কিত হওয়ার কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পুরাণগুলি আমাদের দেশের এক যুগের লোক-সাহিত্য। লোক-সাহিত্যের রচয়িতারা দুইটী দিকে লক্ষ্য রাখেন। একটী দিক হচ্ছে, কি লিখ্‌লে তাঁদের পাঠকদের মনোযোগ, বাহবা এবং প্রশংসা তাঁরা পাবেন। দ্বিতীয়তঃ পাঠকদের মনোবৃত্তির গঠনের অনুযায়ী কি ভাবে উচ্চ চিন্তার উন্মেষ ঘটান সম্ভব হবে। আজ-কালও সাহিত্যিকদের এই দুইটী দিকে যথেষ্ট খেয়াল দিতে হয়। প্রথমটীতে খেয়াল না রাখ্‌লে গ্রন্থ সমাদৃত হয় না, আলমারীতেই কীটে নষ্ট করে। দ্বিতীয়টীতে খেয়াল না রাখ্‌লে গ্রন্থ নিতান্তই ক্ষণজীবী সাহিত্য হয়, দশ বছর পরেই লোকে তার নাম ভুলে যায়। পুরাণগুলিতে যাঁরা দেবচরিত্রের বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সাধারণ মানুষদের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য নিজ নিজ কল্পনা-শক্তির একদিকে যেমন আশ্রয় নিয়েছেন, প্রচলিত সমাজের সাধারণ লোকের মনোধারারও তেমন যথেষ্ট অনুসরণ করেছেন। তাতেই দেবতাদের চরিত্রের বর্ণনায় এমন সব

নিন্দনীয় কাহিনী যুক্ত হয়েছে, যা আমাদের আধুনিক দৃষ্টিতে, নিতান্ত কুৎসিত ও জঘন্য ব'লে ঠেক্‌বে।

পৌরাণিক দেব-চরিত্র জঘন্য হইল কেন

কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—পুরাণ প্রভৃতির রচয়িতারা ছিলেন ঋষি বা মুনি। তাঁদের লেখনীতে গ্রাম্য অসংস্কৃত অমার্জ্জিত বাক্য বা কাহিনী লিখিত হ'ল কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সব ঋষি বা সব মুনিই উন্নতির সমান স্তরে বাস করেন না। অনেক মুনি এমনও ছিলেন, যাঁরা নিজ কবিত্বে বা নিজ প্রতিভাতেই মাত্র সাধারণ ইতর লোকদের ঊর্দ্ধে, পরন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে মোটেই অসাধারণ ছিলেন না। আজকালও কি স্বামি-নামধারী গৈরিক-পরিহিত এমন দু'দশজন সাধু মিলে না, যাঁরা অন্য প্রকারে সাধারণ লোকেরই মত? আবার একখানা পুরাণ আগাগোড়া একই রচয়িতার রচনা বহন করে নি। শত শত বছর ধ'রে কথক ঠাকুরদের মুখে মুখে প্রচারিত হবার কালে এক এক সময়ে এক এক জন গ্রাম্য কবি একটু রসিকতা করার লোভে বা কথকতা জমাবার উদ্দেশ্যে কিম্বা কাব্যকলা প্রসারণের অভ্যাস বশতঃ নিজ নিজ মনোমত ছড়ার পর ছড়া বেঁধে এক একটা মহাগ্রন্থের মাঝে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। একবার দুবার নয়, এভাবে শত শত বার একই গ্রন্থের মধ্যে শত শত জোড়াতালি পড়েছে। ফলে

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দামী শালখানা এখন এসে একখানা কাঁথায় পরিণত হয়েছে। এজন্য এখন আর বুঝবারই উপায় নেই যে, পৌরাণিক আখ্যায়িকারই মূল গল্পটুকু কি।

পুরাণাদি কি ভাবে পঠনীয়

কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—তা'হ'লে ত' পুরাণাদি গ্রন্থ লোকের পাঠ না করাই উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, পাঠ করাই উচিত। কেননা পুরাণ গ্রন্থগুলি আমাদের অতীত সভ্যতা, চিন্তা, সাধনা ও অনুশীলনের ধারাকে বহন ক'রে এনে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তবে পাঠ করা উচিত সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে। নিন্দা করার জন্যেও নয়, প্রশংসা করার জন্যেও নয়, পরন্তু ভালোমন্দ সকলের উর্দ্ধে শাশ্বত সত্যের বাণী তার মধ্যে কতটা আছে, কি আছে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। দেব-চরিত্রাদি যে ভাবেই অঙ্কিত হোক, সকল পুরাণেরই সুমহৎ লক্ষ্য এই যে, যেন পাঠক ও শ্রবকের মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়। অবশ্য ভগবান্ সম্বন্ধে সকলের ধারণা এক নয়। এক পুরাণের ধারণার সঙ্গেই অপর পুরাণের ধারণার পার্থক্য রয়েছে। উপনিষদাদি জ্ঞানগ্রন্থের কথা ত' ছেড়েই দিচ্ছি। এক এক ঋষি সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে এক এক আলোতে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। শুধু দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদই নয়, আরো যে কত কত পৃথক্ পৃথক্ বাদ এক একজন ঔপনিষদিক ঋষি গঠন ক'রেছেন, তার ইয়ত্তা করা কঠিন। যতকাল ঈশ্বর-

সম্বন্ধীয় চিন্তা থাক্‌বে, ততকাল ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন বাদ সৃষ্ট ও পুষ্ট কর্ব্বেন। অদ্বৈতবাদই একরকম নয় বা হবে না, দ্বৈতবাদের ত' কথাই নেই। কোনো পুরাণ বিষ্ণুকে, কোনো পুরাণ কালীকে, কোনো পুরাণ কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ ব'লে প্রচারের চেষ্টা করেছেন। সুতরাং পুরাণে পুরাণে মিল খুঁজে পাওয়াও এক সুকঠিন ব্যাপার। কিন্তু প্রত্যেক পুরাণই যে কোনও না কোনও ভাবে জীবকে ঈশ্বরানুগত করার চেষ্টা করেছেন, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং সেই দৃষ্টিটা খোলা রেখেই পুরাণ-পাঠ কর্ত্তব্য।

অল্প-বয়স্কদের পক্ষে পুরাণ-কাহিনী

কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—অপরিণত-বয়স্ক বালক-বালিকাদের নিকটে কি পুরাণ-কাহিনী-সমূহ নির্ব্বিচারে পরিবেশন করা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়ই না। বিচার ক'রে বেছে বেছে তাদের কাছে পুরাণের কাহিনী উপস্থাপিত কত্তে হবে। বিষ্ণু যে বলিকে ছলনা কর্ল্লেন কিম্বা দৈত্যদের প্রাপ্য অমৃতের অংশ থেকে বঞ্চনা কর্ল্লেন, এসব কাহিনী থেকে চরিত্র গঠনের উপাদান পাওয়া যাবে না। চন্দ্র কর্ত্তৃক বৃহস্পতির ভার্য্যাহরণ বা ইন্দ্র-কর্ত্তৃক গুরুপত্নীগমন, বিষ্ণু-কর্ত্তৃক শঙ্খচূড়-পত্নী তুলসীর সতীত্ব-নাশ প্রভৃতি কাহিনী সুনিশ্চিত চরিত্র-নাশক। অথচ

দধীচিকর্ত্তৃক চিরশত্রু ইন্দ্রকে স্বকীয় অস্থিদান, কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কংসবধের পরে নিজে গ্রহণ না ক'রে উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসন দান, পুরু-কর্ত্তৃক পিতার জরা নিজে গ্রহণ, একলব্য-কর্ত্তৃক দ্রোণাচার্য্যকে গুরুদক্ষিণা দান, পিতৃসত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ রাম-কর্ত্তৃক বনগমন, লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক রামানুগমন, পিতার সুখের জন্য ভীষ্মের চিরকৌমার্য্য গ্রহণ প্রভৃতি কাহিনী সুনিশ্চিত চারিত্র্য-শক্তির প্রবর্দ্ধক। সুতরাং অল্পবয়স্কদের কাছে পুরাণ-কাহিনী হিসাব ক'রে বিচার ক'রে বেছে বেছে পরিবেশন করা উচিত।

গাঙ্গাটিয়ার বক্তৃতা

বেলা দুই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি গাঙ্গাটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চৌধুরীর গৃহে আগমন করিলেন। একটী বক্তৃতা হইল এবং বক্তৃতান্তে জমিদার পরিবারের কুমারী মেয়েরা প্রকাশ্য সভাস্থলে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দ্দেশ মত যৌগিক আসনমুদ্রাদি শিক্ষা করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতায় যে এতটা সম্ভব হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্ণে কেহই মনে করিতে পারেন নাই। অদ্যদিনকার লিখিত একখানা পত্রে * শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার জনৈকা ধর্ম্মকন্যাকে লিখিয়াছেন,—

"গাঙ্গাটিয়ার চক্রবর্ত্তী-চৌধুরীরা অত্যন্ত গোঁড়া এবং আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন জমিদার। আমি যে আমার বক্তৃতাদ্বারা তাঁহাদের ঘরের কুমারী মেয়েদিগকে প্রকাশ্য সভাস্থলে যৌগিক

* কুমারীর পবিত্রতা। দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণের) অষ্টম পত্র।

আসন-মুদ্রা অভ্যাসে প্রণোদিত করিতে পারিব, এতটা প্রথমে মনে করি নাই। কিন্তু দেখিলাম, সত্যের সমাদর সর্ব্বত্রই আছে।"

হিন্দুধর্ম্মের ভবিষ্যৎ

বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী চৌধুরী প্রশ্ন করিলেন,—হিন্দুধর্ম্মের ভবিষ্যৎ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হিন্দুধর্ম্মের ভবিষ্যৎ হচ্ছে নিখিল জগৎ জু'ড়ে সর্ব্বত্র সুপ্রচার, সর্ব্বজাতি, সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্বমত ও সর্ব্বপথের মধ্যে নিজ সুপ্রতিষ্ঠা। একটী জীবকেও পর মনে না ক'রে ভারতের শাশ্বত ধর্ম্ম বিশ্বকে আলিঙ্গন দেবে। সত্য, প্রেম ও সরলতার বলে সকল অসত্যকে সে নিরাকৃত কর্ব্বে, সকল অপ্রেমকে সে নির্ব্বাসিত কর্ব্বে, সকল কুটিলতার সে ধ্বংস সাধন কর্ব্বে। যত জনকে সে উদ্ধত অহমিকায় এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীন মূঢ়তায় বর্জ্জন করেছে, সকলকে সে বিনীত সেবাবুদ্ধিতে এবং অনন্ত-দূরবর্ত্তী বিবেচনায় বুকের কাছে টেনে আন্‌বে, আত্মস্থ কর্ব্বে। পর তার কেউ থাক্‌বে না, দূর তার কেউ রইবে না, প্রেমে আর স্নেহে, সেবায় আর অভয়দানে সে সকলকে আপন কর্‌বে, কাছে টান্‌বে। এই হচ্ছে হিন্দুধর্ম্মের ভবিষ্যৎ।

হিন্দুধর্ম্ম কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কাকে বলে? নির্দ্দিষ্ট একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক

যাকে নিজেদের ধর্ম্ম ব'লে জ্ঞান করেন এবং বাহিরের পৃথিবীর কোটি-কোটি লোককে অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় অনার্য্য ব'লে অবজ্ঞা করেন, তাই কি হিন্দুধর্ম্ম? যে ধর্ম্ম অসীম এবং শাশ্বত, সকল পরকে আপন করার প্রবৃত্তি যে ধর্ম্মের প্রকৃত প্রতিভা, একদা যে ধর্ম্ম ম্লেচ্ছ, শবর, পারদ, পুলিন্দ, শক, হূণ প্রভৃতি সকলকে নিজের বিশাল বক্ষে স্থান দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, যে ধর্ম্ম মধ্যযুগীয় সকল কুসংস্কারে জলাঞ্জলি দিয়ে গায়ত্রী-মন্ত্রের দিব্য তেজে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ভবিষ্যতে সকল মতের ও সকল পথের দ্বন্দ্ব নিজের ভিতরে টেনে এনে মিটিয়ে দেবেন, তাই হচ্ছেন প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। নিখিল বিশ্বকে আপন করার সাধনারই নাম হিন্দুধর্ম্ম।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে শ্রীশ্রীবাবামণি গোবিন্দপুর প্রত্যোবর্ত্তন করিলেন।

গোবিন্দপুর (ময়মনসিংহ)
৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

মন্ত্র ব্যতীত সর্পাঘাতের চিকিৎসা

অদ্য প্রাতে মন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা উঠিতেই সর্পদংশনের চিকিৎসার কথাও উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বহু সময়ে বহু লোককে হস্তকৌশলের দ্বারা সর্পদংশনের চিকিৎসা শিখাইয়াছেন * এবং যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা ও বগুড়ার অন্তর্গত

* "সর্পাঘাতের চিকিৎসা" দ্রষ্টব্য।

চন্দনবাইসাতে সহসা দুই সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আনয়ন করাতে বিশাল জনতার সমক্ষে স্বহস্তে তাহাদের বিষ নামাইয়া এই প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মন্ত্রজপে চিকিৎসকের আত্ম-বিশ্বাস বাড়ে। কিন্তু সাপের বিষ শরীরের যে-কোনও অংশে থাকুক, যদি গুহ্য দেশে, উপস্থে বা কণ্ঠের ঊর্দ্ধে দংশন না হয়, তাহ'লে এই হস্ত-কৌশলের দ্বারাই তার বিষকে নিম্নগামী ক'রে তাকে শরীর থেকে বের ক'রে দেওয়া যায়।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি একটী লোককে সর্পদষ্ট রোগী বলিয়া কল্পনা করিয়া তাহার উপরে সমগ্র চিকিৎসাটা প্রদর্শন করিলেন। উপস্থিত অনেকেই চিকিৎসার প্রণালীটী আগ্রহের সাহিত শিক্ষা করিলেন।

গোবিন্দপুরের বক্তৃতা

অপরাহ্নে কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীর আঙ্গিনাতেই একটী সভার আয়োজন হইয়াছে। গোবিন্দপুর এবং নিকটবর্ত্তী অপর কয়েকটী পল্লীর যুবক ও পৌঢ়েরা সমবেত হইয়াছেন। সভায় জনতা খুব অধিক হয় নাই, কারণ, এই অঞ্চলে শ্রীশ্রীবাবামণি জনসাধারণের সুপরিচিত নহেন। অবশ্য সভাভঙ্গের পরে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের প্রধানগণ শ্রীশ্রীবাবামণিকে নিজ নিজ গ্রামে নিয়া যাইবার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু

শ্রীশ্রীবাবামণি সেই সকল আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ, কিশোরগঞ্জ সহরের কার্য্য-তালিকা ইহার পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত ও প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল।

সন্তান সম্পর্কে ভারতের ধারণা

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রথমতঃ দুই একটী পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করিলেন। তৎপরে বলিলেন,—মানব-সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হচ্ছে, সুসন্তান লাভের মধ্য দিয়ে। অথবা আরো স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে হ'লে একথাই বলতে হবে যে, কোন্ সমাজ কত উন্নত স্তরে আরোহণ করেছে, তার কষ্টিপাথর হচ্ছে তার সন্তানদের সম্পর্কে ধারণা। জনক-জননী ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগে প্রমত্ত, আর, মাঝখানে হঠাৎ এক অবাঞ্ছিত অতিথি এসে রসভঙ্গ বা শান্তিভঙ্গ কর্‌ল, ভারতীয় দৃষ্টিতে সন্তান বস্তুটী এরূপ নয়। সন্তান পিতারও বাঞ্ছিত, মাতারও বাঞ্ছিত, দম্পতীর আত্মীয়-পরিজন সকলেরই বাঞ্ছিত। পুত্র জন্মালে ধান্য-ক্ষেত্রের আর ইক্ষুক্ষেত্রের ফসল কেটে ঘরে আনবার জন্য কটা বিনা মাইনের কুলী পেলাম, ভারতীয় দৃষ্টিতে সন্তান এই জাতীয় বস্তু নয়। শুনেছি আমেরিকার শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রো রমণীদের ক্রীতদাসী রূপে ক্রয় করেছে এবং তাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছে শুধু নিজেদের কৃষিক্ষেত্রের কুলী বাড়াবার জন্য। পুত্র জন্মাবে, আর সে বড় হ'য়ে বৃদ্ধ পিতা-মাতার অন্ন জোগাবে, পুত্রোৎপাদনের পশ্চাতে এই বুদ্ধিও ভারতে দৃঢ়মূল নয়। ঐহিক

ভাবে পুত্রদ্বারা বার্দ্ধক্যকালে জনক-জননীর কিছু সহায়তা হবে, এ আশা অল্পবিস্তর সকলের মনেই যদিও থাকেই, কিন্তু পুত্রের কাছে পিতামাতার আশা এর চেয়ে অনেক বেশী। "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" অনুশাসন মান্য ক'রে বৃদ্ধ পিতামাতা বনে গমন ক'রে বানপ্রস্থ অবলম্বন কত্তেন, কুশাসনে শয়ন ক'রে, যদৃচ্ছালব্ধ স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফলমূলে তনুধারণ ক'রে তপস্যা ক'রে জীবনের অবশিষ্ট কটা দিন আধ্যাত্মিক অনুশীলনে কাটিয়ে দিতেন,—বৃদ্ধকালে পুত্র তাদের সোণার পালঙ্কে বসিয়ে চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় দিয়ে পরিতুষ্ট করুক, এ আকাঙ্ক্ষা কারো মনে থাক্‌ত না। ঐহিক ভাবে পুত্র সম্পর্কে তাঁদের মনে এই ধারণাই থাক্‌ত যে, পুত্র যেন বংশানুক্রমিক কল্যাণ-সাধনাকে নিজের জীবন-ব্যাপী অনুশীলনের ভিতর দিয়ে স্ফুটতর ও বিকশিত-তর ক'রে তোলে এবং যেন নিজ বংশ-প্রবাহে অনন্তকাল তাকে ধারাবত্ত রাখবার দিকে দৃষ্টি না হারায়,—অর্থাৎ পুত্র যেন স্বধর্ম্মানুশীলন করে। কিন্তু পুত্র সম্পর্কে তাঁদের পারত্রিক দৃষ্টিই সর্ব্বপ্রধান। তাই, মহাভারত বল্‌ছেন,—ব্রহ্মা তাকেই পুত্র ব'লে স্বীকার করেছেন, যে নিজ ত্যাগ-তপস্যা-স্বধর্ম্মনিরতি প্রভৃতি দ্বারা পিতাকে নরকদুঃখ থেকে ত্রাণ করে,—"পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ; তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।" অর্থাৎ ঔরসে উৎপন্ন হ'লেই সে পুত্র হ'ল না, বুড়ো বাপ মাকে খেতে দিলেই সে পুত্র হ'ল না,—এগুলি করা ছাড়াও তার আরো

কর্ত্তব্য আছে। তা' হচ্ছে নিজের সাধনার বলে পিতা-মাতার স্বর্গপথের কণ্টক উন্মূলিত করা। এই কর্ত্তব্য যে করে, সে পুত্র। এই হচ্ছে পুত্র সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টি। রামায়ণ বল্‌ছেন,—"তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃণ্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ।" পিতৃপুরুষসকলকে যে সর্ব্বতোভাবে পালন করে, সেই পুত্র। "পিতৃণ্ পাতি" কথাটাকে টীকাকার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন,—"স্বর্গলোক-প্রাপণেন তেষাং রক্ষণং বিদধাতি",—পুত্রের জীবন এবং কার্য্য এমন হওয়া চাই যেন, তার ফলে পিতৃপুরুষগণ নিরবচ্ছিন্ন সুখময় পারলৌকিক শান্তি ভোগ কত্তে পারেন। নইলে সে ঔরসজাতও হ'তে পারে, উত্তরাধিকারীও হ'তে পারে, কিন্তু পুত্র নয়। পুত্রের জন্ম পিতৃ-পুরুষের পক্ষে এক পরম সৌভাগ্য। মনুসংহিতা বল্‌ছেন,—স্বর্গলোক-বাস চাও ত' এমন পুত্রের পিতা হও, যার তপস্যার বল আছে; আর অনন্তকাল যদি সেই স্বর্গের সুখ ভোগ কত্তে চাও, তা হ'লে তোমার সুযোগ্য পুত্র যাতে যোগ্যতর এক পুত্রের পিতা হ'তে পারে, অর্থাৎ তোমার পৌত্র যাতে তপঃ-সমৃদ্ধিতে সুসম্পন্ন হয়, তা কর; আর যদি অনন্তকাল স্বর্গবাসের চেয়েও শ্লাঘ্যতর আদিত্যলোক লাভ কত্তে চাও, যেখানে নিরন্তর জ্ঞান-সমুজ্জ্বল, সুখভোগাদি দ্বন্দ্বের অতীতে যেখানকার জীবন সত্যপ্রতিষ্ঠিত আদ্যন্তরহিত পূর্ণ-প্রজ্ঞায় অপরিছিন্ন, তা'হলে পৌত্রের ঘরে তপস্বী পুত্র অর্থাৎ ধীমান্ মতিমান্ ক্রিয়াবান্ তপোরত সাধক ও ধার্ম্মিক প্রপৌত্র লাভের চেষ্টা

কর;—"পুত্রেণ লোকান্ জয়তি, পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে; অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি বিষ্টপম্।" পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ডে "যথা জলং কুপ্লবেন তরন্মজ্জতি মূঢ়ধীঃ; তথা পিতা কুপুত্রেণ তপস্যন্ধে নিমজ্জতি।" অর্থাৎ, যেমন কোনও মূর্খ ব্যক্তি নিকৃষ্ট ভেলার দ্বারা নদী পার হ'তে গিয়ে জলে ডুবে মরে, তদ্রূপ পিতাও পুত্রের দ্বারা নরক হ'তে ত্রাণ পেতে চাইলে কি হবে, তাকে অন্ধ-তমসাবৃত ঘোর নরকেই ডুবে মরতে হবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মে বলেছেন,—শত কূপ থেকে একটীমাত্র বাপী শ্রেষ্ঠ, শত বাপী থেকে একটীমাত্র সরোবর শ্রেষ্ঠ, শত সরোবর থেকে একটীমাত্র যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু একটীমাত্র সৎপুত্র শত যজ্ঞ থেকেও অধিক।—"শতকূপাধিকা বাপী, শতবাপীসমং সরঃ, সরঃশতোঽধিকং যজ্ঞঃ, পুত্রো যজ্ঞশতাদ্বরঃ।" কূপখনন কর্ল্লে পুণ্য হয়, কিন্তু একটী পুকুর কাটালে শত কূপ খননের চেয়ে বেশী পুণ্য লাভ হয়, আবার শত পুকুর কাটানোর চেয়ে একটী সরোবর কাটালে তার চাইতে বেশী পুণ্য হয়, কিন্তু শত সরোবর কাটানোর চাইতেও একটী মাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বেশী পুণ্য হয়। মানুষ পরলোকের সুখের আশায় জীবন জু'ড়ে কত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হবার কোনো প্রয়োজন নেই, কেন না, পুত্রের মত পুত্র যদি একটী উৎপাদন কত্তে পার, তবে তা দ্বারাই শত শত যজ্ঞের সুফল তুমি অনায়াসে পাবে। এই হচ্ছে সন্তান সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টি।

মানব-জীবন শুদ্ধতর হউক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ আমরা গার্হস্থ্য-বিমুখ সন্ন্যাসীরা ধর্ম্ম-প্রচারে বেরিয়েছি। কিন্তু আমরা কি চাচ্ছি, দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে গৈরিক পরিয়ে সন্ন্যাসী কত্তে? এই কি আমাদের ধর্ম্ম-পরিব্রজ্যার উদ্দেশ্য? আমরা চাই প্রত্যেক পিতা-মাতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে যে, তাঁদের সুসন্তানের জনক-জননী হ'তে হবে, কতকগুলি শৃগাল-কুক্কুরের বংশবৃদ্ধি করার অধিকার তাঁদের নেই। আমরা চাই যে, ঘরে ঘরে লক্ষ্মণ, ভরত, ভীষ্ম, অভিমন্যু জন্ম গ্রহণ করুন, ঘরে ঘরে দধীচি ও বৃহস্পতির আবির্ভাব হোক, ঘরে ঘরে কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, ঋষি ও তপস্বীদের পুনরাবির্ভাব সম্ভব হউক। এক কথায় আমরা চাই,—মানব-জীবন শুদ্ধতর হোক্। ক্রীতদাসের বংশধরেরা অনন্তকাল ক্রীতদাসেরই দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহনের জন্য যেন আর না আসে। বসু-দেবকীর ঔরসে ও গর্ভে আজ মুক্তিদাতা ভগবান্, প্রেমদাতা সর্ব্বেশ্বর, জ্ঞানদাতা ও গুরুশ্রেষ্ঠ, জয়বিধাতা সারথি, বুদ্ধিদাতা বন্ধুবর এবং ক্ষমার জীবন্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্ভব হোক্।

গোবিন্দপুর (ময়মনসিংহ)
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

সমাগত যুবক ও প্রৌঢ়দিগকে যৌগিক আসন-মুদ্রা প্রদর্শন হইতেছে।

যৌগিক আসন-মুদ্রা ও ডনকুস্তি

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ব্যায়াম কর্‌লেই কি তদ্দ্বারা যৌগিক আসন-মুদ্রার ফল পাওয়া যেতে পারে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না। যৌগিক আসন-মুদ্রাগুলিও এক প্রকারের ব্যায়ামই বটে। কিন্তু প্রচলিত ব্যায়ামগুলি প্রায় সবই মাংস-পেশীর উন্নতি-বিধানের দিকে তাকিয়ে পরিকল্পিত। আর, যৌগিক আসন মুদ্রাগুলির আবিষ্কার হয়েছে প্রথমতঃ মনকে দ্রুত স্থির করার প্রয়োজনে, দ্বিতীয়তঃ শরীরের শিরা-উপশিরার উপরে ক্রিয়া-বিস্তারের উদ্দেশ্যে। এই কারণেই চলতি ডনকুস্তির অভ্যাসের দ্বারা যৌগিক আসন-মুদ্রার ফল পাওয়া যায় না।

ছোট জাত ও বড় জাত

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি নানা স্থানে যে সকল পত্র লিখিলেন, তাহার কতিপয় অংশ-বিশেষ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

কুমিল্লা জেলান্তর্গত কসবা-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ছোট জাত বলিয়া কাহাকে ঘৃণা করিবে বল? তোমার নিজের মধ্যে কতগুলি ছোটত্ব রহিয়াছে, আগে তাহার অনুসন্ধান কর। মল, মূত্র, ঘর্ম্মাদি ছোট জাত ও বড় জাতের সকলেরই একরূপ। সমগ্র মানব-জাতির প্রতি সমদৃষ্টিতে

তাকাও। ভেদবুদ্ধিরূপ মহাপাপকে অন্তর হইতে উন্মূলিত কর। যেখানে দেখিবে সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মানুরাগ, শুচিতা, সদাচার ও ভগবদ্‌ভক্তি, সেইখানেই মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত করিও। কে কোন্ বংশে জন্মিয়াছে, এই বিচার সর্ব্বথা পরিত্যাগ কর। কে কেমন জীবন-যাপন করিতেছে, মাত্র তাহারই বিচার কর। বশিষ্ঠতুল্য জ্ঞানী একটী ডোম বা চামারের ছেলে অকাঠ মূর্খ একটী ভট্টাচার্য্য-নন্দনের চাইতে নিকৃষ্ট, ইহা মনে করা উচিত নহে। সদাচারী একটী কৈবর্ত্তের ছেলে মদ্যপ একজন ব্রাহ্মণনন্দনের চেয়ে নিকৃষ্ট—এইরূপ মনে করিও না। ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিত একজন ভাঙ্গী বা দোসাদের ছেলের চেয়ে পরনারী-লোলুপ কুক্কুর-জীবন-যাপন-কারী গম্যাগম্য-বিচারে অনিচ্ছুক একজন পাণ্ডে বা ত্রিবেদী শ্রেষ্ঠ, এইরূপ ধারণা পরিত্যাগ কর। তোমার পল্লীর চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে যোগী এবং কপালী জাতীয় এমন বহু সাধু ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা আচারে ব্রাহ্মণ, সাধনায় ব্রাহ্মণ এবং বিনয়ে ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য ও নীচ বলিয়া জ্ঞান করা অধর্ম্ম বলিয়া মনে রাখিও। বংশের হিসাবে উচ্চনীচের বিচার ছাড়িয়া দিয়া আচারের হিসাবে উচ্চনীচের বিচার করিতে শিখ। সদাচার যখন সম্মানের কারণ হইবে, তখন প্রাণপণে সকলে সদাচারী হইতে চেষ্টা করিবে। তোমরা ব্যক্তিগুলিকে তাহাদের আচার দিয়া বিচার কর, জন্ম দিয়া নহে। পৃথিবীতে কেহই গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারে না যে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে কাহার বংশে জাত। ব্রাহ্মণেরা

যে ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে জন্মিতেছেন, মাত্র এই বিষয়েই কতকটা নিশ্চয়তা পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে কদাচ অব্রাহ্মণের ঔরস পতিত হইয়াছে কি না, একমাত্র সর্ব্বদর্শী ভগবান্ ছাড়া তাহার আর কোন সাক্ষী নাই। তুমি যাহাদিগকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া গণনা করিতেছ, তাহারাও প্রায় নিশ্চিত ভাবে সেই একটী তথাকথিত নিকৃষ্ট জাতির ক্ষেত্রেই জন্মিতেছে, এই মাত্র। নতুবা সেই নিকৃষ্ট জাতির ক্ষেত্রে যে বারংবার উৎকৃষ্ট জাতির ঔরস পতিত হয় নাই, একথাও কেহ জিদ্ করিয়া বলিতে পারে না। উদ্ধত ও ক্ষমতাগর্ব্বী দুঃশীল ক্ষত্রিয়জাতি উগ্রতেজা ব্রাহ্মণতনয় পরশুরামের কোপে পড়িলে ধরিত্রী পরপর একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া হইয়াছিলেন। তখন নূতন ক্ষত্রিয়-কুলের সৃষ্টির জন্য ক্ষত্রিয়া নারীরা ব্রাহ্মণদের ঔরসে পুত্রবতী হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এক্ষেত্রে, এই পুত্রদল যে ক্ষত্রিয়, তাহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ এই যে তাহারা ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু কিম্বদন্তীতে বা পুরাণকথায় একথা স্বীকৃত হইতেছে যে, বীর্য্যটুকু ছিল ব্রাহ্মণের। অবশ্য ইহা অতীতের বিস্মৃত কাহিনী। বর্ত্তমানেও বিচার করিয়া দেখিবার মত ঘটনা আছে। দাক্ষিণাত্যের একটী সুপ্রসিদ্ধ অংশে অতীব উচ্চশ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্যেরা বিবাহ করিতে পরেন না। অর্থাৎ তাঁহারা ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণি গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত। কিন্তু শূদ্রার ক্ষেত্রে সন্তানোৎপাদন সেখানে অপ্রসিদ্ধ নহে। অর্থাৎ শূদ্রার গর্ভে

ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তানেরা শূদ্র বলিয়াই পরিচয় বহন করে। সম্ভবতঃ ধন-সম্পদ-সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজ সম্পত্তি যাহাতে টুকরা টুকরা না হইয়া যায়, তাহারই জন্য জ্যেষ্ঠেতর পুত্রদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ফলে জ্যেষ্ঠেতর ব্রাহ্মণ-তনয়দের দ্বারা শূদ্র-সংখ্যা বিপুল ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে বা হইতেছে। জাতিভেদের শত গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও এভাবে জাতিতে জাতিতে অবিরাম সংমিশ্রণ হইয়া আসিয়াছে এবং একদা যেমন এক ব্রাহ্মণ জাতিই ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া অনেকগুলি জাতি হইয়াছিল, তেমনি অপ্রকাশে শূদ্রজাতি নিজেদিগকে বিস্তারিত করিয়া নির্ব্বিশেষে সকল জাতিকেই শূদ্রে পরিণত করিয়াছে। যে সকল বংশের ভিতরে কোনও প্রকারেই গোপনে শূদ্র-শোণিত প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই সকল বংশের লোকেরাও সদাচারভ্রষ্ট ও নীতিচ্যুত হইয়া শূদ্রেই পরিণত হইয়াছেন। নিখিল ভারতবর্ষে আজ প্রকৃত ব্রাহ্মণ কদাচিৎই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। কেহ জন্মে শূদ্র, কেহ আচরণে শূদ্র, কেহ সংস্কারে শূদ্র, কেহ অভ্যাসে শূদ্র। নাসিকা-কুঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে আচরণে, সংস্কারে ও অভ্যাসে বর্ণশ্রেষ্ঠের পদারোহণে প্রণোদিত কর। ভবিষ্যৎ ভারতে মাত্র একটী বর্ণ-ই থাকিবে— তাহা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিয়াই মানব সেদিন দেশরক্ষার জন্য অন্যত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিবে, ব্রাহ্মণত্ব-বিচ্যুত না হইয়াই সে কৃষি করিবে, গোপালন করিবে, বাণিজ্যের তরী

সমুদ্রে ভাসাইয়া নানা দেশ হইতে রত্ন আহরণ করিয়া আনিবে, পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সে হাসপাতালে রোগীর সেবা করিবে, গৃহস্থকে কূপ হইতে জল তুলিয়া দিবে, কারখানাতে লোহা পিটাইবে, রেল, মোটর, ট্রাম চালাইবে, নিজ বাসন নিজে ধুইতে অক্ষম ব্যক্তির সকড়ী বাসন সেবাবুদ্ধিতে মাজিবে। ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সে জুতা-সেলাই করিবে, আবার চণ্ডীপাঠও করিবে, পাইখানা পরিষ্কারও করিবে, গীতাব্যাখ্যানও করিবে। ছোটজাত বড়জাতের যুদ্ধটা তোমরা ক্ষান্ত কর। সকলের ভিতরে কার্য্যে, চিন্তায়, আহারে, বিহারে, সদাচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। কদাচারীকে ঘৃণা করিয়া উপেক্ষায় ফেলিয়া যাইও না, মায়ের মত দরদী হৃদয় লইয়া তার কাছে যাও, তাকে সদাচারী কর। দূষিত-ক্ষত রোগীকে কি হাসপাতালের ডাক্তার ঘাড়ে ধরিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দেয়, না, তাকে চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করে?"

নামের অপেক্ষা বড় কিছু নাই

কুমিল্লা চান্দাইসার-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দলপুষ্টি বর্দ্ধনের জন্য কত জনে কত ভাবে তোমাকে ডাকাডাকি করিবে, নিজের ঐশ্বর্য্য ও মহিমাকে তোমার নয়নের সমক্ষে জাজ্জ্বল্যমান করিয়া ধরিবার জন্য কত প্রকারের প্রয়াস

পাইবে, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য কি হইবে, তাহা কি আমি তোমাকে বলিব? বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ না হইয়া, বচন-চাতুরীকেই সত্যের পরাকাষ্ঠা জ্ঞানে তৎপ্রতি আকৃষ্ট না হইয়া তুমি যে সামান্য আধ্যাত্মিক মূলধন পূর্ব্বেই সঞ্চয় করিয়াছ, তাহা লইয়াই একান্ত মনে একনিষ্ঠ চিত্তে সাধনে রত হওয়াই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে। বড় দেখিয়া তুমি কি কাহারও দলে ভিড়িতে চাহ বাছা? বড়'রও বড় আছে। তারও বড় আছে। আবার তার চেয়েও বড় আছে। বড়'র বড় তারও বড় চাখিতে চাখিতে জীবনের প্রদীপে তৈল ফুরাইয়া যাইবে, সলিতা পুড়িয়া ছাই হইয়া কৃষ্ণরেখার মত পড়িয়া রহিবে, কিন্তু তোমার কোনও কাজই হাসিল হইবে না। অতএব দশ দিকে মনকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া একমাত্র পরমসম্বল অখণ্ড-নামকেই দৃঢ় হস্তে ধরিয়া রাখ। নামের চেয়ে কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও আর কেহ বড় নাই। নামই অনন্তকাল সকলের বড় হইয়া রহিয়াছেন এবং রহিবেন।"

সামাজিক ও পারিবারিক কলহ ও সাধন

কুমিল্লা দরখার-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সামাজিক দলাদলি বা পারিবারিক কলহের মধ্যে যাহাতে

জড়াইয়া না পড়, তোমাদের সর্ব্বক্ষণ সেই দিকে প্রখর দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সাধকের জীবন পরিবার ও সমাজের গণ্ডীকে ভেদ করিয়া সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে শত সহস্র যোজন জুড়িয়া ব্যাপকতা পাইবে। সাধন-মার্গাশ্রিত ব্যক্তি গণ্ডীর ভিতরে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া পারিবারিক কলহের ব্যাপারে উত্তরের হিস্যার পক্ষ ধরিয়া দক্ষিণের হিস্যাকে অপদস্থ করিতেই বা কেন চেষ্টা করিবে, অথবা বিলাত-ফেরতা সামাজিকদের স্বপক্ষে বা বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সনাতনী সামাজিকদের বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষেই বা কেন ধনুর্ব্বাণ হস্তে উপস্থিত হইবে? পারিবারিক কলহ পরিবারস্থ অপর লোকদের করিতে দাও, সামাজিক সংঘর্ষ বৃদ্ধেরাই নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধির অনুযায়ী চালাইতে থাকুন,—এই সকল দ্বন্দ্ব-কলহের অতীতে রহিয়া তুমি তোমার সাধন-রস-ভাণ্ডার অবিরাম সাধনার দ্বারা পূর্ণ করিয়া লও। তোমার লক্ষ্য হউক একটি,—দশটী নয়।"

সাধনে একনিষ্ঠা

কুমিল্লা মজলিশপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ক্ষণে ক্ষণে মতান্তর এবং পথান্তর সাধক-জীবনের অতীব গুরুতর বিপদ জানিও। এক পথে এক মতে আমৃত্যু নিষ্ঠায় লাগিয়া থাকিবার স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যই প্রকৃত সাধকের প্রধান

লক্ষণ। জগতে নানা মত নানা পথ থাকিবেই, কিন্তু সাধকের কাছে নিজ মত ও নিজ পথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পারে না। পরিবারের মধ্যে শ্বশুর, ভাসুর, দেবর প্রভৃতি কতজনই থাকিতে পারে, কিন্তু সতী নারী অপরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিলেও কিম্বা তাহাদের প্রাপ্য সেবা অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রদান করিলেও স্বামী ব্যতীত অপর কাহাকেও নিজের সর্ব্বাধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করে না। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে তুমি তোমার কর্ত্তব্য অনুধাবন কর। শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর, শৈব বা উদাসী কাহারও ধর্ম্মই নিকৃষ্ট নহে, কিন্তু তোমার নিকটে তোমার নিজস্ব সাধনই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই ধারণা রাখিয়া অবিরাম অনুক্ষণ সাধন করিতে থাক। নতুবা সাধন-বৃক্ষের অমৃতময় ফল ইহজন্মেও আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না। আমার পরিচিত একজন সাধু-ব্যক্তিকে আমি পর পর দশ বারো জন গুরুর নিকটে দীক্ষা নিতে দেখিয়াছি। কিন্তু ইনি সাধু হইলেও সাধক নহেন এবং ইহজন্মেও সাধনের অমৃতময় ফল আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমরা এই সকল ব্যক্তিদের আচরণের অনুকৃতি করিও না। যে যেখানে সাধন পাইয়াছ, যে যেই সাধন পাইয়াছ, তাহা লইয়া সাধন-সমুদ্রের তলদেশে ডুব দাও, কোনও পিছন-টান রাখিও না, কোনও পূর্ব্বানুরাগের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিও না। জীবনকে যদি স্বার্থক করিতে হয়, তাহা হইলে নানা মতে নানা পথে প্রলুব্ধ দৃষ্টি পরিহার করিতেই হইবে।"

পরমতে সহিষ্ণু একনিষ্ঠা

কুমিল্লা নাটাই-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই, এই প্রত্যয়ে একান্ত নির্ভরশীল হইয়া যে সাধন করে, তাহাকে বলিব একনিষ্ঠ। শত শত প্রভুর অস্তিত্ব মানিয়া সাধন করিলে সেই সাধনে কখনও সিদ্ধি অর্জ্জন সম্ভব নহে। তোমার ইষ্ট ব্যতীত অপর কাহারও যদি অস্তিত্ব স্বীকার কর, তবে সকলের অস্তিত্বই তোমার ইষ্টের সেবকরূপে, এই ভাবে যত ইচ্ছা দেব-দেবীর অস্তিত্ব মানিতে পার। সর্ব্বদেবসেব্য সেই পরম-দেবই তোমার একমাত্র উপাস্য, ইহা কখনও ভুলিতে পার না। অবশ্য, এই একনিষ্ঠ ভাব হইতে বিকার সৃষ্টি হইয়া যে জগতে বহু সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য, গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা এবং পরপীড়নের উৎপাত ঘটিয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু অপরের ধর্ম্মাচরণে হস্তক্ষেপ না করিয়া, অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত না হানিয়াও যে একনিষ্ঠ সাধক হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্তই জগতে তোমাদিগকে প্রদর্শন করিতে হইবে। সাধক হও কিন্তু অপর সাধকদের ভয় এবং বিপত্তি সৃষ্টি না করিয়া।"

গুরুভাববর্জ্জিত দীক্ষা

ঢাকা ধামঘর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজেকে গুরু না ভাবিয়া আদি গুরুর চরণে নিজের সমগ্র গুরুভাব বিসর্জ্জন করিয়া যে দীক্ষাদান, তাহা এক বিচিত্র এবং অপূর্ব্ব বস্তু হইবে। আবার নিজেকে দীক্ষাদাতার শিষ্য বলিয়া গণনা না করিয়া দীক্ষাদাতা নিজে যেই আদিগুরুর শিষ্য, নিজেকেও সেই আদিগুরুর শিষ্য বলিয়া অনুভব করতঃ যে দীক্ষা-গ্রহণ, তাহাও এক অতি বিচিত্র এবং অপূর্ব্ব বস্তু হইবে। তোমরা তোমাদের অন্তরের সংস্কার এই আগামী যুগের অবশ্যম্ভাবী সুব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গড়িতে থাক। সীমাবদ্ধ বা ব্যক্তিবদ্ধ গুরুবাদ চিরকাল সঙ্ঘকে পুষ্টি এবং বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। তোমরা নিজেদের পূর্ব্বসংস্কারমুক্ত নূতন মন লইয়া পুষ্টিবন্ত ও বৃদ্ধিশীল সঙ্ঘ-গঠনে কৃতকার্য্য হও। দীক্ষা দাও, কিন্তু গুরু সাজিও না, দীক্ষা নাও কিন্তু আদিগুরু ব্যতীত অপর কাহারও শিষ্য বনিও না।"

অপত্যের মধ্য দিয়া জগতের সেবা

ঢাকা বিদগাঁও-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সন্ন্যাসীর উপরে সমগ্র জগতের অধিকার, গৃহীর উপরে তার অপত্যবর্গের প্রধান অধিকার। গৃহী যদি নিজ পুত্রকন্যা-গুলিকে জগন্মঙ্গলের জন্য গঠন করে, তবে অপত্যসেবার ভিতর দিয়াই সে জগতের দাবী পূরণ করিতে পারে। তোমরা

এই ভাবে জগতের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা কর।"

ব্রত-নিয়মাদির উদ্দেশ্য

শ্রীহট্ট সায়েস্তাগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ব্রত, উপবাস, দান এবং মৌন প্রভৃতি পালনের তোমার একমাত্র উদ্দেশ্যই যেন হয় ভগবদ্‌ভক্তির বৃদ্ধি। পুণ্যের লোভে নয়, স্বর্গের লোভে নয়, লোকমান ও ঐহিক প্রতিপত্তি লাভের লোভে ত' নিশ্চয় নয়, পরন্তু একমাত্র ইষ্টভক্তি, ইষ্টপ্রীতি ও ইষ্টানুরাগ বর্দ্ধনের জন্যই এসবের অনুষ্ঠান করিবে। চিত্তশুদ্ধি, সংযম, সদাচার, সত্যপালন প্রভৃতি সব-কিছুরই একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে ভগবানকে ভালবাসা। যে ব্রত, যে নিয়ম, যে পুণ্য, যে দান, যে ত্যাগ, যে সংযম, যে মৌন, যে তপস্যা তোমার ভগবদ্‌ভক্তির বর্দ্ধন করিল না, জানিবে, তাহা অসার্থক হইয়াছে। ব্রত-নিয়মাদিকেই লক্ষ্য মনে করিও না,—এগুলি উপায়, লক্ষ্য হইল ঈশ্বরানুরাগ।"

কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ)

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

অদ্য দ্বিপ্রহরের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি গোবিন্দপুর হইতে কিশোরগঞ্জ আসিয়াছেন। স্থানীয় লক্ষ্মীনারায়ণজীউর আখড়ার

মোহন্ত শ্রীপাদ গোকুলগোবিন্দ অধিকারী মহারাজ শ্রীশ্রী-বাবামণির আতিথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির অবস্থানের জন্য 'জয়কা'-র জমিদারের বাসার একটি গৃহ পৃথক ভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

চিন্তার শক্তি ও বক্তৃতা

অপরাহ্নে কতিপয় ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ-দর্শন কামনায় আসিয়াছেন।

একজন বলিলেন,—সাধু-মহাত্মাদের দেশ-ভ্রমণের ফলে স্থানে স্থানে তাঁহার চরণ-ধূলি পড়ে, তাতে দেশ পবিত্র হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহাত্মাবিশেষের পক্ষে সে কথা সত্য। কিন্তু একস্থানে ব'সে থেকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পাবনী শক্তি সঞ্চারণ করাও সাধুদের অন্যতম লক্ষণ।

ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনি যে আজ গাঙ্গাটিয়া, গোবিন্দপুর আর কিশোরগঞ্জ ঘুরে গেলেন, হয় ত' তারই প্রভাবে একদিন সমগ্র মহকুমার শতাধিক গ্রাম জু'ড়ে পবিত্র জীবন-যাপনের ও উন্নত আদর্শ জীবন গ্রহণের প্রতিযোগিতা সুরু হ'তে পারে!

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আমার প্রতি আপনার আশীর্ব্বাদটী সত্যই সুন্দর। কিন্তু কিশোরগঞ্জ না এসেও যদি সে কাজটী কত্তে পাত্তাম, তবে কি আরো ভাল হ'ত না?

সকলেই হাসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুদ্ধ চিন্তার শক্তিতে হাজার বক্তৃতার চেয়ে বেশী কাজ হয়।

ভদ্রলোক বলিলেন,—তাই ব'লে আপনি আবার আমাদিগকে বক্তৃতা শ্রবণ থেকে বঞ্চিত কর্ব্বেন না। আমরা এখান থেকেই লোকমুখে শুনেছি যে, আপনার গাঙ্গাটিয়া ও গোবিন্দপুরের বক্তৃতা নাকি গাছের পাখীরা পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হ'য়ে শুনেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া অন্য কথা পাড়িলেন।

মহাপুরুষদের আত্ম-বিলোপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখুন মহাপুরুষদের নিজে-দিগকে লুকিয়ে রাখবার ক্ষমতা কিরূপ অসাধারণ হয়। শঙ্করাচার্য্য যখন ভুবনজয়ী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ রূপে সকলের পূজার সামগ্রী হয়েছেন, তখন একদিন তিনি কেদারনাথের সঙ্গে মিশে গেলেন। অর্থাৎ কোথায় যে তিনি কি ভাবে নিজেকে লুকালেন, আজ পর্য্যন্ত কেউ তার খোঁজ পেলে না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন তাঁর প্রেমের ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে বিরাট প্রেমিকসঙ্ঘ গ'ড়ে তুলেছেন, ঠিক্ সেই সময়টীতেই তিনি জগন্নাথ দেবের সঙ্গে মিশে গেলেন। অর্থাৎ কোথায় যে তিনি নিজেকে কি ভাবে লুকালেন, একমাত্র তিনি ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের কেউ আর তা' জান্‌ল না। হাজার হাজার উদাসী, সন্ন্যাসী, ত্যাগী ও ব্রহ্মচারীর গুরু অচলানন্দ ব্রহ্মচারী হঠাৎ একদিন এমন এক গিরিগুহাতে

নিজেকে লুকালেন যে, তাঁর প্রিয়তম শিষ্যের উপরে পর্য্যন্ত নিষেধ রইল যেন জগতের কেউ না জান্‌তে পারে যে, কোথায় তিনি যোগবলে দেহ রক্ষা করেছেন। এই যে আত্মগোপনতার ক্ষমতা, মহাপুরুষদের এটা এক আশ্চর্য্য শক্তি। জগতে সামান্য একটু কৃতিত্বের বড়াই করার সুযোগ আছে যার, সেই নিজেকে সকলের চোখের সাম্‌নে প্রকাশ ক'রে ধরার জন্য কত কৌশল করে। কিন্তু মহাপুরুষেরা চান আত্মবিলোপ। একদল মহাপুরুষ বিভিন্ন যুগে জীবহিতবুদ্ধিতে এক একখানা ক'রে পুরাণ লিপিবদ্ধ কর্ল্লেন, আর নিজেদের নাম সম্পূর্ণ লুপ্ত ক'রে দিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নামে জয়ধ্বনি তুললেন। কেউ কখনো জান্‌ল না যে, কারা সেই অসীম প্রতিভার অধিকারী দিব্যদৃষ্টি শাস্ত্রকার, যাঁরা ব্যাসদেবের নামের আড়ালে নিজেদের আত্মপ্রচারেচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়ে জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলেন। মহাপুরুষদের আচরণ এমনি অদ্ভুত।

গুরুবাক্যই একমাত্র সত্য

একজন উকিল প্রশ্ন করিলেন—গুরুর্বচঃ সত্যমসত্যমন্যৎ—কথাটার মানে কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুবাক্য ব্যতীত অপর বাক্যে যে সত্য আছে, একথা ভাবতে গেলে সাধকের সাধন-নিষ্ঠায় হানি আসে। তাই তাকে জোর্‌সে উপদেশ দেওয়া হয়েছে,—"একমাত্র গুরুবাক্যকেই সত্য জেনে অপর সকল বাক্য বা

উপদেশে অনাস্থা ক'রে নিজের গৃহীত পথে সিংহ-বিক্রমে চল।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মূলসত্য হচ্ছে গুরুবাক্য অর্থাৎ গুরুদত্ত সাধন, আর জগতের যত শাস্ত্র বা হিতোপদেশ সব হচ্ছে সেই মূলসত্যের অনুপূরক। উপদেষ্টা যত বড়ই হোন, আর শ্রোতা যত উচ্চাধিকারীই হউক, একটি মাত্র বাক্য বা একটি মাত্র সাধনের মধ্যে পূর্ণ সত্য কখনো আটক প'ড়ে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু একটী মাত্র বাক্যকে বা একটী মাত্র সাধনকে অবলম্বন ক'রে অবিরাম অবিশ্রাম চল্‌তে থাক্‌লে অন্তরের অনুভূতির ভিতর দিয়ে জীব পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকার পায়। তখনই সে বুঝতে পারে যে, জগতের যত মত আর যত পথ, সবই গুরুবাক্যের অনুপূরক বা পার্শ্বচিত্র মাত্র। তার আগে সে তা' বুঝ্‌তে পারে না। শুধু যুক্তি দিয়ে একথা বুঝাও যায় না, যতক্ষণ না অনুভূতির প্রত্যক্ষ আস্বাদন লাভ করা যায়। যুক্তির পর যুক্তি মস্তিষ্কের ভিতরে ঢুকে কচ্‌কচি আর গজ্‌গজি কত্তে থাকে, কিন্তু কার সঙ্গে যে কার কি সামঞ্জস্য, তা ধরা পড়ে না। তাই গুরুদত্ত সাধন নিয়ে একনিষ্ঠ প্রযত্নে অবিশ্রাম সাধনা ক'রে সত্যকে নিজের চ'খে দেখার জন্য, নিজের কাণে শোনার জন্য, নিজের জিহ্বায় আস্বাদনের জন্য, নিজের প্রাণে বুঝার জন্য অন্য দিক থেকে অভিনিবেশ তুলে নিয়ে এসে সবটুকু অভিনিবেশ এক জায়গায় দেবার জন্যই বলা হয়েছে,—গুরুবাক্যই একমাত্র সত্য, অন্য সব অসত্য।

ব্যক্তিগত গুরুবাদের কুফল

এই প্রসঙ্গে গুরুবাদের কথা উঠিল এবং একজন প্রশ্ন করিলেন যে, বর্ত্তমান গুরুবাদ ও ধর্ম্ম-সঙ্ঘের বিপুল বিস্তার এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কি দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বর্ত্তমান গুরুবাদ ব্যক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ফলে, ব্যক্তিটীর যতদিন পরমায়ু, একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ বর্দ্ধনশীল ধর্ম্ম-গোষ্ঠীর বিস্তার মাত্র ততদিন। ব্যক্তিগত গুরু দেহ রক্ষা কর্লেন, আর হয় তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্ম-গোষ্ঠী লয় পেল, নতুবা সঙ্ঘের মধ্যে বা বাইরে একই সাধন-ধারা অবলম্বন ক'রে দুই বা ততোঽধিক নূতন গুরুরা আবির্ভূত হ'লেন এবং সকলের আধ্যাত্মিক শক্তি একই লক্ষ্যে প্রযুক্ত না হ'য়ে নিজ নিজ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মগোষ্ঠীর সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হ'ল। এঁদের দেহান্তের পরে আবার এঁদের এক এক জনের শিষ্যদের মধ্য থেকে তিন চার পাঁচ জন ক'রে গুরু বেরুলেন এবং এঁরা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র ক'রে পুনরায় নূতন নূতন ধর্ম্মগোষ্ঠীর পত্তন কর্‌লেন। এভাবে বংশানুক্রমে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের ন্যায় ক্রমশঃ ধর্ম্মগোষ্ঠীও বিভক্ত হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো। ফলে, পরিণামে একই আদিগুরুর শিষ্যানুশিষ্যদের মধ্যে কোনও প্রকারের প্রেমের, হৃদ্যতার বা ঐক্যের বন্ধন আর রইল না। প্রত্যেকেই সম্প্রদায় বিস্তার কত্তে লাগ্‌লেন নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের মহিমাকে প্রধান ক'রে নিয়ে

এবং একই সাধন-ধারার মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন যত গুরুর আবির্ভাব হ'তে লাগ্‌ল, ততই শুধু ভেদ, বিচ্ছেদ এবং দূরত্বের সৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল। এই কারণেই উদারতম ধর্ম্মের অধিকারী হ'য়েও আপনারা দৃঢ়তম ধর্ম্মসঙ্ঘের আশ্রিত ব'লে গর্ব্ব কত্তে পারেন না। আপনাদের ধর্ম্মসঙ্ঘ অতি দুর্ব্বল, আক্রমণ মাত্রেই পতনোন্মুখ, বাইরের কোনও উৎপাত এসে বিভীষিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র তাসের ঘরের ন্যায় ফুৎকারে উড্ডয়নশীল।

আদিগুরুই একমাত্র গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই কারণেই ধর্ম্মসঙ্ঘ থেকে ব্যক্তিগত গুরুবাদের উচ্ছেদ সাধনের প্রয়োজন এসেছে। যে যাকে দীক্ষা দিক্, গুরু সেই একজন, যিনি আদিগুরু। যে যার কাছ থেকে দীক্ষা নিক্, শিষ্য সে মাত্র এক জনের, যিনি আদিগুরু। এক আদিগুরুর শিক্ষাই শিষ্য-পরম্পরায় যুগের পর যুগ প্রবাহিত হচ্ছে, সুতরাং এই শিক্ষা, এই দীক্ষা, এই তত্ত্ব, এই সাধন, এই আদর্শ, এই অনুশীলন একমাত্র আদিগুরুরই দেওয়া, এই বিশ্বাসটীকে, এই প্রত্যয়টীকে, এই নিষ্ঠাটীকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক'রে তুলতে হবে। গঙ্গোত্রী থেকে যে ধারা বহির্গত হ'য়েছে, তা'ই হরিদ্বারে এসে সমতল ভূমির বুকের স্পর্শ পেল, তা'ই আবার প্রয়াগ, কাশী, পাটনা, কল্‌কাতা হ'য়ে এসে সমুদ্রে পড়ল। কোনও দেশের মাটী লাল ব'লে হয় ত' গঙ্গার জল একটু লাল হয়েছে, কোনও দেশের মাটী বেলে

ব'লে হয় ত' গঙ্গার জল একটু ঘোলাটে হয়েছে, কিন্তু যে দেশের বুক স্পর্শ ক'রেই এই জল ব'য়ে যাক্, জল কিন্তু গঙ্গারই, এ জলকে কেউ প্রয়াগের জল, কাশীর জল, পাটনার জল বা কল্‌কাতার জল বলে না, যেখান থেকেই যে এক গণ্ডূষ গ্রহণ করে, সেখানেই এর নাম দেয় গঙ্গার জল। ঠিক এই রকম ভাবে অখণ্ডকেই একমাত্র গুরু মেনে সকল দীক্ষাদাতার সকল শিষ্য যখন নিষ্ঠার সঙ্গে একই সাধন কর্বে, সর্ব্বসঙ্ঘে বল এবং ঐক্য আস্‌বে, তখন জান্‌তে হবে অখণ্ডকেই একমাত্র গুরু।

দীক্ষাদাতাদের দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অখণ্ডেতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা স্থাপন ক'রে যখন কোনও ধর্ম্ম-সঙ্ঘে নিজেকে স্থাপন কর্ত্তে উদ্যত হবে, তখন দীক্ষাদাতারা অনেকেই হয়ত নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে অখণ্ডের পায়ে নিঃশেষে বলি দিয়ে সম্প্রদায়-পোষণ মুক্ত হবেন, কিন্তু দেশপ্রচলিত গুরুবাদের অনুরাগী অপরাপর বহু ব্যক্তির অনুসরণে দীক্ষাপ্রাপ্তেরা হয়ত নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিলাষ ও অহঙ্কারের পরিপূরণার্থে নানা বাধা সৃষ্টি কর্বে। কিন্তু এসব বাধা প্রেমের ও সত্যের বলে দূরীভূত ক'রেই ভবিষ্যতের প্রত্যেক দীক্ষাদাতাকে দীক্ষিতের প্রাণে অখণ্ডের প্রতি অকুণ্ঠিত আত্মসমর্পণ সৃষ্টি কর্ত্তে হবে। এইটী দীক্ষাদাতাদের একটী সুবিশাল দায়িত্ব এবং অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের উদ্দেশ্য

একজন শিক্ষক চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রেলের ইঞ্জিন যেমন পথ চল্‌তে চল্‌তে, গাড়ী টান্‌তে টান্‌তে কোনো ষ্টেশনে এসে একটু জল, কিছু কয়লা বোঝাই ক'রে নেওয়া প্রয়োজন মনে করে, চাতুর্ম্মাস্য ব্রতটাও ঠিক্ তাই। বেদম ভাবে সংসারী জীবন যাপন ক'রে ক'রে জীব ক্লান্ত হয়, ক্লিষ্ট হয়, অথবা অবিরাম ধর্ম্ম-প্রচার, পরিব্রজ্যা প্রভৃতি ক'রে, ত্যাগী বা সাধুদের শরীর ক্লান্ত বা মন ক্লিষ্ট হয়, তখন চার মাস সময়ের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে থেকে, যাতায়াত বন্ধ ক'রে, আচার-নিয়ম-নিষ্ঠার দ্বারা শরীরের ও মনের বাহ্য প্রয়োজনের পরিমাণ কমিয়ে একাদিক্রমে আধ্যাত্মিক আহার গ্রহণ ক'রে ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মচেতনা ধর্ম্মাভ্যাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠানকে জাগ্রত জীবন্ত ক'রে নেওয়াই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের উদ্দেশ্য।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল

প্রশ্ন হইল,—বছরের মধ্যে যে কোনও চারিটী মাসকে বেছে নিয়েই কি চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা যায়। কিন্তু প্রথা তা' নয়। বর্ষা কালটাই দেশ-বিদেশে ভ্রমণের পক্ষে ক্লেশকর, তদুপরি এই সময়ে নানা-দেশ পর্য্যটন দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল।

বিশেষতঃ মেঘ-মেদুর আকাশে মানব-মাত্রেরই মন ভাল থাকে না, মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত এবং মন অবসাদগ্রস্ত হয়। এই কারণে বর্ষাকালটায়ই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালিত হ'য়ে থাকে। বৌদ্ধ তপস্বীরা বন-পর্ব্বত ছেড়ে এই বর্ষাকালটাতেই অন্ন-সেবনের জন্য লোকালয়ে নেমে আসতেন। এই অন্নসেবন শুধু তেঁতুল চেটে খাওয়া নয়, এটাও চাতুর্ম্মাস্য ব্রতই। হিন্দুরা কেউ কেউ আষাঢ় মাসে শয়ন-একাদশী তিথি থেকে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সুরু করেন এবং কার্ত্তিক মাসের শুক্লা উত্থান-একাদশীতে ব্রত সমাপ্ত করেন। বৈষ্ণবেরা অনেকেই আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি থেকে গণনা ক'রে রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য পালন করেন। সন্ন্যাসীরা অনেকেই ১লা শ্রাবণ থেকে সুরু ক'রে ত্রিশে-কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সময়টুকুতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন ক'রে যেতে থাকেন। অর্থাৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথার ভিতরে আরম্ভের তিথি আর সম্পূর্ণ হবার তিথিতে কিছু গরমিল আছে, কিন্তু মোটের উপর কালটা বর্ষা এবং বর্ষান্ত।

চাতুর্ম্মাস্যের কর্ত্তব্য

প্রশ্ন হইল,—চাতুর্ম্মাস্য-কালে কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে সব কার্য্যানুষ্ঠানের দ্বারা পাপক্ষয় হয়, আসক্তি ও বাসনার বন্ধন শিথিল হয়, নামে রুচি, সর্ব্বজীবে মৈত্রী, ভগবদ্‌ভক্তি ও সাধনে নিষ্ঠা বাড়ে, এমন সকল কাজ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হ'য়ে এই সময়ে

করা উচিত। নির্দ্দিষ্ট সময়-তালিকার অনুসরণ ক'রে এই জন্য চলা উচিত যে, তাতে চরিত্রের মধ্যে সদ্‌বিষয়িণী নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রত উদ্‌যাপিত হ'য়ে যাওয়ার ফলেও সেই নিয়মের সুফল চল্‌তে থাকে। ব্রতকালে নারীর পুরুষ-সঙ্গ এবং পুরুষের স্ত্রী-সঙ্গ বর্জ্জন আবশ্যক। নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সেবা-বর্জ্জন বা বিলাসিতা, পরনিন্দা ও বহুভাষিতা পরিহার, মিথ্যাচার ও মিথ্যাকথন পরিত্যাগ, ক্রোধপ্রশমন, ঐহিক সুখ বা সৌভাগ্য প্রাপ্তির লালসাকে অনুক্ষণ শাসন, এই সমস্ত হচ্ছে চাতুর্ম্মাস্য-কালের কর্ত্তব্য। ভগবৎ-কথা শ্রবণ, ভগবৎ-কথা কথন, ভগবন্নাম-কীর্ত্তন, ভক্তগণের চরিত্র-আলোচনা, ভক্তগণের সঙ্গ করা প্রভৃতি হচ্ছে এই সময়ের কর্ত্তব্য। শুচিতা-বর্দ্ধক সংযত আহার, অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ প্রভৃতি রক্ষণ এসময়ে বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য।

চাতুর্ম্মাস্য-কালের কেশ-নখাদি-ছেদন

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেশনখাদি ছেদন সম্পর্কে যে, নিষেধ শুনা যায়, তৎসম্পর্কে কি কর্ত্তব্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেশচ্ছেদন না ক'রেও পারা যায়, যদি কেশকে পরিষ্কৃত রাখা যায়। কিন্তু নখচ্ছেদনের প্রাচীনকালের নিষেধ এই যুগেও শোনা যায় কিনা, সেটা যার যার ব্যক্তিগত বিবেচনার বিষয়। কারণ, মলশৌচ না ক'রে ত'

আর মানুষ পার্ব্বে না। কিন্তু মলশৌচকালে নখের ভিতরে অনেক কদর্য্য জিনিষ প্রতিদিনই ঢোকে। নোংরা লোকদের নখের ময়লা নিয়ে অনুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা কর্ল্লে তাতে অনেক ক্রিমির ডিম পাওয়া যাবে। সুতরাং নখচ্ছেদনের নিষেধ আমি কাউকে মানতে বল্‌তে পারি না।

প্রশ্ন।—তবে এ নিষেধ হ'ল কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বিলাসিতা দমনের উদ্দেশ্য থেকেও হ'তে পারে, কিম্বা বহুজনকে কামায় যে নাপিত, সেই অশুদ্ধ ব্যক্তির সংশ্রব বর্জ্জনের উদ্দেশ্যেও হ'তে পারে।

পুণ্য-মাস-ব্রত

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—যাঁদের পক্ষে চার মাস ধ'রে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন সম্ভব নয়, তাঁরা কি কত্তে পারেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁরা একটী মাস বা দুইটি মাস নির্দ্দিষ্ট ক'রে নিয়ে ব্রত-পালন কত্তে পারেন। যেমন, এক পূর্ণিমা থেকে ধ'রে আর এক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কিম্বা মাসের পয়লা থেকে ধ'রে শেষ দিন পর্য্যন্ত বৈশাখী ব্রত, শ্রাবণ-ব্রত, মাঘ-ব্রত ইত্যাদি। যাঁর যেটী জন্মমাস, তাঁর পক্ষে সেই মাসে এই ব্রত পালনীয় হ'তে পারে। কিম্বা এক গুরুর সব শিষ্যেরা গুরুর জন্মমাসকে নিজেদের সকলের জন্য ব্রতপালনের মাস-রূপে গ্রহণ কত্তে পারেন। যাঁর পক্ষে যেটি পুণ্যমাস, তিনি সেই মাসে ব্রতধারী হ'য়ে থাক্‌বেন।

কার্ত্তিকে আমিষ-ভক্ষণ

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—শাস্ত্রে নাকি কোথায় আছে,—"কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ", কার্ত্তিক মাসে আমিষ খাবে না। এর দ্বারা কি এই বুঝা যায় না যে, কার্ত্তিক ছাড়া অন্য মাসে আমিষ খাওয়া যাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথাটা বৈষ্ণব-শাস্ত্রের। আমিষ বল্‌তে বৈষ্ণব আচার্য্যেরা এখানে মাষকলায়, পান, লালপুঁই, মসূর ডাল, রসোণ প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্যকে বুঝাচ্ছেন। মাছ বা মাংসকে বুঝাচ্ছেন না। কারণ, তাঁদের মতে মৎস্য বা মাংস ত' কোনও মাসেই বা কোনও ঋতুতেই সাধক ব্যক্তির সেব্য নয়।

অবৈষ্ণবের মৎস্য-মাংসাদি আহার

প্রশ্নকর্ত্তা।—বৈষ্ণব ছাড়া অন্যেরা কি মৎস্য-মাংস খেতে পারেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খাদ্যাখাদ্যের বিচার এক এক দেশে এক এক জাতিতে, এক এক যুগে, এক এক রকম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এক সময়ে গোমাংস পর্য্যন্ত খেতেন, কিন্তু আজ আর তা' চল নয় কিম্বা ভবিষ্যতে চল হবার সম্ভাবনাও বিন্দুমাত্রও নেই। মহর্ষি মনু বলেছেন,—মৎস্য-মাংস ভক্ষণে দোষ নেই, তবে না খেলে তার অনেক সুফল,—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" কার পক্ষে কোন্ বস্তু খাদ্য

হবে, তা বলবে তার স্বাস্থ্য, তার চিকিৎসক এবং তার রুচি। কিন্তু ব্রত-পালন-কালে প্রত্যেকেরই মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, পলাণ্ডু প্রভৃতি বর্জ্জন করা উচিত।

বৈশাখ ও কার্ত্তিকে মৎস্যাহার বর্জ্জন

প্রশ্ন।—আচ্ছা, যারা কোনো ব্রত-পালন করে না, যারা সারা বছরই মাছ খায়, তাদেরও বৈশাখ আর কার্ত্তিক মাসে মাছ খাওয়া নিষেধ কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—গর্ভস্থ সন্তান সহ যদি মাকে আপনারা খেয়ে ফেলেন, তাহ'লে বাচ্চারা সব জন্মাবে কি ক'রে? কসাইরা যদি গর্ভবতী ছাগীকে হত্যা কর্ত্ত, তাহ'লে কি জগতে আর ছাগলের পাল থাক্‌ত? যাতে আপনারা বছরের বাকী দশটী মাস প্রতি গ্রাসে একটী ক'রে মাছের মুড়ো উদরস্থ কত্তে পারেন, তারই জন্য বৈশাখে আর কার্ত্তিকে এই রসনা-সংযমের ব্যবস্থা। যে কাজ গভর্ণমেন্টের নিজের করা উচিত ছিল আইনের প্রবর্ত্তন ক'রে, সেই কাজটীই বিদেশী সরকার এদেশে এসে পাততাড়ি পাতবার বহু পূর্ব্বে শাস্ত্রকারেরা ক'রে গেছেন। বৈশাখে ও কার্ত্তিকে মৎস্যাহার বর্জ্জন পুণ্যের লোভে নয়, পরন্তু নিতান্তই মৎস্য-চাষের তাগিদে। তবে যদি আপনারা মৎস্য-বর্জ্জন করার সাথে সাথে মাস দুটিকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম বর্দ্ধনের উপায়রূপে গ্রহণ করেন, তাহ'লে তা' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে।

কিশোরগঞ্জ
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

প্রাতে 'জয়কার-বাসার' সম্মুখস্থ মাঠের তৃণাস্তৃত অংশে যৌগিক আসন-মুদ্রার একটী ক্লাশ হইতেছে। প্রায় পনের বিশজন শিক্ষার্থী আসিয়াছেন। বারো বৎসর বয়স হইতে পঞ্চাশ বছর বয়সের লোক ইহাদের মধ্যে আছেন। অদ্য বিকালে ছয়টার সময়ে স্থানীয় কালীবাড়ীতে একটি ধর্ম্মসভাও হইবে। সকল ব্যবস্থাই লক্ষ্মীনারায়ণ আখড়ার মোহান্ত মহারাজের যত্ন-চেষ্টায় হইতেছে।

প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপী আসন-মুদ্রাদি শিক্ষার পরে সমাগতেরা নিজ নিজ মনোগত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

ভগবদ্‌ভক্তির সহিত যৌগিক আসন-মুদ্রার সম্পর্ক

একজন প্রশ্ন করিলেন,—আসন-মুদ্রাদি শিক্ষার সঙ্গে ভগবদ্‌ভক্তিলাভের সম্পর্ক কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবৎ-সেবার জন্যই এই দেহ ধারণ কচ্ছি, এই বিশ্বাস অন্তরে জাগরূক রেখে দেহের যে-কোনও পরিচর্য্যা করা হোক্, সেইটাই ভক্তি-সাধনের অঙ্গ-স্বরূপ হয়। যৌগিক আসন-মুদ্রাগুলি শুধুই যে শরীরের পরিচর্য্যা, শুধুই যে এতে দেহের স্বাস্থ্য ও স্থিরতা বর্দ্ধিত হয়, তাই নয়, পরন্তু যাতে মন একান্ত ভাবে নিবিষ্ট হ'তে পারে,

এগুলি তারও সহায়ক। হাজার বার নাম জপে যাচ্ছ, কিন্তু মন বসে না,—এরূপ বিভ্রাট তোমাদের অনেকেরই হয়। দুবার লঘু-মহামুদ্রা কর, আর তারপরে নামজপে বস, ত' দেখতে পাবে যে, মনের বহির্ম্মুখিনী প্রবণতা অনকেটা হ্রাস পেয়ে গেছে। দশ মিনিট ব'সে নাম কর্লেই পায়ে কনকনি ধ'রে যায়, মন তোমার উপাস্যের চরণ থেকে ছুটে ছুটে আসে আর কন্‌কনানিরই ধ্যান করে,—এরূপ অবস্থায় বার পাঁচেক স্বল্পমহামুদ্রা কর, দেখ্‌বে, অল্প সময়েই একটা উল্লেখযোগ্য আসানি আস্‌বে। এজন্যই এগুলি ভগবদ্‌ভক্তি-লাভের সহায়ক। কিন্তু তুমি যদি সার্কাস দেখাবার জন্য যৌগিক প্রক্রিয়ার অভ্যাস কর, তবে তা' নিশ্চয়ই ভক্ত্যঙ্গ সাধন হবে না।

কিশোরগঞ্জের বক্তৃতা

অপরাহ্ণে সভাস্থলে প্রায় তিন চারি শত লোক হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি যে ঘড়ি ধরিয়া ঠিক্ ছয়টাতেই বক্তৃতা আরম্ভ করিবেন, মোহান্ত মহারাজ একথাটী উৎকৃষ্ট ভাবে প্রচার করাইলেও অনেকেই, একথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন নাই। কেন না, দেশের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বে বক্তৃতা-কালে নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন, ইহা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং সভার আরম্ভ-কালে শ্রোতার সংখ্যা খুব অল্পই হইয়াছিল। কিন্তু জনসমাগমের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে শ্রীশ্রীবাবামণি সম্মত হইলেন না।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় তিনি তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

হবিগঞ্জে সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃত্ব-শক্তি বাগ্মিতার রূপ পাইয়াছিল। আমরা কিশোরগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে শুনিয়াছি যে, একমাত্র স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাষণ ছাড়া এরূপ বক্তৃতা এতগুলি বছরের ভিতরে কিশোরগঞ্জবাসীরা কেহ শুনিয়াছেন বলিয়া কাহারও নাকি স্মরণে পড়ে না। দুঃখের বিষয়, কিশোরগঞ্জের অমূল্য-ভাষণ-সমূহের কোনও নোট রাখা হয় নাই।

পূর্ণ আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি যখন আসন-পরিগ্রহ করিলেন, তখন স্থানীয় উকিল-বারের প্রধান সদস্য এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস অনুরোধ জানাইলেন যে, যেহেতু একদিনের ভাষণ শুনিয়া কিশোরগঞ্জ-বাসীদের কর্ণের শ্রবণেচ্ছা তৃপ্ত হয় নাই, সেই হেতু আরও কয়েকদিন তাঁহারা ধারাবাহিক বক্তৃতা শুনিতে চাহেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সানন্দে সম্মত হইলেন এবং জানাইলেন যে, বার, তের এবং চৌদ্দ জ্যৈষ্ঠ এই তিন দিন ধারাবাহিক বক্তৃতা হইবে।

যোগ এবং সাহিত্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতান্তে যখন কালীবাড়ী হইতে জয়কার বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন অনুগামী ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন তরুণ উকিল বলিলেন,—স্বামীজী, আজ প্রাতে যখন

আপনি যৌগিক আসন-মুদ্রা প্রদর্শন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাখ্যা প্রদান কচ্ছিলেন, তখন আপনাকে একজন সদ্যঃ হিমালয়-প্রত্যাবৃত্ত যোগী পুরুষ ব'লে আমার মনে হচ্ছিল। আর এই যে আপনি আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দিয়ে ফিরে এলেন, এখন আমার মনে হচ্ছে যেন আপনি সমগ্র জীবন শব্দ এবং সাহিত্যেরই অনুশীলন করেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হসিয়া বলিলেন,—যোগ এবং সাহিত্য একই কথা। সাহিত্য জগতের সকলের চিন্তা-ধারার 'সহিত' আমাকে যুক্ত করে, আর যোগ আমাকে সকলের যিনি প্রাণ, সকলের যিনি আত্মা, সকলের যিনি অন্তর্য্যামী, সকলের যিনি সর্ব্বেশ্বর, তাঁর ইচ্ছার একান্ত অনুবর্ত্তী করে। সুতরাং সাহিত্যে আর যোগে তফাৎ কোথায়? যোগ যেখানে অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, সাহিত্য সেখানে বাইরের আচ্ছাদন বা অনুমিতি।

যোগ এবং দর্শন

জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন,—আমার কিন্তু বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে যে, জগতের সকল দর্শন শাস্ত্র আপনি আজীবন অধ্যয়ন করেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যোগে এবং দর্শনেও তফাৎ অল্প। যোগ হচ্ছে লক্ষ্য, দর্শন হচ্ছে উপায়। অথবা যোগ হচ্ছে তত্ত্বের আস্বাদন, আর দর্শন হচ্ছে তার ব্যাখ্যা। সুতরাং

যোগীর পক্ষে দার্শনিক হ'তে বই পড়তে হয় না, যৌগিক অনুশীলনের পথে দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার তার কাছে আপনি এসে বিচিত্র রূপ ধ'রে প্রয়োজনমত আত্মপ্রকাশ করে।

কিশোরগঞ্জ
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

গত দুইটা দিন যে কি অসম্ভব কার্য্য-ব্যস্ততার ভিতরে গিয়াছে, বলিবার নহে। প্রাতঃকালের আসন-মুদ্রা শিক্ষার্থীর সংখ্যা একশত দেড় শত অতিক্রম করিয়াছে। সমগ্র দ্বিপ্রহর ব্যক্তিগত উপদেশার্থীর ভিড়। অপরাহ্নে বক্তৃতা। বক্তৃতাকালে কালীবাড়ীর অঙ্গন, প্রাঙ্গণ, এমন কি রাজপথ প্রভৃতিতে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে।

অদ্যই শেষ বক্তৃতার দিন এবং সন্ধ্যার ট্রেণেই শ্রীশ্রীবাবামণিকে কিশোরগঞ্জ ত্যাগ করিয়া শিমুলকান্দি যাইতে হইবে। এজন্য প্রতিদিনকার নির্দ্দিষ্ট সময় সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় সভা না করিয়া অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় সভা করা স্থির হইয়াছিল। ফৌজদারী ও আদালত কাছারী খোলা আছে বলিয়া আইন-ব্যবসায়ীদের অসুবিধা হইবে জানিয়াও এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যথা কালে দেখা গেল যে, শ্রীশ্রীবাবামণি ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বক্তৃতামঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই সভাস্থল ও বাহিরের তৃণাস্তৃত প্রাঙ্গণ আগ্রহী জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং উকিল

মোক্তারেরা নিজ নিজ কাছারীর পোষাক পরিধান করিয়াই উপবিষ্ট রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতারম্ভের পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোর্ট খোলা থাকিতে ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস বলিলেন,—"সকলে মিলিয়া অনুরোধ করিয়া হাকিমদিগকে কোর্ট আগে ছুটী দিতে আমরা বাধ্য করিয়াছি।"

নবভারতের দিব্য জন্ম

অদ্যকার বক্তৃতার সামান্য নোট পাওয়া গিয়াছে। তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

উৎকর্ণ ও মুগ্ধনেত্র শ্রোতৃবর্গের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"তমসাবৃতা দুর্য্যোগময়ী নিশীথিনীর সূচিভেদ্য অন্ধকার এবং হৃৎকম্প-কারিণী বিভীষিকার মধ্য দিয়ে এক দিব্য ভারত জন্ম নিচ্ছে, যেই ভারত মানুষের সন্তানকে অমানুষ থাক্‌তে দেবে না, অমানুষ হ'তে দেবে না, অমানুষ-রূপে জাত হ'তে এবং অমানুষ রূপে মৃত হ'তে দেবে না। সহস্র-কোটি মিথ্যার কুলিশ-কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে ভারতের সত্য সাধনা আগ্নেয়গিরির নিদারুণ পৌরুষকে অবলম্বন ক'রে সুনিশ্চিতই আত্মপ্রকাশ কর্ব্বে। হিমালয়শৃঙ্গের শিখরে শিখরে নবজাগৃতির অরুণ কিরণ তুহিনের বুকে সপ্তবর্ণের মধুর বৈচিত্র্য পুনরায় সৃষ্টি কর্ব্বে, তুষাররাশি গলবে, পর্ব্বত থেকে পর্ব্বতে উল্লম্ফনে উল্লম্ফনে ব্রহ্মাণ্ডের সহস্র কলরবকে ছাপিয়ে

দিয়ে ঘোর গর্জ্জনে সে গাঙ্গ্য প্রবাহের ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে সমতলের দিকে ছুটবে, পর্ব্বতের সাথে প্রান্তরের, নদীর সাথে সাগরের, ক্ষুদ্রের সাথে বৃহতের, শক্তির সাথে ভক্তির, ধর্ম্মের সাথে কর্ম্মের, উদ্দীপ্তির সাথে তৃপ্তির পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের অপূর্ব্ব মাধুরী ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে, গভীর বনে ও কান্তারে, লোকালয়ে ও বিজন গহনে প্রসারিত হবে। বিশ্বাসের দৃঢ় নিষ্ঠা নিয়ে হে পথিক আজ দৃঢ়-চরণে পথ চল, দৃঢ়হস্তে আজ তোমার সাধন-বর্ত্তিকা ধারণ কর, দক্ষিণে বামে শৃগাল চীৎকার তোমার চাঞ্চল্য উৎপাদনে অক্ষম হোক্, পশ্চাৎ থেকে ব্যাঘ্র-গর্জ্জন তোমার ওঙ্কার-হুঙ্কারে প্রহত হ'য়ে ফিরে চলে যাক্, সম্মুখের মায়া-প্রলোভন তোমার চরণাঘাতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে আর্ত্তরোলে নিপতিত হোক,—তুমি চল তোমার পথে সুস্থির, সুধীর, সুব্রত, সাহসী। নবভারতের দিব্য জন্মদাতা তুমি, তোমার কর্ত্তব্য তুমি ভুলে যেও না।"

তিন ঘণ্টা বক্তৃতার পরে সভা ভঙ্গ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি ধন্যবাদমাত্রেরও প্রতীক্ষা না করিয়া রেল ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিবার জন্য দ্রুত অশ্বযানে আরোহণ করিলেন। দুর্গাচরণ বাবু দ্রুত গিয়া সভামঞ্চে দাঁড়াইলেন ধন্যবাদ-ভাষণ দিবার জন্য।

শিমূলকান্দি (ময়মনসিংহ)
১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

গতকল্য কিশোরগঞ্জ হইতে শিমূলকান্দি আসিয়া পৌঁছিতে

বহু রাত্রি হইয়াছে। তদুপরি কিশোরগঞ্জের চারিদিন ব্যাপী পরিশ্রমের মধ্যে শ্রীশ্রীবাবামণির আর বিশ্রাম ছিল না। তাই অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, পূর্ণবিশ্রাম নিবেন।

কিন্তু পূর্ণ বিশ্রামের অর্থ হইল, হয় বসিয়া পত্র লেখা, নয় গ্রাম ঘুরিয়া গ্রামবাসীদের অবস্থা পরিদর্শন করা।

সুতরাং বেলা আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

বহু দেববাদের বিপত্তি-খণ্ডন

বগুড়া-আদমদিঘী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে একজনকে অপরের অধীন বা কাহাকেও সকলের প্রধান বলিয়া মানিতেই হয়। বৈষ্ণবেরা এই ভাবেই কৃষ্ণোপাসনা করিয়া থাকেন। নতুবা সকল দেবতাই এক জন, একই জনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া বিভিন্ন যুগে অর্চ্চনা করিয়াছ এবং আজ একই সময়ে সকল দেবতার কথা শুনিতে বসিয়া কে কাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে কাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এই বিতর্কের মধ্যে পড়িয়া বিভ্রান্ত হইতেছ, একথা তোমাকে মানিতে হয়। বৈদান্তিকেরা এই ভাবেই বিভিন্ন দেবতার উপাসনাকে সমর্থন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের যুক্তি এই

যে, নন্দঘোষ যে অম্বিকাবনে পার্ব্বতীর সহিত মহেশ্বরকে পূজা করিয়াছিলেন, অথবা গোপকন্যাগণ যে একদা কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, কিম্বা শ্রীরাধা প্রভৃতি যে একদা সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন, এই সকল দ্বারা শিব, পার্ব্বতী বা সূর্য্যের সহিত কৃষ্ণের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, কারণ, ইঁহারা যে দেবতারই আরাধনা করিয়া থাকুন, সেই দেবতার মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে যিনি বিরাজ করেন বলিয়াই তাঁহাদের দেবত্ব স্বীকৃত, সেই কৃষ্ণই ইঁহাদের লক্ষিত ছিলেন। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে এই যুক্তি কাহারও উদরে জীর্ণ হইতে পারে কি না, তাহা অবশ্য পৃথক্ কথা। কিন্তু তাঁহাদের যুক্তিটা ইহাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-কালে শিব, শক্তি প্রভৃতি দেবতার বিগ্রহ-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়াছিলেন, শিবের মন্দিরে গিয়া তিনি ভাবাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন,— ইহা হইতে দেববিশ্বাসী বৈদান্তিকেরা ব্যাখ্যা করিবেন যে, যিনি বিষ্ণু, তিনিই শিব, ইহাই মহাপ্রভুর আচরণে প্রমাণিত হইতেছে, কারণ তাঁর মত ব্যক্তির একমাত্র ইষ্ট ব্যতীত অন্যে কখনও নিষ্ঠা বা অভিলাষ থাকিতে পারে না। কিন্তু একজন বৈষ্ণব ইহাকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করিবেন যে, যেহেতু শিব বিষ্ণুর একজন পরম ভক্ত ও আদর্শ কিঙ্কর, সেই হেতু বিষ্ণু-ভক্ত শিব শ্রীগৌরাঙ্গের পরম আদরের বস্তু, কেন না আমার যে প্রিয়তম, তাঁকে যে প্রিয়তম বলিয়া জানে, সে কি আমার কম আদরের ধন? পরন্তু একজন বৈদান্তিক এই যুক্তির মধ্যে

অপরের ইষ্টকে হেয় করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করিবেন এবং প্রতিবাদে বলিবেন যে, এক এক যুগে এক এক দেশাংশে ভগবানকে এক এক দেবতারূপে কল্পনা করিয়া এক এক শাস্ত্র এক এক দেবতাকে পরমাগতি এবং অনন্যশরণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—শিবপুরাণ মহাদেবকে, ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে, দেবীপুরাণ ভগবতীকে পরাৎপর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—কিন্তু "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি,"—সত্য বস্তু এক এবং অদ্বিতীয়, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁর বর্ণনা প্রদান করেন। এ ভাবে বৈষ্ণবে আর বৈদান্তিকে একটা দারুণ কলহ চলিয়াছে। বৈষ্ণব বলিবেন,—কৃষ্ণ হইলেন চিৎ, আর অন্যান্য দেবতারা হইলেন জড়, একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন দেবতার রূপ ধরিয়াছেন বলিলে চিজ্জড়সমন্বয় করা হয়। আর বৈদান্তিকেরা বলিবেন,—এক এক সম্প্রদায় নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়া অপর দেবতাদের যে হেয় এবং অধীন বলিয়া বর্ণনার চেষ্টা করেন, ইহা ইচ্ছাকৃত অপরাধ সর্ব্বস্থলে হউক আর না হউক, অনিচ্ছাকৃত অন্ধ গোঁড়ামি ছাড়া অপর কিছু যে নহেই, এই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। উভয় পক্ষের যুক্তি-বিচারের ভিতরে শাস্ত্রবচনের এত ছড়াছড়ি যে, তোমার মত পথের ভিখারী বা আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের খবর নিতে যাওয়া এক নিদারুণ বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক রাজরাজেশ্বরের তোষাখানায় তোমাকে ঢুকাইয়া যদি মূল্যবান্ হীরা-জহরতের ভাণ্ডার তোমার সমক্ষে

খুলিয়া দেওয়া হয়, তখন তোমার অবস্থাটী কি হইবে? মরকত বেশী দামী না পদ্মরাগ বেশী দামী, নীলকান্ত বেশী দামী, না সূর্য্যকান্ত বেশী দামী, ইহা বিচার করিতে গিয়া যে জীবন কাটিয়া যাইবে! অথচ পরমায়ু তোমার নির্দ্দিষ্ট করা আছে। এমতাবস্থায় তোমার কর্ত্তব্য হইবে নিম্নলিখিত দুইটীর একটী। হয় তোমাকে মনে করিতে হইবে যে, গুরুদত্ত মণিটী ব্যতীত অপর সকলগুলি মণির অস্তিত্বই নাই, এইটীকেই দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া তোমাকে কোষাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে, নতুবা তোমাকে ভাবিতে হইবে যে, যে মণিটী গুরু তোমাকে প্রেমভরে স্নেহভরে অপকট হিতবুদ্ধিতে হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, সেই মণিটী আর অপরাপর মণিগুলি একই বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নহে, এক বস্তু পাইলেই সকল বস্তু পাওয়া হইল। বহু দেববাদের বিপত্তি-খণ্ডনের ইহাই উপায়।

সহর ও পল্লীর বৈষম্য

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি গ্রাম দেখিতে বাহির হইলেন। গ্রামের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই গ্রামে থাকেন না, সহরে বিষয়-কর্ম্মাদি উপলক্ষ্যে বাস করেন। গ্রাম্য পথ চলিতে চলিতে এই কথাই উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রতিভাবানেরা যায় সহরে জীবনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অপরকে হারিয়ে দিয়ে বেশী অর্থ, বেশী অন্ন, বেশী ক্ষমতা ও বেশী সম্মান আহরণের

জন্য, আর অক্ষম দুর্ব্বলেরা গ্রামের অনাদৃত কোণে প'ড়ে থাকে ম্যালেরিয়ায় ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে মরবার জন্য,—এই যে বিসদৃশ চিত্র, এই চিত্রের পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজনই দেশের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। শিক্ষিত চিকিৎসক শিক্ষিত অপর দশজন চিকিৎসকের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র সহরে গুঁতোগুতি কর্ব্বেন, আর পল্লীগ্রামে একটী হাতুড়ে বৈদ্যও অনেক সময়ে থাক্‌বে না,—এ বড় নিদারুণ বৈষম্য।

পল্লীব্রত গ্রহণ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না থাকিলে কি এ বৈষম্য কখনো দূর করা সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যদি মানুষ না হই, তা'হলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এলেও দেখা যাবে যে, আমরা একদল বুদ্ধিমান্ অপর দল নির্ব্বোধকে ঠকিয়ে ভোটের জোরে স্বাধীনতার এ সুযোগেই যতদূর সম্ভব উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বৈরাচার কচ্ছি। সুতরাং কবে দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আস্‌বে, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে সন আর শতাব্দী গুণে গুণে সময় হারাণোর চেয়ে, যা আমরা বর্ত্তমানে আছি, সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে এক দল সর্ব্বস্ব-ত্যাগীকে নিজেদের বুকের পাঁজর ত্যাগের আগুনে জ্বালিয়ে পথ চল্‌তে হবে। একটি মানুষকে নিরক্ষর থাক্‌তে দিব না, একটি মানুষকে অনাহারে মরতে দিব না, একটি মানুষকে অলসতা অবলম্বন

কত্তে দিব না, এই পবিত্র সঙ্কল্প নিয়ে লক্ষ লক্ষ ত্যাগীকে সমগ্র দেশে বেরিয়ে পড়্‌তে হবে। অবজ্ঞাত পল্লীতে, অনাচরিত জাতিসমূহের ঘরে, নদীর চরে, বনে, পাহাড়ে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌তে হবে। যার হাতের জল কেউ ছোঁয় না, তার পাদোদককে গঙ্গাজলের মত পাপহর ক'রে তুল্‌ব, তবে ছাড়্‌ব,—এই সঙ্কল্প নিয়ে বেরুতে হবে। সহরে কর্ম্মী হাজার হাজার মিলে,—পল্লীর প্রাণের ব্যথা বুঝবার লোক কোথায়? এই জন্যই আমাদের আজ পল্লীব্রত গ্রহণ কত্তে হবে।

রাত্রি প্রায় বারো ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি ভৈরব-বাজার রওনা হইলেন। কেন না শেষ-রাত্রের ট্রেণ ধরিয়া সকালে তাঁহাকে জিনারদি পৌঁছিতে হইবে।

—ঃ দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত ঃ—

"বিশ্বের সেবার তরে
জীবন তোমার,
বিশ্বের উদ্ধারে তব
আত্মার উদ্ধার।"

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান।।

দেহে, মনে, প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার।।

পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির।।

অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে।
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে।।

কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন।।

সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে।।

নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর।।

চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর আনন্দ আমার!

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভরপুর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।

(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই"॥
কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৬০' নং গান।

(৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

(৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন
সবাই আমার জ্ঞাতি॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৩১' নং গান।

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবায় হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
প্রভুর নয়ন-ভাতি॥
ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
ভাসিয়া অশ্রুনীরে,
বিপদে আপদে বাহুযুগ বেড়ি'
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী॥
কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব
সকলের অন্তরে,
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি॥

* মঙ্গল-মুরলী পুস্তক হইতে গৃহীত '২৫' নং গান।

(৬)

আমার যেদিন জন্ম হ'ল
সেদিন থেকেই জানি
সবার সেবার তরে আমার
ক্ষুদ্র জীবন-খানি॥
নইক আমি সম্প্রদায়ের,
গণ্ডীতে নই বাঁধা,
কণ্ঠ আমার নির্ব্বিচারে
সবার সুরে সাধা,
সবাইকে এই বক্ষে টেনে
জনম ধন্য মানি॥
আমার বুকেই বিশ্বজনের
সকল দুঃখ-গাথা
মর্ম্মে মর্ম্মে তন্ত্রে তন্ত্রে
প্রেম-সোহাগে গাঁথা;
সবার কান্না আমার ভাষায়
লভুক তাদের বাণী॥
সবার তরে জীবন দিব,
তাতেই জীবন লভি'
আমার মাঝে ফুটবে আমার
সত্যিকারের ছবি,

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৪৯' নং গান।

জীবন-দানের আনন্দেতে
বিশ্বভুবন উঠ্‌বে মেতে,
সবাই সবার আপন হবে,
বক্ষে টেনে আনি'
ভুলবে সকল দ্বন্দ্ব-বিভেদ
জগদ্‌ভরা প্রাণী॥

(৭)

জন্মদিনের গান,
গান সে ত' নয়, আত্মদানের
প্রতিশ্রুতি-দান॥
শ্বাস যতদিন বইবে নাসায়
বিশ্ববাসীর সেবার আশায়
প্রাণের বাতি জ্বলবে আমার
দীপ্ত অনির্ব্বাণ॥
জন্মদিনের আশীর্ব্বাণী
দাও আমারে এই,—
আপন আমার ভুবন খানি
পর কেহ মোর নেই!
ভালবাসায় থাক্‌ব আমি
অনিন্দ্য অম্লান ॥

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৫০' নং গান।

(৮)

আয় তোরা আয়,
আমার বক্ষে আয়।
এইখানে আমি লুকায়ে রেখেছি
জগতের যে যা চায়।।

আমার ভিতরে সকল মন্ত্র,
আমারে ধরিয়া সকল তন্ত্র,
সুরজাল-রচি' সকল যন্ত্র
আমারে নতি জানায়।
তাই না "প্রণব" এই নাম মোর
প্রচার হ'ল ধরায়।।

মহীরুহ যবে আকাশ জুড়িয়া
শাখা-পল্লব মেলে
হাজার হাজার পাখীরা ঘুরিয়া
তার ফাঁকে ফাঁকে খেলে,
তেমনি আমাতে নিখিলের ভাষা
যুগ যুগ ধরি' করে যাওয়া আসা,
আমারি ত' কোলে লভিয়া জনম
আমাতে বিলয় পায়।।

যত মত আর যত পথ হোক
যে আছে যেখানে পথচারী লোক,
সবাই আসিয়া শীতল হইবে
আমার স্নিগ্ধ ছায়।।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৬' নং গান।

(৯)

তোমারে যেদিন
প্রচার করিতে হবে,
দেখিও সেদিন এ দীন সেবক
কত কি করিছে ভবে!

লঙ্ঘিছে কত হিমগিরিচয়,—
বিষম বিঘ্নে চির-নির্ভয়,
কত দিগ্‌দেশে তোমারি বিজয়
বিঘোষিছে ভৈরবে;
দেখিও সেদিন এ দীন সেবক
কত কি করিছে ভবে।।

কিন্তু প্রথম প্রার্থনা নাথ,
থাকিতে হইবে সদা মোর সাথ,—
প্রতি পরমাণু মোর দেহমনে
তোমাতে ডুবিয়া রবে,
তবে ত' তোমার এ দীন সেবক
কত কি করিবে ভবে।।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '২৪' নং গান।

অখণ্ড সঙ্গীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্;
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক॥

ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৫৮' নং গান।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

দ্বাদশ খণ্ড

— * —

অখণ্ড সংহিতা

বা

দ্বাদশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী